ভুলে তুলিতে হয়। তুমি পরের উপকারের বিঘ্ন করিও না।

কপালকুণ্ডলা এই কথা অপ্রসন্নতার সহিত বলিলেন। নবকুমার আর আপত্তি করিলেন না। বলিলেন, "চল আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

কপালকুণ্ডলা গর্ব্বিতবচনে কহিলেন, 'আইস, আমি অবিশ্বাসিনী কি না স্বচক্ষে দেখিয়া যাও।'"

সমাজে আসিয়া বনবাসিনী কপালকুণ্ডলা সুখিনী হন নাই। তিনি ত বলিয়াছিলেন "বোধ করি সেই সমুদ্রতীরে বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।" বিবাহিত জীবন সুখের জীবন হইতে পারে সামাজিকের পক্ষে,—কপালকুণ্ডলার ন্যায় বনবাসিনী সমাজবিরহিণী যে সুখভাগিনী নহে। কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করিয়া নবকুনার যে সুখভোগ করিয়াছিলেন, কপালকুণ্ডলা স্বয়ং সে সুখের কপর্দ্দকভাগিনীও নহে। তাঁহার সুখ বনভ্রমণে, আর তাঁহার সুখ পরোপকারে। যে মাধবী স্নিগ্ধচন্দ্ররশ্মিময়ী যামিনীতে শ্যামাসুন্দরীর ঔষধানয়নার্থ তিনি বনমধ্যে গমন করিলেন, তখন ত তিনি গৃহস্থা কামিনী। কিন্তু বনভ্রমণের সুখ তিনি ছাড়িতে পারেন না। স্বামী রাগ করিলেন, তাহাতে কি এসে গেল? অনায়াসে কপালকুণ্ডলা স্বভাবসিদ্ধ চরিত্রের তেজস্বিতায় প্রফুল্লমনে বনভ্রমণে চলিলেন, প্রকৃতির মধুরিমাময় দৃশ্য দেখিয়া অনন্তচিন্তায় মগ্না হইলেন। অবাল্যের সেই সকল ক্রীড়াস্থল, বিমল রঙ্গস্থল তাঁহার হৃদয়ে যুগপৎ জাগিতে লাগিল। তখন কপালকুণ্ডলা আপনার বর্ত্তমান দশা ভুলিয়া বনবাসিনী সঙ্কোচশূন্যা—সেই কপালকুণ্ডলাই সাজিলেন। আবার যখন পদ্মাবতী আপনার নারকী অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কপালকুণ্ডলাকে বলিয়াছিল "তোমার প্রাণদান দিতেছি। তুমিও আমার জন্য কিছু কর।" তখন ক্ষণমাত্র চিন্তা করিয়া অমানুষী কপালকুণ্ডলা পরের মঙ্গলমন্দিরে আপনার প্রাণের প্রাণ বলী দিল। পদ্মাবতীর জন্য নিজ স্বামী পরিত্যাগ করিয়া যাইতে স্বীকৃত হইয়া বলিল, "তুমি যে আমার উপকার করিয়াছ কি না তাহা আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি না। অট্টালিকা, ধন, সম্পত্তি, দাসদাসীরও প্রয়োজন নাই। আমি তোমার সুখের পথ কেন রোধ করিব? তোমার মানস সিদ্ধ হউক—কালিহইতে বিঘ্নকারিণীর কোন সম্বাদ পাইবে না। আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব।" বিবাহে কপালকুণ্ডলা সুখী হয় নাই বলিয়াছি। তাহা একরূপ দেখাইয়াছি। আর একটি উদাহরণ দিতেছি। কপালকুণ্ডলার প্রতি সন্দেহ জন্মিলে পাছে তাঁহার হৃদয় চিরানিবার্য্য বৃশ্চিকদংশনবৎ হয় এই আশঙ্কায় প্রেমময় নবকুমার একদিনের তরেও সন্দেহকে মনোমধ্যে স্থান দেন নাই। কিন্তু সন্দেহ কেন, যেদিন তাঁহার প্রতীতি

জন্মিয়াছিল। সেদিনও নবকুমার স্থির করিয়াছিলেন "তিনি কপালকুণ্ডলাকে কিছু বলিবেন না। কপালকুণ্ডলার বিশ্বাসঘাতন প্রত্যক্ষীভূত করিবেন, তার পর এ জীবন বিসর্জ্জন করিবেন। কপালকুণ্ডলাকে কিছু বলিবেন না, আপনার প্রাণসংহার করিবেন। না করিয়া কি করিবেন? এ জীবনের দুর্ব্বহভার বহিতে তাঁহার শক্তি হইবে না।" নবকুমারের প্রেম বড় গভীর সত্য কিন্তু তাহার প্রতিদান হয় নাই। পদ্মাবতীর জন্য স্বামিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া কপালকুণ্ডলা যখন ভাবিয়াছিলেন তখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানসলোচনে দেখিয়াছিলেন,—কোথাও কাহাকে তিনি দেখিতে পান নাই। অন্তঃকরণমধ্যে দৃষ্টি করিয়াছিলেন তথায় ত নবকুমারকে দেখিতে পান নাই।

আমরা বিশদভাবে মিরন্দা ও কপালকুণ্ডলাচরিত্র বিশ্লেষণ করিয়াছি। তুলনায় সমালোচন আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। দুইটি সমাজবিরহিত চিত্র দুই বিভিন্নদেশীয় কবির লেখনীতে কেমন দাঁড়াইয়াছে, আমরা তাহাই দেখাইতে চাই।

যে নিয়মে জড়জগৎ শাসিত হইতেছে, অন্তর্জগতের নিয়মও তাহাই।—ভেদ কেবল প্রকারে, বিষয়ে নহে। যে নিয়মে সামাজিক জীবের গঠন, কবির চিত্রও সেই নিয়মের ফল। মানবচরিত্র দেশ ও কালের ফল, কবির চিত্রিত মানবচরিত্রও তাই। মিরন্দা ও কপালকুণ্ডলাচরিত্রও ঐ নিয়মের অবশ্যম্ভাবী ফল। মিরন্দাচরিত্র এবং কপালকুণ্ডলাচরিত্র বিশ্লেষণ করিবার সময় আমরা ইহা একরূপ দেখাইয়াছি, এক্ষণে আরো স্পষ্টীকৃত করিতেছি। মিরন্দাচরিত্রে সমাজের ছায়া প্রতিবিম্বিত হয় নাই; কপালকুণ্ডলাতেও তাহা হয় নাই কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী দৃশ্যসমূহ এবং প্রতিপালকগণের চরিত্রচ্ছায়া উভয়চরিত্রেই পড়িয়াছে। মিরন্দা ও কপালকুণ্ডলা উভয়েরই দর্শনীয় পদার্থ অনন্ত নীলসমুদ্র—সুতরাং উভয়েই উন্নতচরিত্রা; এ সম্বন্ধে উভয়চরিত্রের সামঞ্জস্য আছে। দুই কবিই এ তত্ত্ব পরিস্ফুট করিয়াছেন। অন্তর্জ্জাগতিক আদর্শ মিরন্দার পিতা। আর কপালকুণ্ডলার? করুণাময়ী কালিকা। কাপালিক ও অধিকারী এ উভয়ের কেহই তাঁহার আদর্শ নহেন। তবে তাঁহার অমানুষী চরিত্রবিন্যাসে উভয়েরই কিছু হাত আছে। এ সম্বন্ধে কাপালিকের ধর্ম্মান্ধতার কিয়দংশ মাত্র কপালকুণ্ডলার অভ্যস্ত হইয়াছিল—তাহার ভীষণ কার্য্যকলাপের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র সহানুভূতি ছিল না। বরং সাধ্যমত, তাহার বিঘ্ন ঘটাইতেন। অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে যাহা শিখাইতেন তাহা মনুষ্যত্বপূর্ণ। কালিকার অনন্ত দয়া, পবিত্রভাব তিনিই বালিকার হৃদয়ে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন। মিরন্দা পিতার কোমল হৃদয় পাইয়াছিলেন। উভয়চরিত্রের যে মানবদুর্লভ সারল্য,

মানবসমাজের জ্ঞানাভাব, তাহা সমাজ-বিরহিতার দূগ্ধফল।

মিরন্দার চিত্র যতদূর চিত্রিত হইয়াছে তাহাই পূর্ণ। বিবাহের পর দেশে গিয়া মিরন্দা কেমন "ঘরকন্না" করিয়াছিল, তাহা জানিতে আমাদের সাধ হয় না—কেন না মিরন্দার পূর্ণ চিত্র, আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। যেখানে বিবাহ-বাসরে, মিরন্দার চিত্র পূর্ণ হইয়াছে, কপালকুণ্ডলার চিত্র সেইস্থান হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতেও উভয় কবির কৌশল প্রমাণ করে। পিতা যাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা সেই বিজন দ্বীপে, রাজকুমারের সমক্ষে যেমন পরিস্ফুট হওয়ার কথা, অন্যত্র তেমন নহে। আর কপালকুণ্ডলার অনবনমনীয় অথচ কমনীয় চরিত্রের প্রশস্ত কার্য্যক্ষেত্র মনুষ্য-সমাজ!—নহিলে তাহার গৌরব বুঝা যাইত না। আমরা প্রথমে দেখিয়াই মিরন্দাকে বেশ চিনিতে পারিয়াছিলাম; কিন্তু কপালকুণ্ডলাকে চিনিতে আমাদের দিন লাগিয়াছিল। উভয়েরই দয়ায়, উভয়েরই পবিত্র উন্নতভাবে মোহিত হইয়াছিলাম। উভয়েরই সারল্যের ছবি অনুদিন সংসারের আদর্শ রহিবে।

আর একটি কথা বলিলেই আমাদের এই সমালোচনাশেষ হয়। মিরন্দা যে ফার্দ্দিনান্দকে নয়নগোচর করিয়াই তাহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন, ইহা অনেকেরই মতে উচ্চনীতির বিরুদ্ধ। বাস্তবিকও একেবারেই, গুণাগুণ বিচার না করিয়া কাহাতেও আসক্ত হওয়াতে পশুভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু মিরন্দার প্রেম সে প্রকৃতির নহে। যাহারা তাহার নিন্দাবাদ করেন তাঁহারা না বুঝিয়াই তাহা করেন। সেক্সপীয়র ভীষণ বাত্যার সৃষ্টি করিয়া প্রথমতঃ ফার্দিনান্দের প্রতি মিরন্দার সহানুভূতি করিয়া দিলেন। তাহার উপর কমনীয়, দেবদুর্ল্লভ রূপের জ্যোতি! প্রেমসঞ্চারের এমন অনুকূল অবস্থা আর কি হইতে পারে? সেই বিজন দ্বীপে, সেই ঘটনাস্রোতে, সেইরূপ বহ্নিতে অবোধ মিরন্দাপতঙ্গ যে পড়িবে, তাহাতে কি সংশয় হয়?

বিজনবনদেশে, ভীষণ সুনীল সমুদ্র-তটে, প্রদোষকালে নবকুমারও ঠিক এই অবস্থাসম্পন্ন! তাঁহার প্রণয়ের পরিণাম যাহাই হউক, তাঁহার অতলস্পর্শী গাম্ভীর্য্যের মূল সেই সময় হইতে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। আমরা স্থান, কাল, পাত্রের কার্য্যকারিতা যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে অনেক তত্ত্ব সহসা বুঝিতে পারি!

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

মৎস্যদেশ।

এক্ষণে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে মৎস্যদেশ কোথায়? তাহা হইলে ইহার প্রকৃত উত্তরপ্রদানে সক্ষম এরূপ পণ্ডিত অতি অল্প। যদি মৎস্যদেশের অর্থ 'মৎস্যভোজীর দেশ' এইরূপ করা হয়, তাহা হইলে বাঙ্গালাদেশকে প্রাচীন মৎস্যদেশ স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায়।

কেহ বলেন, প্রাচীন মৎস্যদেশ মেদিনীপুর জেলার সমীপবর্ত্তী ছিল, কেহ বলেন ইহা মালদহের নিকট অবস্থিত ছিল; এই উভয় পক্ষই আপন আপন পক্ষসমর্থন করিবার জন্য নানাবিধ ভগ্নাবশিষ্ট দুর্গাদি প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করেন। বাবু শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় "ভারতবর্ষের বিবরণ" নামক-পুস্তকে বর্ত্তমান জয়পুরকে প্রাচীন মৎস্যদেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আবার সে দিবস গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকৃত ভারতবর্ষের মানচিত্রে দেখিলাম; আধুনিক "বেরারকে" মৎস্যদেশ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে;

ভারতবর্ষের বিভাগস্থলে মনু বলিয়াছেন—

"সরস্বতী দৃষদ্বত্যো র্দেবনদ্যো র্যদন্তরম্
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে।
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পাঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ
এষ ব্রহ্মর্ষি দেশোবৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরম্॥"

পবিত্রজলা সরস্বতী এবং দৃষদ্বতীর মধ্যস্থিত দেবভূমিবৎ পবিত্র দেশকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই ব্রহ্মাবর্ত্তের পরেই ব্রহ্মর্ষি দেশ, যাহার অন্তর্গত চারটি মাত্র প্রদেশ ছিল—কুরুক্ষেত্র, পাঞ্চাল, শূরসেন, এবং মৎস্য।

দ্বিতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যাবসরে কুল্লুক ভট্ট বলেন "মৎস্যাদি শব্দা বহুবচনান্তা দেশবিশেষবাচকাঃ পাঞ্চালাঃ কান্যকুব্জদেশাঃ শূরসেনকাঃ মথুরাদেশাঃ" "মৎস্যাদিশব্দ বহুবচনে প্রযুক্ত হইলে দেশবিশেষের বাচক হয় পাঞ্চাল শব্দে কান্যকুব্জ দেশ, শূরসেন শব্দ মথুরা দেশের নামান্তর।" ইহাতে বোধ হইতেছে যে কুল্লুকভট্টের সময়েও যে ভারতীয় অনেক দেশের প্রাচীন নাম লুপ্ত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তা না হলে তিনি অবশ্য মৎস্যদেশের একটি আধুনিক নাম নির্দ্দেশ করিতেন। কেবল পাঞ্চাল ও শূরসেন এই দুই দেশের আধুনিক নাম দিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। বিক্রমাদিত্যের সময়ও বোধ হয় মৎস্য, পাঞ্চাল, ইত্যাদির পুরাণ নাম লোপ পাইয়াছিল, নতুবা কালিদাস অবশ্য ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরে ঐ সকল দেশের রাজাদিগকে উপস্থিত করিতেন। মেঘের রাস্তার মধ্যেও মৎস্য বা পাঞ্চালের উল্লেখ করেন নাই। সে যাহা হৌক উপরি উক্ত মনুর বচন দ্বারা ইহা স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে

মৎস্যদেশ কুরুক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী ছিল।

সভাপর্ব্বের দিগ্বিজয় পর্ব্বাধ্যায়ে দেখা যায় যে, "মহাবীর ভীমসেন অল্পদিনের মধ্যে অনেক দেশ জয় করিয়া দশার্ণদেশে উপস্থিত হইলেন। তথাকার রাজা সুধর্ম্মা ভীমসেনের সহিত মহা যুদ্ধ করিলেন; কিন্তু ভীম তাঁহাকে পরাজয় করিয়া পরিশেষে মৎস্য এবং মলদদিগকে জয় করিলেন। (ক)

উপরি উক্ত বাক্যদ্বারা অনুভব হয় যে মৎস্যদেশ দশার্ণ এবং মালদদেশের মধ্যবর্ত্তী বা সমীপবর্ত্তী ছিল। কিন্তু দশার্ণ এবং মালদদেশ কোথায় ছিল?

ভারতবর্ষের ভূচিত্রে দেখা যায় অনেক স্থল মাল বা মালয়া নামে বিখ্যাত। কোলাচল মল্লিনাথ মেঘদূতের ২৪ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন "মাল" শব্দে 'উচ্চভূমি' (table land) বুঝায়। "মাল" শব্দের অর্থ 'উচ্চভূমি' হইতে পারে, এবং মেঘদূতের শ্লোকে হয় ত এইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। কিন্তু সংস্কৃত "মালদ" শব্দটীর প্রাকৃত ব্যাকরণানুসারে 'মালয়' এবং ক্রমে ভাষায় 'মালয়া' বা মাল হওয়াও বিচিত্র নয়। উইলফোর্ড সাহেব মেদিনীপুরের সমীপবর্ত্তী মাল ভূমকে 'মাল' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্লিনির মতে পঞ্জাবদেশীয় 'মালী' জাতীয় মনুষ্যদিগের বাসস্থানের নাম 'মাল'। এই মালী জাতীয় মনুষ্যেরা সেকেন্দর সা বা এলেক্জাণ্ডরের সহিত তুমুল যুদ্ধের অনুষ্ঠান করে। এতদতিরিক্ত বাঙ্গালাদেশে মালদহ 'মালদা' জিলা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

মেঘদূতের ১৫ শ্লোকে 'মাল' নামক স্থানের উল্লেখ আছে। উহার ব্যাখ্যাস্থলে উইলসন সাহেব বলেন যে, "মেঘের রাস্তা যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহাতে বোধ হইতেছে যে এই মালদেশ ছত্রিশগড়ের উত্তর বিভাগের প্রধান নগর রতনপুরের সমীপবর্ত্তী কোন স্থান হইবে। কাপ্তেন বুণ্টও আপনার ভ্রমণবৃত্তান্তে এইরূপ লিখিয়াছেন; এবং অদ্যাপি রতনপুরের উত্তরে 'মালদ' নামক স্থান লক্ষিত হয়। টলেমীর ভূচিত্রে বিন্ধ্যাচলের নিকট 'মালিত্র' নামক স্থান দৃষ্ট হয়, এবং উহার সহিত শ্লোকোক্ত 'মাল' নামক স্থানের ঐক্য আছে।"

অতএব মালদদেশ কোথা ছিল ইহা যদি স্থির হইল বোধ করা হয় তাহা হইলে দশার্ণদেশ সেই স্থানের সমীবর্ত্তী ছিল কি না দেখা আবশ্যক।

(ক) "বিজিত্যাল্পেন কালেন দশার্ণানজয়ৎ প্রভুঃ।
তত্র দশার্ণকো রাজা সুধর্ম্মা লোমহর্ষণম্।
কৃতবান্ ভীমসেনেন মহদ্‌যুদ্ধং নিরায়ুধম্।
যুধ্যমানং বলাৎসংখ্যে বিজিগ্যে পাণ্ডর্ষভঃ।
ততো মৎস্যান্ মহাতেজা মালদাংশ্চমহাবলঃ॥

উইলসন সাহেব মেঘদূতের ২৪ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন যে "দশার্ণদেশ কোথায় ছিল, এক্ষণে তাহার কোন চিহ্নই দৃষ্ট হয় না। মেজর উইলফোর্ড সাহেব পৌরাণিক নামের তালিকায় ইহাকে বিন্ধ্যাচলের সমীপবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহার মতানুসারে টলেমীর দশারিন (Dasarine) দশার্ণ দেশ, যে আধুনিক ছত্রিশগড়ের কোন অংশ ছিল, এরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে, কারণ 'ছত্রিশগড়' এবং 'দশার্ণ' এই উভয় শব্দের প্রকৃতিগত অঙ্গাঙ্গিভাব লক্ষিত হয়; ছত্রিশগড় শব্দের যৌগিক অর্থ যাহাতে ছত্রিশটি দুর্গ আছে, ওদিকে দশ এবং ঋণ (দুর্গ এই দুইটী শব্দের অর্থ দশ দুর্গযুক্ত দেশ বুঝায় অতএব উহা ছত্রিশ দুর্গযুক্ত দেশের অন্তর্গত হইবার সম্ভাবনা।"

দশার্ণদেশ যদি ছত্রিশগড়ের অন্তর্গত হয় তাহা হইলে উইলসন সাহেবের পূর্ব্বোল্লিখিত কথামত দশার্ণদেশ রতনপুরের নিকট ছিল। আর দেখা যাইতেছে যে সেই স্থানেই মালদদেশও ছিল অতএব মৎস্যদেশও সেই স্থানের সমীপবর্ত্তী থাকা সম্ভব।

মহাভারতের বিরাটপর্ব্বে, পাণ্ডবেরা যখন কাম্যকবন হইতে বিরাটনগরে প্রবেশ করেন তাঁহাদের পথ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

"উত্তরেণ দশার্ণাংস্তে পাঞ্চালান্ দক্ষিণেন চ
অন্তরেণ যকৃল্লোমান্ শূরসেনাংশ্চ পাণ্ডবাঃ
লুব্ধা ব্রুবাণা মৎস্যস্য বিষয়ং প্রাবিশৎ বনাৎ।"

পাণ্ডবেরা দাশার্ণদেশের উত্তর দিয়া পাঞ্চাল দেশের দক্ষিণ দিয়া যকৃল্লোম এবং শূরসেনের মধ্য দিয়া আপনাদিগকে ব্যাধরূপে প্রসিদ্ধি করত মৎস্যদেশে প্রবেশ করিলেন। ইহা দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে মৎস্যদেশ শূরসেন অর্থাৎ মথুরা দেশের পশ্চিমে ছিল।

মৎস্যদেশের আর একটি নাম বিরাটদেশ। এই বিরাট শব্দ প্রাকৃত ভাষায় "বিরাড়" এবং উহা হইতে দেশী ভাষায় 'বিরার' বা 'বেরার' হইয়া থাকিবে।

যখন কুরুগণ বিরাটরাজার গোহরণ করিবার অভিপ্রায়ে বিরাটনগর আক্রমণ করেন তখন এইরূপ বর্ণন করা হইয়াছে যে মৎস্যদেশ হস্তিনাপুরের আগ্নেয় কোণে অবস্থিত ছিল এবং হস্তিনাপুর হইতে সেখানে গমন করিতে দুইদিনের অধিক সময় লাগিত না। যথা

"তে স্ম গত্বা যথোদ্দিষ্টাং দিশং বহ্নের্মহীপতে।
সম্বদ্ধা রথিনঃ সর্ব্বে সপদাতা বলোৎকটাঃ
প্রতিবৈরং চিকীর্ষন্তো গোষু গৃদ্ধা মহাব্রতাঃ
অপরে দিবসে সর্ব্বে রাজন্ সম্ভূয় কৌরবাঃ।
অষ্টম্যাং তেন্যগৃহ্নন্ত গোকুলানি সহস্রশঃ।"

অদ্যাপি বিরাট জিলায় হাথনাপুর নামক স্থান বর্ত্তমান আছে ইহাই পূর্ব্বকালের হস্তিনাপুর বলিয়া প্রসিদ্ধ। যদি

বাস্তবিক উহা হস্তিনাপুর হয় তা হলে অনায়াসে আমরা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে মৎস্যদেশ দিল্লী এবং মথুরার মধ্যবর্ত্তী ছিল।

দিল্লী এবং আগরা রোডের ধারে গুর্‌গাঁর নিকট 'উপেলো' নামক একটি স্থান দৃষ্ট হয়। ইদানীং ভাষাতত্ত্ব বিদ্যার যেরূপ প্রাদুর্ভাব তাহাতে 'উপেলো' কথাটি যে সংস্কৃত 'উপপ্লবের' অপভ্রংশ ইহা নির্ব্বিরোধে স্বীকার্য্য। ভাল 'উপেলো' 'উপপ্লবের' অপভ্রংশ হৌক তাহাতে প্রকৃত বিষয়ের উপযোগিতা কি? ইহার উত্তরে আমরা বলিব উদ্যোগপর্ব্বে দৃষ্ট হয়—

"উপপ্লব্যং সমাগত্য স্কন্ধাবারং প্রবিশ্য চ।
পাণ্ডবানথতান্ সর্ব্বান্ শল্যস্তত্র দদর্শ হ॥"

শল্য উপপ্লব্যনগরে গমন করিয়া স্কন্ধাবারের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক সমুদয় পাণ্ডবদিগকে দর্শন করিলেন। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন "উপপ্লব্যং বিরাটনগরস্থ প্রদেশবিশেষং" উপপ্লব বিরাটনগরের অংশবিশেষ। উপেলো যে প্রাচীন উপপ্লব ইহা তত্রত্য পণ্ডিতেরা মুক্তকণ্ঠে বলিয়া থাকেন।

এক্ষণে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন মহাভারতের অনেক স্থলে মৎস্যদেশ দশার্ণদেশের সমীপবর্ত্তী বলিয়া কথিত হইয়াছে। যদি ছত্রিশগড়ের কোন অংশ দশার্ণ হয় এবং মৎস্যদেশ মথুরার নিকট হয় তা হলে মহাভারতের সঙ্গতি কিরূপ? আমরা বলিব দশার্ণ কোথায় ইহা স্থির করিতে আমরা আপাততঃ কোন প্রমাণ হস্তগত করিতে পারি নাই স্নুতরাং উইলসন সাহেবকে নিরস্ত করিতে অক্ষম। তবে এ কথা অবশ্য বলিতে পারি যে যদি দশার্ণ শব্দের যৌগিক অর্থ দশগড় বলিয়া ইহাকে ছত্রিশগড়ের অংশবিশেষ বলা হয় তা হলে ঐ এক যুক্তিতে পঞ্চাননকে দশাননের অংশবিশেষ বলা যাইতে পারে।

যাহা হৌক কালিদাসের দশার্ণ ছত্রিশগড়ের নিকট হইলেও মহাভারতের দশার্ণ যে হিন্দুস্থানে মথুরার সমীপে ছিল সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। অদ্যাপি হামিরপুর জিলায় দশার্ণা নামে একটি নদী দৃষ্ট হয়। মূলকথা প্রাচীনদেশ আমাদের বাঙ্গালা নহে। বিন্ধ্যাচলের উত্তরে যেস্থানে মৎস্যদেশ ছিল তাহা নিশ্চয় না হউক, কতকাংশে উল্লিখিত প্রমাণাদির দ্বারা অনুভব হইতে পারে।

হ, কে, ভ,

শঙ্করাচার্য্যের তিরস্কার।

এবার আপনার ছাপাখানার ভূতে-দের উপর নালিশ। আমি গতসংখ্যক বঙ্গদর্শনে আমার নালিশে লিখিয়াছিলাম "তোমরা মুচিকে ঋষি বল দাসকে দেব বল,কেন না তবে আমায় বড়মানুষ বল।" আপনার ভূতেরা নিঃসঙ্কোচচিত্তে সেই ঋষি কাটিয়াছে। এক্ষণে বাঙ্গালায় প্রায়শ্চিত্ত উঠিয়া গিয়াছে, আর বড় পাপের ভয় নাই, যাহা কিছু ভয় কেবল পেনেলকোডের। কাজেই এ যাত্রা ঋষি কাটিয়া তাহারা পরিত্রাণ পাইল।

যদি তাহারা আমার ভ্রম হইয়াছে বুঝিয়া এই কাটাকাটি করিয়া থাকে, তবে তাহারা আমার সঙ্গে পূর্ব্ববাঙ্গালায় চলুক—স্থানে স্থানে দেখিবে, কত মহা-পুরুষ শকুনী, গৃধিনী, কুক্কুরী প্রভৃতির সহিত মরাগরু লইয়া টানাটানি করি-তেছে। জিজ্ঞাসা কর তাহাদের উপাধি কি,তাহারা অম্লানবদনে বলিবে "আমরা ঋষি।" তাহারা নিশ্চয়ই বাঙ্গালার ঋষি।

আবার পশ্চিম বাঙ্গালায় চলুক—দেখিবে, জেলেরা জাল হাতে মৎস্য শিকার করিতেছে, তাহাদের উপাধি জিজ্ঞাসা কর,তাহারা অম্লানবদনে বলিবে "আমরা পণ্ডিত।" বাঙ্গালার এইরূপ পণ্ডিত বটে তাহার আর সন্দেহ নাই!

যাহারা তোমাদের ভিটায় ঘুঘু চরায় তাহাদিগকে তোমরা মহাজন বল, তোমাদের যেমন ঋষি, যেমন পণ্ডিত, তেমন মহাজন। জিজ্ঞাসা করি কথার এরূপ বিপরীত অর্থ তোমাদের বাঙ্গালায় কোথা হইতে হইয়াছে?

কলিকাতায় গিয়া জিজ্ঞাসা কর এ কাহার বাটী, লোকে মুক্তকণ্ঠে উত্তর দিবে "দাসবাবুদের।" অথবা বলিবে "হলা দাসের পুত্র বলাই দেবের বাটী।" দাসের ঘরে দেব! অসম্ভব নহে; এক্ষণে অনেক দেব স্বর্গ ছাড়িয়া আসিতেছেন সেখানে আর স্থান হয় না। যে অবধি রেলওয়েয়ালা প্রত্যেক তীর্থস্থান আয়-ত্তের মধ্যে আনিয়াছে, সেই অবধি স্বর্গে বড় ভীড় হইয়াছে। পূর্ব্বে যখন স্বর্গ প্রস্তুত হয়, রেলওয়েরসঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম যে বাড়িবে এ অনুভব তখন হয় নাই; কাজে কাজেই স্বর্গের আয়তন উচিত মত করা হয় নাই, এখন কয়েকবৎ-সরের মধ্যে বিস্তর লোক স্বর্গে গিয়া পড়িয়াছে, তথায় সকল দ্রব্যই দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে, দুর্ভিক্ষ হইবার নিশ্চয় সম্ভাবনা হইয়াছে। এই শুনিয়া স্বয়ং নারায়ণ গিয়া বন্দোবস্তের চেষ্টা করিয়া-ছিলেন, কিন্তু কিছু করিতে পারেন নাই। রেলওয়ে বন্ধ না করিলে ত ধর্ম্মবন্ধ হয় না, রেলওয়ে আবার খ্রীষ্টানদের হাতে। নারায়ণ নিজে চক্রী, অনায়াসে খ্রীষ্টান-দের চক্র বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহারা

আপনাদের স্বর্গ নির্জ্জন রাখিতে চান, আর হিন্দুর স্বর্গে লোক ঠাসিতে চান। অতএব নারায়ণ তৎক্ষণাৎ বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকিয়া স্বর্গ বাড়াইতে হুকুম দিয়াছিলেন; কিন্তু বিশ্বকর্ম্মা কি করিবেন, বজেটে টাকা নাই, তাতে আবার কয় ক্রোর টাকা গরমিল হইয়াছে, বিশেষতঃ কুবের ইস্তফা করেছে, কাজেই স্বর্গ আর বাড়ান হইল না; এদিকে খ্রীষ্টানেরা নিতান্ত ঈর্ষাপরবশ হইয়া রেলওয়ে বাড়াইতে লাগিল, এক্ষণে স্বর্গে আর স্থান হয় না, কাজেই দেবতারা পলাইয়া যথা তথা জন্মগ্রহণ করিতে লাগিলেন। দাসের ঘরে দেব, মুচির ঘরে ঋষি আসিয়া জন্মিতে লাগিল।

যাহা বলা হইল এইরূপ ঘটনা যদি বাস্তবিক না হয়, তবে তোমাদের দাসের ঘরে দেব আসিল কিরূপে, বুঝা যায় না। দাসেরা দেব, মুচিরা ঋষি, বাঙ্গালার এই প্রধান পরিচয়। ইহা শুনিলে তোমাদের সমাজসম্বন্ধে আর কোন কথাই জিজ্ঞাসা থাকে না।

দেনাদারবাহাদুরেরা তোমাদের রাজা-বাহাদুর। মহাদেনাদার হইলে মহারাজ। যে বুদ্ধিতে মুচিকে ঋষি বল, দাসকে দেব বল, এখানেও দেখি সেই বুদ্ধি। রাজা শব্দ তোমরা কেন লইয়া এত উপহাস কর? বাস্তবিক কি তোমরা কেবল রহস্য করিবার নিমিত্ত এই সকল কথার কুপ্রয়োগ করিয়া থাক? তোমাদের মধ্যে কেহ ঋষি নাই, তাই কি মুচিকে ঋষি বল, তোমাদের দেবতা নাই, তাই কি দাসকে দেব বল? অথবা মুচিরাই তোমাদের চক্ষে হয় ত বাস্তবিক ঋষি, দাসেরা তোমাদের চক্ষে হয় ত বাস্তবিক দেব, তাহাই এ সকল ভ্রমাত্মক কথা প্রয়োগ করিয়া থাক, যদি তাহা না হয়, তবে পরামর্শ গ্রহণ কর; "রাজা" কথায় আপনা আপনি ঘৃণা জন্মাইও না, শেষ ঠকিতে হইবে। তোমাদের যেরূপ সামাজিক অবস্থা, তাহাতে বহুকাল অবধি রাজা আবশ্যক হইবে, অতএব এখনি রাজভক্তি ছাড়িও না। এই সকল ব্যক্তিকে রাজা বলিলে শীঘ্রই রাজা শব্দে ঘৃণা জন্মিয়া যাইবে। যাত্রাওয়ালা রাজা সাজিয়া যখন "বাং কহ দ্বারি" বলিয়া লোক হাসাইত, তখন সকলেই বুঝিত, যাত্রাওয়ালা কখন রাজা দেখে নাই। কিন্তু এক্ষণে দেনাদারবাহাদুরেরা রাজাস্বরূপ সর্ব্বত্র দেখা দিতেছেন। কাজেই লোকের রাজভক্তি ক্রমে কমিতে আরম্ভ হইয়াছে। সামান্য লোকেরা কে বুঝিবে যে এ রাজা সে রাজা নয়; তাহারা বলিবে "রাজা নাম দিয়াছ আবার রাজা নয় কেন?" সতরঞ্চির রাজা, যাত্রাওয়ালার রাজা, তবে বল এ আবার কোন্ রাজা?

কেহ বলেন ইহারা দুর্ভিক্ষের রাজা, কেহ বলেন, চাঁদার রাজা, কেহ বলেন, "ভাস্থান" রাজা। কেহ বলেন, শিবরপুলি রাজা। কেহ বলেন, রাজা ব্যা-

জড়া। কেহ বলেন, বিলাতি জিনিসের মধ্যে এরাও এক জিনিস, অতএব ইহারা রাজার বিলাতি। যাহা হউক, এখনও সময় আছে। রাজা শব্দ এখনও উদ্ধার করা যায়, অতএব উদ্ধার কর। প্রয়োজন হয় ইংরেজেরা দুর্ভিক্ষবাহাদুরদিগকে লর্ড করুন। বিদ্যাসম্বন্ধে ইংরেজি উপাধি ত চলিয়াছে, বি, এ, এম, এ, এখন সকলে বুঝিয়াছে, লর্ড হলধর, লর্ড বলাইচাঁদ বলিলে সকলেই বুঝিবে, হলা, বলাও খুসী হইবে, বরং থ্যাঙ্ক (thank) দিবে।

এক সময় আমি দেখিয়াছিলাম, তোমাদের বাঙ্গালায় রাজার প্রয়োজন ছিল না। প্রত্যেক বাঙ্গালির স্বভাব এত সুন্দর ছিল যে মেজেষ্টারের কোন কার্য্য ছিল না। চুরি, ডাকাতি ছিল না, কেহ মিথ্যা বলিত না, কেহ বঞ্চনা করিত না। যদি হঠাৎ কেহ অপরাধী হইত, সে তৎক্ষণাৎ আপনার দণ্ড আপনি বিধান করিত, আইনব্যবসায়ীকে তৈলবাট দিয়া জিজ্ঞাসা করিত, আমার অপরাধের দণ্ড কি? ভট্টাচার্য্য শাস্ত্র খুলিয়া ব্যবস্থা লিখিয়া দিতেন। তাহার নাম প্রায়শ্চিত্ত। সেই ব্যবস্থা অনুসারে যে কয়টাকা জরিমানা হইত, অপরাধী তাহা অতি প্রসন্নমনে সমাজে সমর্পণ করিত, সকল ঘরে ঘরে তাহা বাটিয়া দিয়া আসিত। তোমাদের যে এইরূপ ব্যবহার ছিল, এখনও বরং তাহার কিঞ্চিৎ চিহ্ন আছে। প্রায়শ্চিত্ত বা দণ্ড যে কেবল কয়েক কাহন কড়ি ছিল এমত নহে, তুষানল পর্য্যন্ত ছিল, তুষানল অতি ভয়ানক ব্যাপার; ইহাও বাঙ্গালিরা স্বইচ্ছায় গ্রহণ করিত। এরূপ আত্মদণ্ড আর কোন্ জাতিতে বিধান করিতে পারে? তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ তাহা পারিত।

অপরাধী হইলে যাহারা আত্মদণ্ড করিতে পারিত, যাহারা তুষানল পর্য্যন্ত স্বীকার করিত, তাহাদের আর রাজার প্রয়োজন কি ছিল? যদি সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি সচ্চরিত্র হয়, অন্যের অনিষ্ট কোনরূপে না করে, তবে রাজার কেন আবশ্যক? তোমরা ভাবিতেছ আমি অসম্ভব কথা বলিতেছি? ইংরেজদিগের নিকট তোমরা এ কথা কখন শুন নাই তাহাই অসম্ভব ভাবিতেছ। ভাল, Social Statics পড়, বা সেই জাতীয় অন্য গ্রন্থ পড়, দেখিবে স্পষ্ট লেখা আছে যে সমাজ উন্নত হইলে আর গবর্ণমেণ্টের (Government) প্রয়োজন নাই। যদি অন্য দেশসম্বন্ধে ইহা সত্য হয় তবে বাঙ্গালার পক্ষে তাহা সত্য কেন না হইবে? সমাজঅনুসারে রাজশাসন; পৈশাচিকবৎ সমাজ হইলে কঠিন রাজশাসনের আবশ্যক, আর যদি দেবতুল্য সমাজ হয় তবে রাজশাসনের প্রয়োজন কি? দেবতুল্য সমাজ হইলে ত হইতে পারে, ব্যক্তি লইয়া সমাজ, অতএব ব্যক্তিরা যেরূপ, সমাজও ঠিক সেইরূপ হইবে। ব্যক্তিদের যে দোষ থাকিবে সমাজেও

ঠিক সেই দোষ থাকিবে। ব্যক্তিদের যে গুণ থাকিবে, সমাজেরও সেই গুণ ঘটিবে। ইংরেজদের মধ্যে একজন মহাবিজ্ঞব্যক্তি লিখিয়াছেন যে, "The character of the aggregate is determined by the characters of the units." তিনি আর একস্থানে লিখিয়াছেন "given the nature of the units, and the nature of the aggregate they form is predetermined." কাজেই তোমরা নিজে দেবতার ন্যায় হইলে তোমাদের সমাজও দেবতুল্য হইবে। এক সময় বাঙ্গালায় তাহাই হইয়াছিল।

বিনা মসলায় ইষ্টকদ্বারা প্রাচীর গাঁথা যাইতে পারে, কিন্তু গোলাদ্বারা কখনই সেরূপ প্রাচীর গাঁথা যায় না, গোলার স্তূপ হইতে পারে, কিন্তু তাহাও গোলার প্রকৃতিমত হইবে, ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীরের মত ঊর্দ্ধ অধঃ সমুদয় সমান পরিসর হইবে না। তাহাই বলিতেছিলাম, সমাজের প্রকৃতি ব্যক্তিগত। যাহারা তোমাদের লইয়া ভাল সমাজ গঠিতে চাহেন, তাঁহাদের ভুল; তোমাদের নিজের যে গুণ নাই সমাজে তাহা কোথা হইতে আসিবে? এক্ষণে চারিদিকে সাময়িকপত্রলেখকেরা সমাজসংস্কার লইয়া যে গলাবাজি করিতেছেন, তাহা অনর্থক। টেবলে বসিয়া খাইলে কিম্বা ধুতি চাদর ত্যাগ করিলে অথবা মথুরমণিকে মথুরমণি বন্দ্যোপাধ্যায় বলিলে সমাজসংস্কার হইবে না, আপন আপন স্বভাবের সংস্কার কর, সমাজের সংস্কার আপনিই হইবে। যতদিন তাহা না পার, ততদিন সমাজের উপর কোন কথা বলিতে সাহস করিও না। সমাজ কেহ ফর্‌মাইস দিয়া আপনার ইচ্ছামত করিয়া লইতে পারে না, সমাজের পরিবর্ত্তন আপনিই হয়, যেরূপ ব্যক্তিগত সংস্কার হইতে থাকে, সেইরূপ সমাজেরও সংস্কার হইয়া পড়ে।

এত কোটি লোকের স্বভাবসংস্কার হঠাৎ একেবারে হয় না, হওয়াও সম্ভব নহে, যেরূপ ক্রমে ক্রমে তাহাদের চরিত্রসংস্কার হইবে, সঙ্গে সঙ্গে সমাজেরও সেইরূপ সংস্কার আরম্ভ হইবে।

এখনও তোমরা মুচিকে ঋষি বল, দাসকে দেব বল, তোমাদের এখনও অনেক বাকি; প্রথমে মুচিকে মুচি বলিতে শিখ, জেলেকে জেলে বলিতে শিখ, দাসকে দাস বলিতে শিখ, তাহার পর অন্য কথা হইবে। অর্থাৎ যথার্থ নাম করিতে শিক্ষা কর। শিশুরা প্রথমে নাম শিখে, তোমরা এক্ষণে সমাজসম্বন্ধে শিশু, অতএব নাম শিখ। পরে যদি পার আপন আপন চরিত্র সংস্কার করিবার চেষ্টা পাও; "আমি একা পবিত্রচরিত্র হইলে কি হইবে?" মনে করিয়া হতাশ্বাস হইও না; একজনের চরিত্র ভাল হইলে সহস্র লোকের চরিত্র সহজেই উন্নত হইবে। আপাততঃ ইতি।

শঙ্করাচার্য্য বঙ্গদেশী।

ভূতের জাতি।

ভূতের জাতি বলিলে কাহাদের বুঝায়, তাহা বাঙ্গালায় বড় বলিয়া দিতে হয় না ; বুদ্ধিমান্ বাঙ্গালিরা তাহা একপ্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। কাফ্রি ও অন্যান্য দেশে ভূতের জাতি সাহেবদের বলে।* মঙ্গোপার্ক আফ্রিকার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন তাঁহাকে দেখিয়া দুইজন কাফ্রি রুদ্ধশ্বাসে পলায়, প্রায় অর্দ্ধক্রোশ গিয়া আর দুই চারিজন স্বদেশীয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাদের ভয় যায়। কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রিরা মঙ্গোপার্ক সাহেবকে যে ভূত মনে করিয়াছিল তাহা কেবল তাঁহার বর্ণের দোষে। কাফ্রিরা মনে করে মনুষ্যের কখন শ্বেতবর্ণ হইতে পারে না, শ্বেতবর্ণ ভূতের। অনেকস্থানে ভূত আর শ্বেতমনুষ্য উভয় অর্থে এক শব্দই প্রয়োগ হয়।

কেবল কাফ্রিরা কেন, দক্ষিণসমুদ্রের উপদ্বীপে যত কৃষ্ণবর্ণ জাতি বাস করে, সকলেরই বিশ্বাস মনুষ্য মরিয়া ভূত হয়, কিন্তু ভূত হইলে বর্ণ ভিন্ন আর কিছুরই পরিবর্ত্তন হয় না; মনুষ্য অবস্থায় যে আকার, যে প্রকার, যে বয়স ছিল, তাহা সকলই থাকে, কেবল বর্ণপরিবর্ত্তন হয়। সাহেবদের মধ্যে কাহাকে তাহারা দেখিলে, কাজেই মনে করে, এ ব্যক্তি পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে একজন ছিল, মরিয়া এই দশাপ্রাপ্ত হইয়াছে। অর্থাৎ ভূত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কেহ একজন মরিল, অমনি তাহারা নিশ্চয় বুঝিল যে, সাহেবদের মধ্যে একজন বাড়িল। সাহেবদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, ইহা তাহারা অনেকে বিশ্বাস করে না। ভূত ত জন্মে না, তাহারা বলে মনুষ্য যে বয়সে মরে, প্রেতদশায় সেই বয়স প্রাপ্ত হয়। কাজেই সাহেবদের জন্ম হয় না। যদি তাহারা সাহেবদের শিশু দেখে তাহা হইলে মনে করে অবশ্য তাহাদের কাহার শিশু মরিয়াছিল। যুবাসাহেব দেখিলে সেইরূপ মনে করে যুবার ভূত।

একবার অষ্ট্রেলিয়া দেশে পুত্রশোকাকুলা একজন বৃদ্ধা (Sir George Grey) সর্ জর্জ গ্রেকে দেখিয়া পরমাপ্যায়িত হয়, তাহার নিশ্চয় ধারণা হয় যে, তাহার মৃতপুত্র আসিয়াছে, অতএব সর্ জর্জকে বৃদ্ধা কতই আদর করিয়াছিল।

একবার টমসন সাহেবের মেমকে দেখিয়া অষ্ট্রেলিয়ার একাংশের আবালবৃদ্ধ সকলেই চিনিয়াছিল যে, কিছুদিন পূর্ব্বে মেমসাহেব তাহাদের মধ্যে একজন ছিল, তখন মনুষ্য ছিল, জীবিত ছিল, এক্ষণে বেচারা আর মনুষ্যও নাই, জীবিতও নাই, খাটি ভূত হইয়াছে। বাস্তবিক তাহারা মনে করিতে পারে যে শ্বেতকায়পুরুষেরা যদি ভূত না হবে, তবে

* Krumen call Europeans the Ghost-tribe—*Burton.*

তাহাদের এত ক্ষমতা, এত বৈভব কিরূপে হইল?

বন্যজাতিরা সাহেবদের কেন ভূত বলে, তাহার কারণ (Bonwick) বনউইক সাহেব এই অনুভব করেন যে, বন্যরা মৃতমনুষ্য আহারের পূর্ব্বে ছাল ছাড়াইবার সময় দেখে যে, তাহার ভিতর শাদা, অতএব শাদাই যে ভূতের বর্ণ ইহা তাহাদের নিশ্চয় বোধ হইয়া পড়ে।

আমাদের ভূতের শ্বেতবর্ণ কি কৃষ্ণবর্ণ তাহার নিশ্চয়তা নাই, কিন্তু আমাদের মনুষ্য মরিলেই যে ভূত হয় ইহার নিশ্চয়তা আছে। তাহারা দৌরাত্ম্য করে, গাছ ভাঙ্গে, ছেলেপিলের ঘাড় ভাঙ্গে, তবে বন্যজাতির ভূতের ন্যায় তাহারা রীতিমত সংসার করে না, চাকুরিও করে না, বরং কিছু স্বাধীন, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে, যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই যাইতে পারে। বোধ হয় কিছু অন্নাভাব, পয়সা কড়ির বড় সংস্থান থাকে না, মৎস্য তাহারা বড় ভালবাসে, অথচ তাহা সংগ্রহ করিতে পারে না; কেহ কোথায় মৎস্য লইয়া যাইতেছে দেখিলে, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ "দেনা দেনা" বলিয়া ছুটিতে থাকে। তদ্ভিন্ন আমাদের ভূতের গঠন বড় সুন্দর নহে; ভাল ভাল লোকের মুখে শুনা যায়, তাহাদের পা দুখানি বাঁকা আর তাহাদের হাসি বড় বিকট; কিন্তু এ সকল বিষয়ে সাহেব ভূতের জিত আছে, সুগঠন আবার স্বর্ণেরও অভাব নাই, তাহাই বন্যরা বলে যে মরিলে they will jump up white men with plenty of sixpence in their pockets (*Spencer*)

বিলাতিভূত এক্ষণে সকলদেশই ব্যাপিয়াছে, তাহাদের এক্ষণে জয়জয় কার। ইহার কারণ আর কিছুই নহে কেবল মাত্র তাহাদের বর্ণ; কৃষ্ণবর্ণ অপকৃষ্টতার পরিচায়ক, কখনই কৃষ্ণবর্ণজাতি পৃথিবীতে প্রধান হয় নাই। যাহারা চিরকাল এ পৃথিবীতে জয়ী, তাহাদের মধ্যে কোন জাতিই কৃষ্ণবর্ণ ছিল না। মিশরদেশে যাঁহারা রাজ্যস্থাপন করিয়া কীর্ত্তিপতাকা তুলিয়া ছিলেন, তাঁহারা কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন না, আফ্রিকাদেশে সকল জাতিই কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু মিশরবাসীদের বর্ণ সুন্দর ছিল। তাহাই তাঁহাদের এত প্রতিপত্তি হইয়াছিল। আর্য্যেরা সাবেক আমলের প্রধান ছিলেন, তাঁহারা সমুদয় ভারতবর্ষ ও ইউরোপ ব্যাপিয়া ছিলেন, সেই আর্য্যেরা শ্বেতবর্ণ ছিলেন। তাতারজাতিরা চীনরাজ্য জয় করিয়া তথায় বাস আরম্ভ করিয়াছে, তাতারীয়েরা কৃষ্ণবর্ণ নহে। কাফ্রিদের মধ্যে ডেঙ্কাজাতির বিষয়ে সুইনফোর্ড সাহেব বলেন যে তাহারা কৃষ্ণবর্ণ বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা পর্ব্বতে বাস করে, তাহারা বড় কাল নহে, ডেঙ্কাজাতির মধ্যে সেই পার্ব্বতীয়েরাই প্রধান।

লিবিংষ্টোন সাহেব বলেন যে, কেবল সূর্য্যের তাপে লোকে কাল হয় না, সূর্য্যের উত্তাপ আর ভিজে হাওয়া এই দুই

একত্রে মনুষ্যকে কাল করে।* আর অনেকে বলেন যে এই দুই একত্রে লোককে দুর্ব্বল ও নিস্তেজ করে।

পৃথিবীর মধ্যে উত্তর আফ্রিকা, আরবস্থান, পারস্যদেশ, তিব্বৎ ও মগলদেশ প্রভৃতি সংলগ্ন দেশসমূহ ইংরেজি মানচিত্রে বৃষ্টিহীন rainless district, বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এই সকল দেশে বড় বৃষ্টি হয় না, ইহাদের হাওয়া কাজেই ভিজে নহে, তথাকার অধিবাসীরা কাজেই কৃষ্ণবর্ণ নহে। ইহারাই চিরকাল পৃথিবী জয় করিয়াছিল। আর্য্যেরাও এই অংশ হইতে আসিয়া ভারতবর্ষ প্রথম জয় করেন, পরে তাঁহাদের বংশ ভারতবর্ষের সূর্য্যতাপে ও জলসম্পৃক্তবায়ু দ্বারা ক্রমে নিস্তেজ ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া পড়িলে আবার সেই বৃষ্টিহীন অঞ্চল হইতে বাবর সা প্রভৃতি আসিয়া ভারতবর্ষ জয় করেন, তাহার পর বাবরের বংশাবলীরও সেই দশা হয়। এক্ষণে আর এক শ্বেতবর্ণজাতিরা আসিয়া ভারতজয় করিয়াছেন। আর্য্যদের যে বংশ ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করিলেন, তাঁহারা জলসম্পৃক্তবায়ুর দোষে নিস্তেজ হইয়া গেলেন কিন্তু তাঁহাদের যে বংশইউরোপে বাস করিয়াছিল, এক্ষণে সেই বংশ আসিয়া ভারতবর্ষ জয় করিল। সুবিধার মধ্যে ইংরেজেরা ভারতবর্ষে বাস করিলেন না, বাস করিলে তাঁহারাও আমাদের মত হইয়া যাইতেন, অন্যে আসিয়া আবার তাঁহাদের জয় করিত। যাঁহারাই ভারতজয় করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ভারতে বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহারাই অধঃপাতেগিয়াছিলেন; ইংরেজেরা সে বিপদের পথ ছাড়াইয়াছেন। ভারতবর্ষে ইংরেজবাস করিবার একবার প্রস্তাব হইয়াছিল, কি কারণে তাহার অনুমোদন হইল না তাহা আমাদের এক্ষণে ঠিক স্মরণ নাই, কিন্তু বোধ হয় এ প্রস্তাব আবার হইবে।

অতিরিক্ত সূর্য্যতাপ আর তাহার সঙ্গে জলসম্পৃক্তবায়ু এই দুই আমাদের ভারতবর্ষের মূল দুর্ভাগ্য, বিশেষতঃ বাঙ্গালার পক্ষে। রাজপুতানা হইতে দক্ষিণ কতক দূর পর্য্যন্ত এই স্থানের বায়ু জলসম্পৃক্ত নহে, এইজন্য তথাকার অধিবাসীরা ভারতবর্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মুসলমানেরা এই অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট বড় একটা প্রভুত্বলাভ করিতে পারেন নাই। অদ্যাপি ভারতের যাহা কিছু গৌরব আছে তাহা কেবল এই রাজপুতানা অঞ্চলসম্বন্ধে।

বাঙ্গালার উল্লেখ করিতে বড় কষ্ট হয়। সূর্য্যতাপ আর জলসম্পৃক্ত বায়ু বাঙ্গালায় যেরূপ ভয়ানক সেরূপ অন্যদেশের দুর্ভাগ্যে কোথাও ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। চিরকালই এই কারণে বাঙ্গালা নিস্তেজ রহিয়াছে, চিরকালই হয় ত এইরূপ নিস্তেজ থাকিবে। মহাপরাক্রান্ত আর্য্যেরা আসিয়া বাস করিলেন, কয়েক পুরুষের মধ্যে নিস্তেজ হইয়া গেলেন।

* Miss. Trav. Page 78

তাহার পর মোগল পাঠানেরা আসিয়া বাস করিল, তাহাদেরও সেই দশা হইল। যে কয়েকঘর পর্ত্তুগিস আসিয়া বাস করিয়াছে, তাহারাও মাটী হইয়া গিয়াছে। উপহাস করিয়া লোকে তাহাদের এক্ষণে মেটে ফিরিঙ্গি বলে।

বাঙ্গালার বায়ু কস্মিন্‌কালে যে সংশোধিত হইবে না এমত ঠিক বলা যায় না। দেখা যাইতেছে কোন কোন দেশের বায়ু কৌশলদ্বারা কতকাংশে সংশোধিত হইয়াছে। যেখানে অতিরিক্ত বৃষ্টি হইত, সেখানে জঙ্গল কাটায় বৃষ্টি কমিয়াছে। বাঙ্গালায় সেরূপ অরণ্য নাই, এখানে বৃষ্টির হেতু বোধ হয়, আসাম ও ভুটানের পর্ব্বতশ্রেণী। অতএব জঙ্গল কাটিলে বৃষ্টি কমিবে না, তবে পয়ঃপ্রণালী বিশেষমত নূতন করিতে পারিলে বোধ হয় বৃষ্টির দোষ অর্থাৎ ভিজেমাটী, কতক কমিতে পারে। মাটী ভিজে থাকিলে বায়ু ভিজে থাকিবার কতক সম্ভাবনা।

কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত খাল কাটাইবার প্রস্তাব হইয়া থাকে, কিন্তু বায়ু শুষ্ক রাখিবার নিমিত্ত ড্রেনেজ হওয়া উচিত। অন্ততঃ ড্রেনেজ দ্বারা বায়ু শুষ্ক হইতে পারে কি না তাহার মীমাংসা করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানবিৎদের একত্র করা উচিত। তাঁহারা একত্র হইয়া যদি কিছু স্থির করিতে না পারেন, তথাপি কি উপায়ে বাঙ্গালার জলসম্পৃক্তবায়ু নষ্ট হইতে পারে, তাহার একটা অনুভব হইলে হইতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে যতদিন আমাদের পরস্পর নিজের প্রগাঢ় যত্ন না হইবে, ততদিন কোন ভরসা নাই। এক্ষণে ভাল মন্দ সকল বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর করা আমাদের অভ্যাস পাইয়াছে। সুশাসনের প্রধান দোষই এই। গবর্ণমেণ্টের উপর যত শ্রদ্ধা বাড়ে, আপনাদের চেষ্টা তত কমে। এক্ষণে আমরা আপনাদের মঙ্গলজন্য কোন চেষ্টা করি না, করিতে পারিওনা, মনে করি যদি আবশ্যক হয়, তবে প্রজাবৎসল গবর্ণমেণ্ট তাহা অবশ্য করিবেন।

সুশাসনের নিমিত্ত যে আমরা অকর্ম্মণ্য হইতেছি তাহা গবর্ণমেণ্ট কতক বুঝিয়াছেন। কোন কোন বিষয়ে তাহার অন্যথা করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যাহা আমাদের সম্বন্ধে বুঝিয়াছেন আমরা তাহা এখনও বুঝি নাই। আমাদের লেখা পড়া শিক্ষা হইতেছে, কিন্তু সামাজিকতা লোপ পাইতেছে; দেশের ইষ্টনিমিত্ত আমরা আর কোন কার্য্য করিতে পারি না, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ যতদূর সামাজিক ছিলেন, আমরা আর ততদূর নহি। এক্ষণে আমাদের কেবল আপনাদের নিজের প্রতি দৃষ্টি। তাহার মূল কারণ, এক্ষণকার গৃহিণীরা স্বার্থপর হইয়াছেন। কিন্তু সেই স্বার্থপরতা অবলম্বন করিয়া যদি বলা যায় যে, বাঙ্গালার বায়ু শুষ্ক করিতে পারিলে তাঁহাদের সন্তানেরা সুন্দর হইবে তাহা হইলে কি হয় বলা যায় না।

মাধবীলতা।

১৬

ব্রাহ্মণ চীৎকার করিয়া পরিচয় দিতে দিতে দেওয়ানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেওয়ান্‌খানায় প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দুই চারিজন ভট্টাচার্য্য; নবকুমার আর পিতম পাগলা গিয়া তথায় বসিল, দেওয়ান্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম কি ?"

ব্রাহ্মণ। দশরথ শর্ম্মা, নিবাস এই নিকোশপাড়া। এক্ষণে পরিচয়ের কি প্রয়োজন ? আমার পুত্র চুরি গিয়াছে আমি তাহার বিচার চাই, আমি কোথা ঘর করি, কোন্ শাস্ত্রব্যবসায়ী সে পরিচয়ের এ সময় নহে, আমি আপনার সঙ্গে আলাপ করিতে আসি নাই; এক্ষণে রাজাকে বলিয়া আমার পুত্র আমায় সমর্পণ করুন। নতুবা আপনারা সকলেই ব্রহ্মকোপে পড়িবেন, আমি রামরাম বিদ্যালঙ্কারের পৌত্র, আমার অভিসম্পাত বৃথা হইবে না নিশ্চয় জানিবেন; ব্রহ্মশাপ অব্যর্থ।

দেওয়ান্। অভিসম্পাত এক্ষণে থাক, মূল বৃত্তান্ত কি বলুন।

দশরথ শর্ম্মা। বৃত্তান্ত কি আর বলিব, এ কথা কে না জানে, আপনার সন্তান যদি আর একজন লয়, ত বুকের ভিতর কি হয় বলুন দেখি ?

দেওয়ান্। আমি জিজ্ঞাসা করি রাজকুমারকে আপনার সন্তান বলিয়া কি হেতু সন্দেহ জন্মিয়াছে ?

দশ। সন্দেহ! আবার সন্দেহ কি ? নিশ্চয় আমার সন্তান। সন্তান চুরি গেলে তাহার পিতা কি জানিতে পারে না ?

দেওয়ান্। তাহা সত্য, কিন্তু আপনার যে সন্তান চুরি গিয়াছিল, সেই সন্তান যে আমাদের রাজকুমার তাহা আপনি কিরূপে জানিতে পারিয়াছেন, এই কথা আমি শুনিতে চাই।

দশ। সে কথা ত পড়িয়া আছে। ব্রাহ্মণী দশমাস দশদিন সন্তান গর্ব্ভে ধরেন, তাহার পর ফাল্গুনমাসের ১৬ই তারিখে রাত্রি একপ্রহরের সময় এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন; আমি নিজে গিয়া ধাই ডাকি, সে রাত্রে কোনমতে ধাই পাই না, শেষ বালা বেদিনী নগদ একটাকা হাতের উপর লয়, তবে এসে নাড়ীচ্ছেদ করে। আমরা শেষ আহারান্তে মহা আহ্লাদিত অন্তঃকরণে বাটীর মধ্যে শয়ন করিলাম; আর প্রসূতি, নবকুমার, বালা বেদিনী বাহিরে সূতিকাগারে থাকিল। প্রাতে উঠিয়া শুনি, সে সন্তান চুরি গিয়াছে; ব্রাহ্মণী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, সে ক্রন্দন কি সহ্য করা যায়! আমি বন, জঙ্গল সকল অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, প্রতিবাসীরা সকলেই দৌড়াদৌড়ি করিয়া

বেড়াইল, বালা বেদিনী ষষ্ঠীতলায় গিয়া দেখিয়া আসিল, কোন অনুসন্ধান হইল না। কত লোক কত কথা বলিতে লাগিল, কেহ বলিল, যে মাতৃহারিণীর কার্য্য, কেহ বলিল যে, শৃগালের কার্য্য; আমি তখন জানিতাম না যে ইহা রাজার কার্য্য!

দেওয়ান্। রূঢ় বলিবেন না, রূঢ়-বাক্যে কার্য্য উদ্ধার হয় না; যদি এরূপ আপনার ইচ্ছা ছিল, তাহা হইলে এখানে না আসিয়া আদালতে নালিশ উপস্থিত করিলে ভাল হইত।

এই সময় আর একজন অধ্যাপক বলিলেন "বাচস্পতি ভায়া শোকে কতকটা বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। যদি আমার প্রতি অনুমতি হয়, তাহা হইলে মূল কথা সংক্ষেপে নিবেদন করিতে সাহসী হই; আমি আদ্যোপান্ত সকল অবগত আছি, এবং অভয় দিলে তাহা বলিতে পারি। আপনি ধর্ম্মাধিকারস্বরূপ, আপনার নিকট যদি আমাদের মর্ম্মবেদনা বলিতে পাই, তাহা অপেক্ষা আমাদের আর কি সৌভাগ্য হইতে পারে।"

দেওয়ান্। ভাল, বৃত্তান্ত কি আপনিই বলুন।

অধ্যাপক। যে আজ্ঞা, বৃত্তান্ত এই, যে বাচস্পতি ভায়ার সন্তান হারাণের কথা শুনে আমরা স্থির করি যে, সূতিকাগার হইতে শৃগালে সন্তান লইয়া গিয়াছে, বিশেষতঃ সেই দিবস গ্রামের প্রান্তে গদাপ্রভৃত অর্দ্ধভুক্তসন্তানের দেহাবশিষ্ট পাওয়া যায়—

দশরথ। মিথ্যা কথা, কবে কোথায় কাহার দেহাবশিষ্ট দেখিয়াছিলে? তখনই আমি জানি, যে জ্ঞাতিশত্রু সঙ্গে থাকিলে সকল চেষ্টা বৃথা হইবে।

অধ্যাপক। বাচস্পতি ভায়া ক্ষান্ত হও, তোমার জ্ঞাতি আমি বটে, কিন্তু শত্রু নহি; তোমার বংশ থাকিলে আমি এক গণ্ডূষ জল পাইতে পারিব। আমি তোমার স্বাপক্ষ কথাই বলিতেছি। তুমি নিজে আপনার কথা বলিতে পার না, তাহাই আমি বলিবার ভার গ্রহণ করিয়াছি।

দশ। কেন? আমি আপনার কথা আপনি বলিতে পারি না, তুমি নূতন টোল করিয়াছ বলিয়া মনে করিয়াছ আমা অপেক্ষা তুমি পণ্ডিত হইয়াছ? এ অহঙ্কার ভাল নহে, অধিক দিন থাকিবে না, "নাহঙ্কারাৎ পরোরিপুঃ।"

অধ্যাপক আর কোন উত্তর না করিয়া দেওয়ান্‌মহাশয়কে বলিতে লাগিলেন "স্থূলকথা, বালা বেদিনী সন্তানটি রামি ধাইকে দেয়, রামি ধাই সেই সন্তান লইয়া রাণীর সূতিকাগারে রাখিয়া আইসে। সেই রাত্রে রাণী এক মৃতকন্যা প্রসব করিয়াছিলেন, অর্থলোভে রামিধাই, আর পরিচারিকারা একপরামর্শী হইয়া এই কার্য্য করিয়াছিল। রাজা কিম্বা রাণী বোধ হয় ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছুমাত্র জানেন না। এক্ষণে

নিরপেক্ষ হইয়া অনুসন্ধান করিলে, সকল কথাই প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

দেওয়ান্। রাজা কিম্বা রাণী এ কথা জানেন না, অথচ আপনারা জানিয়াছেন এ বড় আশ্চর্য্য কথা। আপনারা কাহার নিকট শুনিয়াছেন?

অধ্যাপক। আমরা যাহার নিকট শুনিয়াছি তাহার নাম প্রকাশ্যে এক্ষণে বলিতে পারি না, যদি ব্রাহ্মণদের প্রতি আপনার এতই দয়া হয়, তবে তদন্ত করিবার সময় আমাদের স্মরণ করিবেন, আমরা আসিয়া তাহার নাম বলিয়া দিব, এক্ষণে বলিলে রাজ-পরিচারকেরা তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিবে।

দেওয়ান্। এইমাত্র ত তাহাদের মধ্যে রামি ধাই, আর বালা বেদিনী এই দুইজনের নাম করিয়াছেন, বাকি লোকের নাম করিবার আর আপত্তি কি?

অধ্যাপক। বালা বেদিনী কয়েক মাস হইল লোকান্তরপ্রাপ্ত হইয়াছে। রামি ধাইয়ের কথা স্বতন্ত্র, উহারই প্রস্তাবমত এই কার্য্য হয়, কাজেই তাহাকে আর সতর্ক করিতে হইবে না; সে কখনই স্বীকার করিবে না যে তাহার অর্থলালসায় এই গরীব ব্রাহ্মণ নিঃসন্তান হইয়াছে।

দেওয়ান্। ভাল কথা, সময়মত আমি আপনাদের সম্বাদ পাঠাইব। এক্ষণে সভায় চলুন।

এই সময় চূড়াধনবাবু আসিয়া প্রবেশ করিলেন। পিতম পাগলা তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, "আপনার অনুপস্থিতিতে এক আশ্চর্য্য মকদ্দমা হইতেছিল, এমন সময় আপনি কোথায় ছিলেন? মকদ্দমা শুনিলে আপনার কত আহ্লাদ হইত। প্রবাদ আছে বহুপূর্ব্বে এইরূপ আর এক মকদ্দমা হইয়া গিয়াছিল। একজন মুসলমানের একটি পুত্র আর দুই স্ত্রী ছিল। পুত্রটি দুইজনের গর্ভে জন্মে নাই; কিন্তু উভয়েই সে দাবী করিত। সন্তানের পিতা স্বর্গলাভ করিলে পর একদিন দুই সপত্নীর মধ্যে মহা-বিবাদ উপস্থিত হইলে উভয়ে কাজির নিকট উপস্থিত হইল। কাজির বিচার বড় কঠিন ছিল। যেখানে সকল সাক্ষীই মিথ্যাবাদী, সেখানে বিচারকার্য্য বড় কঠিন, প্রমাণ প্রয়োগের প্রথা ছিল না অথচ বিচার করিতে হইত। সপত্নীদের নালিশ শুনিয়া কাজি বড় বিপদগ্রস্ত হইলেন। উভয়েই শপথ করিয়া বলিল "সন্তান আমার।" সাক্ষী নাই, সাক্ষী লইবার রেওয়াজও নাই, লইলে উভয়পক্ষের কথাই প্রতিপন্ন হয়; কতকগুলি সাক্ষী বলিবে সন্তান বড়বিবির, আবার কতকগুলি বলিবে সন্তান ছোটবিবির; অতএব অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজি শেষ এক তরবারি হস্তে বিবিদের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "আমি দেখিতেছি তোমাদের উভয়েরই নালিশ সত্য, সন্তান তোমাদের উভয়েরই গর্ভে জন্মিয়াছে; এক্ষণে আমি উভয়কে সমান হিস্যা করিয়া দিতেছি, এই

বলিয়া সন্তানকে দুইখণ্ড করিবার নিমিত্ত কাজি তরবারি তুলিলেন। "সাত দোহাই তোমার" বলিয়া এক বিবি কাজির পাদমূলে আছড়াইয়া পড়িল, বলিল, "রক্ষা কর, আমি সন্তানের ভাগ চাই না, সন্তান সতীনীকে দাও।" সপত্নী তাহাতে আপত্তি করিল, যে "সন্তান যদি উভয়ের, তবে আমি ষোল-আনার ভার কেন বহিব। আমার হিস্যামত আমি লইব, অপরের হিস্যা লইয়া আমি কেন অনর্থক পাপগ্রস্ত হইব; অতএব সন্তানকে দুইখণ্ড করাই ভাল।" এইরূপ ঠিক মকদ্দমা দশরথ ঠাকুর বাধাইয়াছেন। রাজপুত্রকে লইয়া এই মকদ্দমা, দশরথ ঠাকুর একজন ফরিয়াদী। এই সময় আপনি কাজি হইয়া দাঁড়ান। দশরথ ঠাকুর বলুন কোন ভাগ লবেন; চূড়াধনবাবু, এ বিচারে নিরপেক্ষ হবেন, কাহারও মুখ চাবেন না, সমান ভাগ করে দিবেন।

দশরথ। এ পাগল এখানে কেমন করে আসিল? এর ত অগম্য স্থান নাই দেখি।

পিতম। ঠিক বলেছ ভায়া; আমার অগম্য স্থান নাই। পরশ্ব রাত্রে যখন তোমায় শিবেরমন্দিরে লইয়া যায়, আমিও সেখানে গিয়াছিলাম। পাগলেরা বায়ুর অধীন। কাজেই বায়ুর সঙ্গে গতিবিধি, যেখানে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে, সেইখানে বায়ুগ্রস্তের পথ পড়ে। আমায় পরীক্ষা করিয়া দেখ।

১৭

এই কথায় দেওয়ানজি জিজ্ঞাসা করিলেন, "পিতম! পূর্ব্বে আর কখন ত তোমায় রাজবাটীতে দেখি নাই।"

বাস্তবিক দেওয়ানমহাশয়ের কথা সত্য, পিতম কখন কাহার গৃহপ্রবেশ করে নাই; রাজা কতবার পিতমকে ডাকিয়াছেন, পিতম কখন যায় নাই, রাজসভিব্যাহারে রাজদ্বার পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহার পর হাসিয়া বিদায় লইয়াছে। অপর সকলে যাহারা পিতমকে ভালবাসিত, মধ্যে মধ্যে তাহারা আদর করিয়া পিতমকে আহারের নিমন্ত্রণ করিত, কিন্তু পিতম বাটীর সম্মুখে কোন বৃক্ষমূলে বসিয়া আহার করিত; কদাচ গৃহপ্রবেশ করিত না। জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, গৃহমধ্যে কাক যায় না। পিতম আহার করিতে বসিলে, সেখানে বিস্তর কাক জমিত, অর্দ্ধেক অন্ন পিতম তাহাদের বণ্টন করিয়া দিত; তাহার পর আহার করিতে বসিত। কাকেরা মহা দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিত, পিতম হাসিত, আবার অন্ন ফেলিয়া দিত, কাকেরা তাহা লইয়া কাড়াকাড়ি করিত, পিতম কখন বিমর্ষভাবে, কখন আনন্দিতমনে তাহাদের বিরোধ দেখিত।

অনেকে ভাবিত কাকের খাতিরে পিতম গৃহে বসিয়া আহার করে না। কিন্তু অন্যসময় পিতম গৃহপ্রবেশ করিত কি না, তাহা কেহ অনুধাবন করিয়া দেখিত না, দেওয়ানমহাশয় তাহা

দেখিয়াছিলেন, তাহাই তিনি বলিয়াছিলেন যে আর কখন ত তোমায় গৃহপ্রবেশ করিতে দেখি নাই। পিতম দেওয়ানের কথায় কিছু অপ্রতিভ হইয়া হঠাৎ বলিল, "ভুল হয়েছে, আমি তবে এক্ষণে চলিলাম।" অথচ পিতম না গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এই সময় চূড়াধনবাবু দশরথ বাচস্পতিকে বলিলেন যে, "যদি আপনার স্থিরবিশ্বাস হইয়াই থাকে, যে রাজকুমার আপনার সন্তান, তথাপি তাহা আপনার প্রকাশ করা উচিত হয় নাই। আপনি সন্তানকে বড় জোর একখানি টোল করিয়া দিতে পারিতেন; এখানে আপনার সন্তান নিশ্চয় রাজা হইবেন, আপনি কেন তাহার ব্যাঘাত দিতে বসিয়াছেন; আপনার এ মহাভাগ্য নষ্ট করিতে কে পরামর্শ দিয়াছে?" এই কথা শেষ করিয়া চূড়াধনবাবু একবার দেওয়ান্‌মহাশয়ের দিকে অতিগোপনে কটাক্ষ করিলেন। দেওয়ান্ তাহা দেখিতে পাইয়া, ওষ্ঠপ্রান্তে চকিতের ন্যায় একটু হাসি দেখাইয়া তাহার উত্তর দিলেন।

দশরথবাচস্পতি চূড়াধনবাবুকে বলিলেন, "আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা সকলই বুঝি; কিন্তু ব্রাহ্মণী তাহা বুঝেন না; তিনি বলেন, 'আমার সন্তান আমি লালনপালন করিব, যে সন্তান আমি বুকে করিতে না পাইলাম, সে সন্তান আমার সন্তান কেমন করে, সে সন্তান রাজাই হউক, আর দরিদ্রই হউক, তাহাতে আমার কি? সন্তান বুকে করিব তবে ত বুঝিব আমার সন্তান, আমার ক্রোড় কাঁদিতেছে, আর মুখে বলিব, পুত্র রাজা হচ্ছে!'"

চূড়াধন। আপনার ব্রাহ্মণী বড় স্বার্থপর, তিনি আপনার সুখ, আপনার তৃপ্তি বুঝিলেন, সন্তানের ভবিষ্যৎ ভাবিলেন না। কেমন যে সময় মন্দ পড়েছে, ক্রমে সকলেই স্বার্থপর হইয়া উঠিতেছে।

দশরথ। আপনার সন্তান বুকে করিলে অথবা আপনার সম্পত্তি ভোগ করিলে যদি লোকে স্বার্থপর হয়, তবে আর আমি কি বলিব; এক্ষণে আপনি আছেন, দেওয়ান্‌মহাশয়ও উপস্থিত, আপনারা উভয়ে পরামর্শ করে যাহাতে ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণের হয় তাহা করিয়া দিন, আমাকে যেন শূন্যক্রোড়ে ফিরিয়া যাইতে হয় না। আমি আসিবার সময় ব্রাহ্মণীকে বলিয়া আসিয়াছি যে, তাঁহার হারাধন আমি অদ্যই আনিয়া দিব। তিনি এতক্ষণ পথচেয়ে আছেন, আমি যদি খালি হাতে যাই, তাহা হইলে ভাবিয়া দেখুন দেখি তাঁহার কত কষ্ট হবে। আপনারা ত সকলই বুঝিতে পারেন।

চূড়াধনবাবু। আপনার ব্রাহ্মণী কেবল একা স্বার্থপর নন, আপনি কেবল ব্রাহ্মণীর আহ্লাদ ভাবিতেছেন, কিন্তু রাজা কিম্বা রাণীর কষ্ট ত একবারও মনে আনিতেছেন না; তাঁহারা সন্তান

ত্যাগ করিবেন একি-সহজ কথা! আর তাঁহারা সন্তানই বা, ত্যাগ করিবেন কেন, আপনি কি কোন প্রমাণ দিয়াছেন, আপনি বলিলেন রাজকুমার আমার, আর অমনি রাজকুমার আপনার হইবে, অমনি তাঁহারা আপনার হাতে রাজকুমারকে আনিয়া দিবেন? আপনার কি প্রমাণ আছে বলুন।

দেওয়ানজি পূর্ব্বমত হাসিয়া বলিলেন যে, "সে সকল কথা হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে সকলে চলুন ব্রাহ্মণভোজন দেখা যাউক।" সকলে দেওয়ানমহাশয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠিয়া গেলে পিতম তথায় একা দাঁড়াইয়া রহিল। ক্ষণবিলম্বে মস্তক হইতে রুদ্রাক্ষমালা খুলিয়া দুই একবার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল, তাহার পর বসিয়া তাহা ছিঁড়িল, একটি একটি করিয়া তাহা গণিল, গণনা সমাপ্ত করিয়া গাঁথিতে আরম্ভ করিল। অনেকক্ষণ পরে নবকুমার দেওয়ানখানায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইতেছে পিতম?"

পিতম। মালা গাঁথিতেছি?

নব। কাহার জন্য? আমি জানি রাধাই মালা গাঁথিতেন, কৃষ্ণও যে দেখি মালা গাঁথেন।

পিতম। মালা গাঁথা বড় ভাল, মনস্থির করিবার এমত উপায় আর নাই, সূচের নিমিত্ত সূতাগ্র সূক্ষ্ম করিতে হয়, দৃষ্টিও সূক্ষ্ম করিতে হয়, কর্ণও সূক্ষ্ম হইয়া যায়, সে সময় পক্ষীর চীৎকার ব্যতীত আর কোন শব্দ শুনা যায় না, পুষ্পের গন্ধ ভিন্ন আর কোন ঘ্রাণ পাওয়া যায় না, তখন দেহের সকল কপাট বন্ধ কেবল মন খোলা, মনকে তখন একা পাওয়া যায়। তাহাই যুবতীবেটিরা মালা গাঁথে, যোগীর ধ্যান আর যুবতীর মালা গাঁথা এক জিনিস। মকদ্দমার কথা ক্ষান্ত হইয়াছে?

নবকুমার। না, এখনও তাহারা বসে আছে, কই পিতম তুমি আহার করিলে না?

পিতম। সত্য কথা, কল্য অবধি আহার হয় নাই, তবে আমি চলিলাম, কোন্ ঘরে ছবি আছে?

নব। খাসখানায়, কেন? ছবি খাবে?

পিতম। না, দেখিব, তুমি সকলের ছবি চেন?

নব। চিনি, কিন্তু তোমায় ত সে ঘরে যাইতে দিবে না, তথায় কেবল নিতান্ত আপনার জন যাইতে পায়।

পিতম। তথায় রাজমাতার ছবি আছে?

নব। আছে।

পিতম। আর কার আছে?

নব। আর অনেকের।

এই সময় দেওয়ান ফিরিয়া আসিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ভট্টাচার্য্যেরা আসিল। দেওয়ান কতকটা বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন যে, "আপনারা অনর্থক জেদ করিতেছেন। আপনার সাক্ষীদিগের নাম করিয়াছেন, এক্ষণে আমি, তদন্ত করিতে পারি না। তদন্ত করিলে পর

আপনারা আসিবেন, আমার কি রাধা-বাহাদুরের যাহা বলিবার থাকে তখন বলিব। এ সময় অনর্থক আপনারা কষ্টস্বীকার করিতেছেন। আর যদিই এই সকল লোকে বলে যে সন্তানটি আপনার, তাহা হইলেই বা কোন্ আপনি সন্তান পাইবেন? আপনারা প্রথমে কোম্পানির আদালতে গিয়া নালিশ করুন, তথা হইতে ডিক্রী ফয়সালা আনান, তাহার পর দেখা যাইবে। দুই-জন দাসীর কথায় যদি একজন রাজার বংশলোপ হইত, তাহা হইলে দিন রাত্রি হইত না। আপনি সে দিবসও আত্মীয়-দের নিকট বলিয়াছিলেন যে, আর কখন সূতিকাগার পাতালতায় বাঁধিব না। অতএব সে দিবস পর্য্যন্ত আপনি জানিতেন, যে বেড়ার দোষে আপনার সন্তান মরিয়াছে; আপনি স্বচক্ষে দেখি-য়াছিলেন সূতিকাগারের পার্শ্বে জঙ্গলের ভিতর সন্তানের দেহাবশিষ্ট রহিয়াছে, আপনি স্বয়ং তাহার সৎকার করিয়া-ছিলেন, তাহা সকল ভুলিয়া এখন একে-বারে ক্ষিপ্ত বসিয়াছেন। যাহারা আপনাকে নাচাইয়াছে, তাহারা কেবল রাজার শত্রু নহে; আপনারও পরমশত্রু, অনর্থক আশাসঞ্চার করাইয়া আপনার এই মনস্তাপ বাড়াইয়াছে। অতএব বাটী যান, এ সকল কথা আর মনে স্থান দিবেন না।"

এই বলিয়া দেওয়ান্ আবার চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণেরা ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন, তাহার পর একজন বলিলেন, "চলুন সমুদয় প্রধান লোকের নিকট গিয়া পরামর্শ করি, আর কথায় কিছু হইবে না, সকলই ত শুনা গেল।"

সায়ংকাল পর্য্যন্ত পিতম দেওয়ান্-খানায় বসিয়াছিল, তাহার পর অতি সঙ্কুচিতভাবে নতশিরে বাহির হইল, পাছে তাহারে কেহ দেখিতে পায়, পিতম যেন প্রতিপদার্পণে এই আশঙ্কা করিয়া চলিতে লাগিল। দেখিতে পাইলে কেহ আহারের অনুরোধ করিবে এ আশঙ্কা পিতম একেবারে করে নাই; ধনবানের বাটীতে 'দীয়তাং" না বলিলে, কেহ "ভুজ্যতাং" বলে না, এ কথা পিতম বিশেষরূপে জানিত; তথাপি পিতম যে কেন কুণ্ঠিতপদ, তাহা আপাততঃ অনুভব করা কঠিন।

পিতম রাজবাটী হইতে বহির্গত হইয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে চলিয়া গেল। কাঙ্গা-লীদের শিশুরা পিতু পিতু, পিতুমণি বলিয়া আহ্লাদে কত ডাকিতে লাগিল, পিতম তাহাতে কর্ণপাতও করিল না; উচ্ছিষ্টপত্রাবশিষ্ট ত্যাগ করিয়া কুক্কুরগণ কতকদূর পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল, পিতম তাহা ফিরিয়াও দেখিল না। শেষ এক নির্জ্জন দীর্ঘিকায় উপস্থিত হইয়া ব্যস্তভাবে জলে ঝাঁপ দিল, সর্ব্বাঙ্গ নিম-জ্জন করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত "আ!" বলিয়া এক চীৎকার করিল। তাহার পর জ্যোৎস্না পিতমের চক্ষে ফুটিয়া

উঠিল, তখন অর্দ্ধনিমজ্জিতশরীরে পিতম স্থিরভাবে চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল। একবার আপনার কথা মনে হইল, তখন অস্ফুটস্বরে আপনা আপনি বলিল, "ভগবন্! আবার এ বিড়ম্বনা কেন? অন্ধকারে আর আলোক কেন?"

উপাসনাবিষয়ক তুলনা।

নিম্নলিখিত স্তোত্রদ্বয়ের একটি, ইংলণ্ডের সম্প্রদায়বিশেষের ব্যবহৃত স্তোত্রের অনুবাদমাত্র। ইহাদিগের উপাস্য পদার্থ মানব-দেবী। অর্থাৎ জগৎবিস্তীর্ণ ত্রিকালব্যাপী নরমণ্ডলীর অদ্বৈতভাব স্বীকারপূর্ব্বক তাহার সম্বন্ধ দেহকল্পনা করিয়া ইহারা মানবদেবী নামে উপাসনা করেন। মানবদেবী নারীমূর্ত্তি, ত্রিংশবর্ষীয়া প্রৌঢ়া, এবং অঙ্কদেশে আপন শিশু ধারণ করেন। অপর স্তোত্রটি কয়েকবৎসর পূর্ব্বে দুর্গোৎসব উপলক্ষে "সোমপ্রকাশ" পত্রে প্রকাশিত হয়। উহা প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধ না হয় এই অভিপ্রায়ে রচিত হইয়াছিল।

তান্ত্রিক মত অতি ঘৃণিত আচারে পূর্ণ হইলেও, উহা এক্ষণকার শাক্ত ও বৈষ্ণব এবং পূর্ব্বতন শৈব সৌর ও গাণপত্য এই পঞ্চসম্প্রদায়েরই মান্য। তান্ত্রিকদিগের উপাস্য দেবতা, পাশ্চাত্যমতে যাহাকে পুত্তলি বলে, তাহার মধ্যে গণনীয় কি না, এই কথা বিচারসাপেক্ষ। কিন্তু তন্ত্রপ্রণেতৃগণ যে কতকগুলি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোককে একত্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ করা যায় না। বরং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে এখন যে বৈদিক ও তান্ত্রিক দীক্ষা একত্রিত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে বৈদিক দীক্ষা শূদ্রবর্ণের অনধিকৃত হইলেও তান্ত্রিক দীক্ষাতে সকল বর্ণেরই প্রায় তুল্যাধিকার। অপর, পাশ্চাত্যগণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে মানিতে হয় যে তন্ত্রোক্ত কতকগুলি শক্তি, বৌদ্ধদিগের শেষাবস্থায় উপাস্য হইয়াছিল। নিরীশ্বরবাদীদিগের পরবর্ত্তিগণ ধর্ম্মসংস্থাপন করিবার উদ্দেশে, বৈদিকমতের স্থাবর জঙ্গম ও গ্রহ নক্ষত্রের উপাসনাপরিত্যাগপূর্ব্বক, সময়, মৃত্যু, জন্ম, বিদ্যা, ধন, মঙ্গল, অমঙ্গল, যুদ্ধ ইত্যাদির আকার কল্পনা করিয়া দেবপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন,—আর তাঁহারা স্বহস্তে প্রতিমানির্ম্মাণ এবং মন্ত্রের দ্বারা প্রাণপ্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক নিরবচ্ছিন্ন জড়পদার্থকে ঐশীশক্তিসম্পন্ন মনে করিতেন,—এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টী সঙ্গতপর তাহা পাঠক বিবেচনা করিবেন।

স্তোত্রদ্বয় একত্র সন্নিবেশিত করিবার

উদ্দেশ্য এই যে প্রাচীন হিন্দু তথা তান্ত্রিক মতের সহিত অভিনব পাশ্চাত্য মতের বৈষম্য কিছুমাত্র অপনীত হইতে পারে কি না, এতদ্বিষয়ক চিন্তার উদ্রেক হইবে। এতদুভয়ের সংযোগ অসাধ্য হইলে অস্মদ্দেশের নব্য প্রবীণ উভয়েরই মহাক্ষতি, লেখক এই সংস্কারের বশবর্ত্তী বটে। কিন্তু সংযোগকরণার্থে কি প্রণালী অবলম্বন করা আবশ্যক, এবং কবে তাহা নির্দ্দেশ করিবার সময় হইবে এ সকল অতি দূরের কথা। তাহার আন্দোলন করাও অভিপ্রেত নহে। দেখিতে পাওয়া যায়, পাশ্চাত্য মতসমগ্রকে নাস্তিক বলিয়া ঘৃণা করা অথবা পক্ষান্তরে শিখাধারী ব্রাহ্মণের আচরণমাত্রকে বিদ্রূপ করা এক্ষণকার চলিতপ্রথা। এই প্রণালীতে যে কখন নব্য এবং প্রবীণ-সম্প্রদায়ের মিল হইবে এ কথা সহসা মনে হয় না। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের বিনাশ বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া, যাঁহারা ভাবিকালের নিমিত্ত চেষ্টাত্যাগপূর্ব্বক কেবল পিতৃপৈতামহিক বিধানানুসারে আত্মজীবনের পবিত্রতা রক্ষা করেন এবং যাঁহারা স্ব স্ব জ্ঞানানুযায়ী পবিত্রতা লাভের জন্য আত্মপ্রকৃতির পূর্ব্বতন অবস্থা উপেক্ষা করিয়া বিভিন্নপ্রকৃতি অর্জ্জনে ব্যগ্র হইয়াছেন—ইঁহাদিগের মধ্যে কোন্ সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত বাহুল্যরূপে প্রস্তাবিত মিলনের বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছেন, কোন্ সম্প্রদায় প্রকৃষ্টরূপে হিন্দুসমাজের নিয়োগসম্পন্ন, তাহার মীমাংসা প্রতিপক্ষের মুখে শুনিলে প্রতীতি জন্মিবার বিঘ্ন হয়। এই বিবেচনায় নিরপেক্ষভাব রক্ষা করিবার নিমিত্ত বাদানুবাদের পরিবর্ত্তে কেবল স্তোত্রদ্বয় প্রকটিত হইল।

১। দুর্গাস্তব।

"দেবি, শক্তিরূপে! আমি তোমার ধ্যান করি। তোমার শক্তি সর্ব্বভূতে সকল সময়ে অনুভূত না হইলেও এই অসীম সংসার সেই বিশ্বব্যাপিনী শক্তিতে পরিপূর্ণ। তুমি যখন নিষ্পন্দশবরূপ ধারণ করিয়া তপঃপরায়ণ ব্রহ্মার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলে, তখন তিনি,—মনুষ্যের জীবনই শক্তির একমাত্র পরিচায়ক, জীবননাশের সহিত এই দেহে শক্তির বিনাশ হইয়াছে,—ভাবিয়া ধ্যাতব্য পদার্থের উদ্দেশে মুখ ফিরাইলেন, অমনি স্থিতির এক নবীনমূর্ত্তির প্রভা তাঁহার মুখে প্রতিফলিত হইয়া তাঁহার এক নূতন মুখ প্রকাশ করিল। ব্রহ্মা দেখিলেন, কেবল নর নয়, সমস্ত জীবমণ্ডলী তোমার অসীম শক্তিতে দেদীপ্যমান। অনন্তর ব্রহ্মা, "এই শেষ" বুঝিয়া আবার মুখ ফিরাইলেন। তখন সমস্ত মহীরুহস্থিত শক্তির জ্যোতিঃ তাঁহার তৃতীয় মুখে আশ্রয়গ্রহণ করিল। ব্রহ্মা চতুর্থবার মুখ ফিরাইলেন, ফিরাইয়া দেখিলেন, এই অসীম সংসার, সমস্ত জড়বস্তুও শক্তিতে পরিপূর্ণ। অবশেষে গগনবিহারী জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর শক্তিহেতুক ব্রহ্মার মস্তকে পঞ্চমুখ প্রকাশ হইল,

ব্রহ্মা পরাভব স্বীকার করিলেন। বুঝিলেন, শক্তির সীমা নাই, আদি নাই, অন্ত নাই। সৃষ্টির আদিঅন্ত মানবের অপরিজ্ঞাত ও অপরিজ্ঞেয়; সৃজনের আতিশয্যে প্রলয়ের সূচনা হয়; সৃষ্টিবিশেষমধ্যে শক্তিকে সর্ব্বতোভাবে আবদ্ধ রাখিয়া অন্য স্রষ্টার অবরোধ করা কখনই সাধ্যায়ত্ত নহে। দেবি, অতঃপর তুমি পরীক্ষান্তরে ব্যাপৃত হইলে।

২। জ্ঞানমূর্ত্তি নারায়ণ ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন; ধ্যানে তোমার স্বরূপ, তোমার আদি, অথবা অন্ত কিছুই উপলব্ধ করিতে পারিলেন না। তোমাকে দেখিয়া বিষ্ণু যতক্ষণ সন্তুষ্ট হইলাম মনে না করিলেন, ততক্ষণ তাঁহার নূতন নূতন চক্ষু প্রকাশ হইতে লাগিল। সহস্রাক্ষ এখনও তোমায় দেখিতেছেন। কিন্তু তাহাতে তোমার তুষ্টিসাধন হইল না। ক্রিয়া না থাকিলে জ্ঞান নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হয়। তাদৃশ জ্ঞান হইতে শক্তির উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় না। দেবি, তুমি মঙ্গলময় শিবেরই ভূষণ।

৩। দেবি মহেশ্বরি, তোমার শক্তি যোগ্যপাত্র আশ্রয় করিয়াছে। শিবদুর্গে, তোমাদিগকে অভিন্নমূর্ত্তিতে চিন্তা করি। তুমি শক্তি, তিনি ক্রিয়া; তুমি স্নেহ, তিনি মঙ্গল। উভয়ের বিচ্ছেদ অসম্ভব। দেবি, তুমি শক্তিরূপে অচিন্ত্য; সংসারে তোমার অবধি দেখি না; সেই কারণে স্বয়ং ব্রহ্মা তোমা হইতে অবসৃত হইয়াছেন। জ্ঞানবলে তোমার আদি অন্ত নির্ণয় হয় না; সেই কারণে তোমার ধ্যানে মগ্ন, নারায়ণও স্পন্দহীন, শয়ান আছেন। কেবল রুদ্রতেজে তোমার মায়া আশ্রয় করাতেই তুমি ত্রিগুণময়ী হইয়া সংসারকে মঙ্গলালয় করিতেছ। দয়াময়ি! প্রলয়কর্ত্তা মহাকাল তোমার সঙ্গলাভ করিয়াই শিব নামের সফলতা করিয়াছেন।

৪। দেবি মায়াময়ি ঈশানসঙ্গতদেহে! তোমরা সর্ব্বাধারে সর্ব্বদা বর্ত্তমান। আমরা যে দেহরক্ষার্থ দুর্নিবার স্বার্থচেষ্টাতে আসক্ত রহিয়াছি, সে তোমাদেরই মায়া। সৃষ্টিরক্ষার্থ জীবমিথুন যে মোহাচ্ছন্ন হয়, সেই তমোগুণবিকাশ তোমাদেরই কার্য্য। অন্যথা জগৎসংসার প্রাণিহীন হইত; অশেষ যন্ত্রণার আধার দেহ রক্ষা করিতে কেহই প্রবৃত্ত হইত না; বরং ভাবী যন্ত্রণার বিনাশার্থ সকলেই সন্তানোৎপাদনে বিরত হইত।

৫। দেবি শিবদেহবিলাসিনি! তোমরা রজোগুণেরও আধার। রুদ্রতেজে! তুমি জগতের অসুরবিনাশকারিণী। তোমাদের তমোগুণাশ্রয়পূর্ব্বক অসুরগণ নরধ্বংস করিতে উদ্যত হইলে আবার তোমাদের রজোগুণবলেই সেই নৃশংসদিগের সংহারসাধন হয়।

৬। দেবি সংহাররূপিণি রজোগুণাশ্রয়ে! তুমি এক চক্ষে অসুরনাশ, অপর চক্ষে কমলার সৃষ্টি করিয়াছ। অসুরনাশিনি! লোকবিনাশোদ্যত মোহময় বুভুক্ষা তোমার অঙ্কুশাঘাতে বিনষ্ট হয়,

এবং সেই অসুরবুভুক্ষা তোমারই আদেশাধীন হইয়া তাবৎ লোককে ধনধান্য সঞ্চয়ে নিযুক্ত করে। তুমিই অসুরভয়বারিণী, তুমিই জগতের শস্যরূপিণী লক্ষ্মীর জননী। উভয়ত্র তুমিই দুর্গতিনাশিনী। দেবি, সেই কারণেই দুর্গা বলিয়া বিশ্বজনে তোমার শস্যাধিষ্ঠাত্রী শারদীমূর্ত্তির উপাসনা করে।

৭। দেবি, তোমার রজোগুণবলে লোকের আধিপত্যলাভবাসনা উত্তেজিত হয়। আবার তোমারই গুণান্তরসম্ভূত লোকরঞ্জনবাসনায় তাহার শমতা হয়। ভূপতিগণ তোমারই তমঃ ও রজোগুণপ্রভাবে একচ্ছত্রলাভপ্রয়াসী ও প্রজাপীড়নরত। কখন তাঁহারা লক্ষ্মীর সেবক, কখন অসুরনাশমন্ত্রে দীক্ষিত। দেবি, জগতের প্রভবিষ্ণুবর্গ তোমারই মায়াতে আচ্ছন্ন হইয়া লোকরঞ্জন কামনাসহকারে নরবিনাশে বিরত হন।

৮। দুর্গে শিবসমন্বিতে, রজতকান্তিবিষ্ণুরূপিণী বাণী ও সুবর্ণাভব্রহ্মরূপিণী কমলা তোমাদিগেরই অন্তরঙ্গ। ক্রিয়াপ্রবর্ত্তনার্থ তুমিই লক্ষ্মীকে বিষ্ণুর ও সরস্বতীকে ব্রহ্মার আশ্রিত করিয়াছ। তাহাতেই এই জগৎ, মণ্ডলীবদ্ধ নরের আলয় হইয়াছে। তোমার স্থাপনাতেই ব্রহ্মবিষ্ণু একত্রীভূত হইয়াছেন। তুমিই জ্ঞানকে কমলার অধীন ও সৃষ্টিকে জ্ঞানাদেশবর্ত্তী করিয়াছ। শিবের মঙ্গল এবং শক্তির অনুষ্ঠান ব্যতীত কখনই এই সৃষ্টির স্থিতি হয় না।

৯। মাতস্ত্রিগুণাত্মিকে—তোমরাই সত্ত্বগুণের মূর্ত্তি। তোমাদের রজোগুণ ও তমোগুণ, সত্ত্বগুণেরই সোপানস্বরূপ। তুমি তমোগুণ ও রজোগুণময় কাম ও বুভুক্ষা সংযমিত করিয়া সংসার ও দাম্পত্যবিধি সংস্থাপন করিয়াছ; এবং রজোগুণাচ্ছন্ন সঞ্চয়ীকে ধনধান্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীর সেবায় মগ্ন রাখিয়াছ। দেবি, তুমিই দাম্পত্যের অধিষ্ঠাত্রী প্রকৃতি। সেই অমল দাম্পত্য হইতে পরিবারমণ্ডলীতে সত্ত্বগুণাশ্রয় নিষ্কাম প্রণয়, ভক্তি ও দয়ার উদয় হইয়াছে। দম্পতির প্রণয় পারিবারিকধর্ম্মের মূলীভূত। সরস্বতীর প্রসাদে এই পারিবারিক ধর্ম্ম প্রজামণ্ডলীতে আশ্রয় করে, এবং মাতৃভক্তি জগতের জননীস্বরূপা তোমাতেও বিন্যস্ত হয়। লক্ষ্মীর অনুগ্রহে মনুষ্যের মনঃস্থিত সদভিলাষ আকারপ্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বসাধারণকে চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান করে। তোমার উদ্দিষ্ট ভক্তিও সেই সার্ব্বজনিকমঙ্গলানুষ্ঠানে দেদীপ্যমান হয়।

১০। মাতা, তাঁহার অংশভূত পিতা, তাঁহাদের পিতৃপিতামহ, পিতৃকুল, মাতৃকুল, বর্ত্তমান জনগণের আদিভূত অতীত কালের মানবমণ্ডলী, সকলেই পর পর আমাদিগের ভক্তিরসোদ্দীপক হইতেছেন। আমরা ভক্তিভাবে বর্ত্তমান সমৃদ্ধি ও কৃষিবাণিজ্য শিল্পাদির সৃষ্টিকর্ত্তা প্রাচীন মহাপুরুষদিগকে প্রণাম করি। এবং যে মহর্ষিগণ সরস্বতীর অনুগ্রহে

অমরত্বলাভ করিয়া নরান্তঃকরণের তিমির মোচন করিতেছেন, তাঁহাদিগকেও নমস্কার করি। উভয় সম্প্রদায় পৃথিবীর যে অসীম, অপরিশোধনীয় উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হউক। শক্তি, মায়া ও জ্ঞান ক্রিয়াবিহীন হইলে ব্রহ্মার সৃষ্টি বিনষ্ট হইয়া যায়। সেই কারণে বিষ্ণুরূপিণী জ্ঞানময়ী সরস্বতী ক্রিয়াস্বরূপ ব্রহ্মার দেহলগ্না হইয়াছেন। দেবি! তুমি নিশাময়, কৃষ্ণবর্ণ অতীতকালের কালীমূর্ত্তি অজ্বনপূর্ব্বক দিবসময় নভোবর্ণ তারামূর্ত্তিতে ভাবী কালের তারণকার্য্যে মগ্ন। তুমি ত্রিকালব্যাপিনী—মহাকালপত্নী। পুরাকালব্যাপ্ত দেহচ্যুত অমরবৃন্দকে তোমাতেই বিলীন জ্ঞান করিয়া, সেই পুরাকালের ক্রম এবং তোমারই ভূষণস্বরূপ, জ্যোতির্ম্ময় মঙ্গলালয় ভাবী কালকে ধ্যান করি। দেবি! তোমার প্রসাদে প্রাচীনার্পিত ভক্তি ভাবী কাল উদ্দেশে দয়াতে পরিণত হউক।

১১। মায়াময়ি, তোমার বিধানানুসারে দাম্পত্যেও সত্বগুণময় নিষ্কাম প্রেম সঙ্ক্রপ্রবেশ হইতেছে; এবং তুমিই পিতাপুত্র সম্বন্ধহেতুক একদিকে নির্ম্মল ভক্তি এবং অন্যদিকে অকৃত্রিম স্নেহ প্রবর্ত্তিত করিতেছ; আবার সেই গৃহচর্চ্চিত ভক্তি এবং স্নেহ, পাত্রান্তরে বিস্তারপূর্ব্বক সর্ব্বজন সম্বন্ধে ঐকান্তিক বদান্যতার রূপধারণ করিতেছে। দেবি! তোমার প্রভাবে সর্ব্বত্র নিরবচ্ছিন্ন স্বত্বগুণ বিস্তার প্রত্যাশা করি। দেবি! তুমিই প্রকৃতি, তুমিই মাতা, তুমিই কন্যা। তোমার প্রসাদে দাম্পত্যের অনুসরণে মানবসগুলী প্রীতিপূর্ণ হউক। মাতৃভক্তির সীমা বিস্তৃত হইয়া পৃথিবীর অশেষোপকারক সমস্ত প্রাচীনবর্গে বিন্যস্ত হউক এবং স্নেহ আপনা হইতে এবং ভক্তির পূর্ণতা সাধনার্থ ভাবী মনুষ্যকুলের উপর সন্ততি স্নেহভাবে পরিণত হউক।

(সোমপ্রকাশ ৩রা আশ্বিন, ১২৮৩।)

২। মানবদেবীর স্তব।*

স্নেহ আমাদিগের নিদান, ব্যবস্থা—আদি,
উন্নতি—উদ্দেশ্য।

জীবন, পরের নিমিত্ত জ্ঞান করিও।
নিরন্তর ব্যক্তভাবে আচরণ করিও।

সেই পরমাশক্তি, মানবদেবী, যাঁহাকে আমরা, সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান করি; আমরাই যাঁহার সন্তান এবং সেবক, যাঁহা হইতে আমরা সর্ব্বস্ব আহরণ করি এবং যাঁহাকেই আবার সর্ব্বস্ব প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য রহিয়াছি, তাঁহাকে নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি।—

তোমার স্বরূপ জ্ঞানের উৎকর্ষলাভার্থ আমাদিগের যত্ন হউক! যে তদ্দ্বারা আমরা শ্রেষ্ঠতররূপে, তোমাকে স্নেহ করিতে

* (Translated from Dr. Congreve's annual adress on the occasion of the festival of Humanity.

এবং তোমার সেবা করিতে, সক্ষম হই। এবং এই উদ্দেশে আমাদিগের প্রবৃত্তি সকলও উত্তরোত্তর নির্ম্মল, দৃঢ় এবং প্রগাঢ় হউক, চিন্তা—অপেক্ষাকৃত ব্যাপ্ত এবং প্রবল হউক,এবং কার্য্য—অধিকতর অবিচলিত ও সতেজ হউক! যে তাহাতে আমাদিগের সময়ে প্রত্যেকের স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে নরমণ্ডলীর পরিণাম কালকে অপেক্ষাকৃত সন্নিহিত করিতে পারি; —সেই পরিণামকাল, যখন তুমি সমস্ত লোকের বিদিত অবস্থাতে তোমার মহীয়সী ক্ষমতা অবলম্বন পূর্ব্বক বিরাজ করিবে। যখন এক্ষণকার বৈষম্যজনিত-বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠী সকল এবং জাতিসমস্ত অর্থাৎ নরপরিবার-রূপ-দেহস্থিত সর্ব্বাঙ্গ সকলেই, তোমার অতীত অস্তিত্বের একচ্ছত্রপ্রভাবে, তোমার আদেশাধীন—জীবন্তগণ মৃতবর্গের শাসনাধীন—স্বতঃ সংস্থাপিত হইবে! এবং যখন স্নেহ ও আন্তরিক পরিচয় দ্বারা পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া শান্তিপূর্ণ একতাসহকারে ইহারা সকলেই মনুষ্যের উন্নতিসাধন কার্য্যে যথাযোগ্যরূপে স্ব স্ব কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবে, করিয়া ভাবী কাল প্রবেশ পূর্ব্বক উত্তরোত্তর নির্দ্দোষ অবস্থার অভিমুখে অগ্রগামী হইবে।

এই প্রণালীতে তোমার গৌরব বৃদ্ধি হইবে এবং তোমার আবাসস্বরূপ এই সুন্দর পৃথিবীর ক্রমাধিকারী অসংখ্য নরবংশ এবং নরাশ্রিতগণের সার্ব্বজনিক মঙ্গলসাধন হইবে।

আমাদিগের জীবনযাত্রা এবং কার্য্য-সমগ্রকে সতেজ এবং উন্নত করণাশয়ে, তোমাতে বিমিশ্রিত হইয়া—তোমার অতীত এবং ভাবী কালের সহিত বিমিশ্রিত হইয়া—এই মহৎ কামনাকে যেন নিরন্তর জ্ঞাননেত্রে ধারণ করি! তথাস্তু (amen)।

* * * *

সমাপ্তিকালীন স্তব।

পবিত্র মানবদেবি! তোমার জীবনের বিগতকাল আমাদিগের জন্য যে সমুদায় শুভ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছে, জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং সৌন্দর্য্য স্বরূপ যে প্রভূত ধনসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছে; যে মহাজন-শ্রেণী—স্বদীয় সাক্ষীরাশি—আমাদিগের দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া, অভাবস্থলে, সান্ত্বনা, আশ্রয় এবং উপদেশ প্রদান করিতেছে; বিশেষতঃ তোমার অনুগ্রহে এখানে ব্যক্তিস্পত্তি এবং স্বেচ্ছামত কার্য্যকরণ বিষয়ে আমরা যে পূর্ণ স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতেছি—এই সকল শুভ লাভের জন্য তোমাকে যথা কর্ত্তব্য অশেষ ধন্যবাদ পূর্ব্বক আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, যে আমরা যেন এই সকল উপকারের অযোগ্য পাত্র না হই; বরং দিন দিন একাগ্রতা অথচ বিনয়পুরঃসর, সাহসপূর্ব্বক অথচ অন্যের প্রতি মমতাসহকারে তোমার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে সমর্থ হই। "এবং তোমার সহিত আন্তরিক আলাপ দ্বারা যে সকল অপূর্ব্ব শুভ সম্পন্ন হয় তৎসমু-

দায় যেন আপনারা সাধন করিতে এবং অন্য কর্তৃক সাধনার্থ সাহায্য দান করিতে সক্ষম হই। ঐক্য (union), অন্বয়ত্ব (unity), প্রবাহত্ব continuty)। তথাস্তু।

মানবদেবীতে বিশ্বাস, মানবদেবী-জনিত আশ্বাস এবং মানবদেবীর প্রতি মমতা তোমাদিগকে সান্ত্বনা এবং সহৃদয়তাশিক্ষা প্রদান করুক। তোমাদিগের স্ব স্ব মনে শান্তি প্রদান করুক, পরস্পরের সহিত শান্তিসাধন করুক—এখন করুক এবং চিরকাল করুক। তথাস্তু।

[মণ্ডলীবর্গের প্রতি উপদেশ।]

আমাদিগের ধর্ম্মাবলম্বিগণ—যে যেখানে মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া আছে কিম্বা অসংযুক্তভাবে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে—তাঁহাদের সহিত; এবং (পরস্পরের এক উদ্দেশ্য অর্থাৎ ধর্ম্মবিষয়ক শৃঙ্খলমধ্যে সর্ব্ব ক্ষুদ্রতর বিভেদ বিসর্জ্জিত করিয়া) অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বিগণেরও সহিত—তাঁহারা একেশ্বরবাদী, বহু-ঈশ্বরবাদী কিম্বা জড়োপাসক হউন, বিচ্ছিন্নভাবে কিম্বা সম্প্রদায়বদ্ধ হইয়া থাকুন—সমগ্র নববংশের সহিত—(আবার এক মানবপ্রকৃতিরূপ শৃঙ্খলমধ্যে সর্ব্ব ক্ষুদ্রতর বিভেদ বিসর্জ্জন করিয়া), সর্ব্বত্র—যদবস্থাপন্ন মনুষ্যমাত্রের সহিত; এবং যে সমস্ত পশুবর্গ মনুষ্যের আত্মোন্নয়ন চেষ্টাতে এতকাল, এখনকারই ন্যায়, সহকারী এবং সহচর হইয়াছে; এই সকলেরও সহিত আমরা অদ্য মানবদেবীর পার্ব্বণ উপলক্ষে—জ্ঞানতঃ সহৃদয়তা বিলাসে বিলসিত হইতে আকিঞ্চন করি।

এই সহৃদয়তা যে কেবল আমাদিগের সমকালীন লোকসমূহে ন্যস্ত হইবে তাহা নহে; যে অপেক্ষাকৃত অধিক-সংখ্যক লোকের জীবন দ্বারা, সমগ্র ভূতকাল সম্পূর্ণ হইয়াছে, তাঁহাদের প্রতিও এই সহৃদয়তা বিস্তার করি। যে সংখ্যাতীত পুরুষপরম্পরার প্রমার্জ্জিত ফল আমরা উত্তরাধিকার করিতেছি এবং পরিবর্দ্ধন পূর্ব্বক ভাবী পুরুষপরম্পরার নিমিত্ত রাখিয়া যাইতে অভিলাষ করি, তাঁহাদের নিকট লব্ধোপকার, আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে অদ্য পুনঃস্মরণ করিতেছি। আমরা মৃতবর্গের আধিপত্য স্বীকার করিতেছি।

[অনন্তর,] আমাদিগের সর্ব্বজনের মাতৃস্বরূপ ও বাসগৃহ পৃথিবী—এবং তৎসমষ্টিব্যাপারে সৌরজগতের জ্যোতিষ্কমণ্ডলিত ভুবনমণ্ডলহইতে লব্ধোপকার সকলেরও পুনঃস্মরণ করি। এই সঙ্গে এই সৌরজগতের আধারস্বরূপ ব্যোমস্থানেরও পুনঃস্মরণ করা আবশ্যক। ইহা চিরকাল মনুষ্যের উপকার করিয়াছে এবং যখন ইহা জ্ঞানতঃ স্থূলীকরণ ক্রিয়া (abstraction) বিষয়ক কল্পনার উপমান স্বরূপ হইয়া, যে সকল সর্ব্বাশ্রয়কারী বিধি (higherlaws) সমষ্টি হইতে মানবজীবনের নিয়তি সম্পন্ন হয়, সেই সকল বিধির আধারকে উপমেয়

করিবে, করিয়া তাদৃশ ভাবে আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তিবিষয়ক চরিত্র সংস্কারার্থ ব্যবহৃত হইবে, তখন এই ব্যোমস্থান জন্য উপকার অপেক্ষাকৃত পরিবর্দ্ধিত হইবে।

[পরিশেষে] বর্ত্তমান এবং ভূতকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র ভবিষ্যৎ কাল পর্য্যন্ত যে অপ্রাপ্তজন্ম ভাবী পুরুষ-পরম্পরা আমাদিগের পরে, আমাদিগের অপেক্ষা সৌভাগ্যশালী হইয়া এই পৃথিবীতে সমাগত হইবে, তাঁহাদিগের প্রতিও সহৃদয়তা বিস্তার করিতেছি। আমাদিগের ধর্ম্মপ্রণেতা, মানবদেবীর যে ধ্যান বিকাশ করিয়াছেন, দেবীর মহৎলক্ষণ —বিধিস্রোত (continuity) বিষয়ক জ্ঞানদ্বারা ঐ ধ্যানের সম্যক উপলব্ধির নিমিত্ত এই ভাবী পুরুষপরম্পরার বিষয় নিরন্তর আমাদিগের মনে জাগরূক থাকা আবশ্যক। মানবদেবীর এই সর্ব্বপ্রধান পার্ব্বণউপলক্ষে তাঁহার পরিজ্ঞাত বা অজ্ঞাতনাম, সর্ব্বভৃত্যবর্গের স্মরণস্থলে, এবং তাঁহারা যে কর্ম্মফল উদ্ধার পূর্ব্বক অমরত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহার স্মরণস্থলে দেবীর প্রধানতম ভৃত্য অগস্ত কোম্‌তের স্মরণ এইস্থানেই সন্নিবেশ করা বিধেয়।

হে গুরুগণাগ্রণী! আমাদিগের বিরুদ্ধে তাচ্ছিল্য কিম্বা বৈরিতাপ্রযুক্ত যে সকল বিঘ্ন উৎক্ষিপ্ত হইবে, তোমার শিষ্যগণ যেন তোমার দৃষ্টান্ত দ্বারা উৎসাহিত হইয়া, তোমার মতসমগ্র হইতে আশ্রয় লাভ করিয়া এবং তোমাকৃত কল্পনার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া সেই সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়। এবং যে মানবোন্নয়নব্রতে তোমার জীবন উৎসৃষ্ট হইয়াছিল, তোমার শিষ্যগণ এই বিপ্লব কালে যেন পুরস্কারাশ্বাস দ্বারা কলঙ্কিত অথবা প্রয়াসের বিফলতাহেতুক অবরুদ্ধ না হইয়া, মানবদেবীর উপাসনাবলে এবং এই উপাসনাতে মগ্ন থাকিয়া সেই মহাব্রত পালনে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে।

শ্রী যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ।

হৃদয়-উদাস।

মন সদাই উদাস। অন্তরের অন্তরে সদাই প্রতিমুহূর্ত্তে, প্রতিক্ষণে, প্রতিদণ্ডে, প্রতিপলে, যেন কোন জিনিসের জন্য মন কেমন করে। মন হুহু করে; নিজ সুখের জন্য, মন একবারও ভাবে না, ভাবিতে চায় না, ভাবিতে ভুলিতে চায়! আর কিছুতেই সুখ নাই, কাজে কর্ম্মে সুখ নাই, ধনে সুখ নাই, যশে সুখ নাই, যে সকল চির-অভিলষিত যাহার জন্য এক একবার জীবন উৎসর্গ করিতে চাহিতাম, তাহাতে আর সুখ নাই। বড় হইবার আশা স্বাভাবিক, তাহাতেও সুখ দেখিতে পাই না। যে সকল গ্রন্থ পাঠে চিরকাল এত আনন্দ উপভোগ করিয়া আসিয়াছি তাহা আর ভাল লাগে না। যে সকল কথায় এত আগ্রহ ছিল, তাহা বিষবৎ বোধ হয়। যাঁহাদের সংসর্গে পূর্ব্বে এত আমোদ হইত, তাঁহাদের সংসর্গ অরণ্যবাস হইতেও বিষম কষ্টকর বোধ হয়। যে সকল স্বভাবসৌন্দর্য্য পরমরমণীয় বোধে শত শতবার দেখিয়াও তৃপ্তি হয় নাই, সে সকলের সৌন্দর্য্য যেন হঠাৎ কমিয়া আসিয়াছে।

সদাই বোধ হয় জগৎ অরণ্যবিশেষ, উহার মধ্যে আমি একটি সামান্য কীট। আমার মত শত শত কীট চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কিন্তু তাহাদের কাছে থাকিতে ইচ্ছা হয় না। একা ইহা অপেক্ষা ভাল। কিন্তু সে একা কেন? আমার মনের মত একটি মানুষ গড়িয়া তাহাকে মনসিংহাসনে বসাইয়া একা অতি গোপনে তাহার সঙ্গে মনের কথা কই। মনের কথা কি? আমি তাহাকে ভালবাসি সুতরাং আমি এখন বিজনপ্রিয় হইয়াছি। বিজনে আমার মনের মানুষ গড়া ভাল হয়। তাহারি সঙ্গে আমার অনেক কথা হয়, অনেক কথা তাহার সঙ্গে কহিতে পারি। অনেকক্ষণ তাহার উপাসনা করিতে পারি। অনেকবার তাহার সুখ উৎপাদন ও দুঃখবিমোচন করিতে পারি। অনেকবার অতি গোপনে বিনা সর্ত্তে তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে পারি; অনেকবার তাহার সেই প্রেমময় ছবি দেখিতে পাই। তাহার হাস্যবদন দেখিয়া অনেকবার মনে সুখ পাই। আমি লোকের সংসর্গ ভালবাসি না; লোকে আপনার সুখে হাসে, আপনার দুঃখে কাঁদে, আপনার জন্য পরকে বিরক্ত করে, দেক্ করে, লোকে স্বার্থপর। আমার ইচ্ছা হয় অন্যের জন্য ভাবি, অন্যের জন্য কাজ করি। অন্যের যাহাতে তৃপ্তি হয়, তাহাই করি। অন্যের কাজে আত্মজীবন উৎসর্গ করি। অন্যকে ভালবাসি, আমি আমাকে ভালবাসিয়া সুখী হইতে পারি না। আমার আর লোক চাই। আমি ভালবাসিতে চাই। নিজে

খাইয়া, নিজে পরিয়া, আর তৃপ্তি হয় না; আর কাহাকেও ভাল করিয়া খাওয়াইতে পরাইতে ইচ্ছা করে। চাঁদের আলো বড় সুখের জিনিস, দেখিলে চক্ষুজুড়ায়, কিন্তু আমার বোধ হয় আমার সে দেখিল কই। দুজনে দেখিতাম ত বেশ হইত। ফুলগুলি বেশ, বেশ জিনিস, কেমন গন্ধ ভরভর করে, কেমন কোমল, কেমন গঠন, কেমন টাট্‌কা, কেমন সুখস্পর্শ, আমার বোধ হয়, এমন ফুলগুলি তুলিয়া তাহার গলায় মালা করিয়া দিলে কতই সুন্দর হইত। যখন কোন জিনিস দেখিয়া তৃপ্তি হয়, অমনি বোধ হয়, আমার মনের মানুষ আমার সঙ্গে থাকিলে দুজনে উপভোগ করিতাম। যখন কোন গ্রন্থ পাঠ করিয়া নয়নে অশ্রুজল উপস্থিত হয়, তখনি মনে হয়, আমার সঙ্গে কাঁদিবার লোক থাকিলে বড়ই আমোদ হইত। সুখে দুঃখে, আশায় হতাশায়, ভয়ের সময়, উৎসাহের দিনে, উৎসবে, ব্যসনে, ভ্রমণে আলস্যে কেবল বোধ হয়, আর একটি লোক থাকিলে ভাল হইত। কাজেকর্ম্মে একান্ত অন্যমনস্ক থাকিলেও যেন তাহার জন্য ঔৎসুক্যের একটি প্রবাহ ফল্গুনদীর ন্যায় অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে অথচ অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হইতেছে।

কিন্তু সে মানুষটি কই। যাহার জন্য আমি ভাবিতে পারি, যাহাকে সিংহাসন দিয়া হৃদয়ের অধীশ্বর করিতে পারি, যাহাকে মনের কথা খুলিয়া বলিতে পারি, যাহাকে দেখিলে অবিমিশ্র বিশুদ্ধ আনন্দ প্রাপ্ত হই, যাহার কথায় কর্ণকুহর ভরিয়া যায়—একবার শুনিলে যাহার প্রতিধ্বনি চিরদিনের তরে কাণে লাগিয়া থাকে,—কখন অপনীত হয় না। সে মানুষ কোথায় পাই। কেহ কি বলিয়া দিতে পার? কমলাকান্ত বলিবেন, চাঁদ ভালবাস, চাঁদের সঙ্গে বিবাহ কর, ফুলের বিবাহ দাও, ফুল ভালবাস, কিন্তু কমলাকান্ত আহাম্মক, নহিলে সে এমন কথা কেন কহিবে। আমি যে মানুষ ভালবাসিতে চাই। স্বভাবের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া থাকা যায় সত্য; কিন্তু সে কয়দিন? চাঁদ ভালবাসিয়া মন পরিষ্কার হয় বটে, কিন্তু সে কয়দিন। একদিন দুইদিন। কি না হয় যখন মনে বড় কবিত্বের ঢেউ উঠিল বলিলাম স্বভাবই সুন্দর, কিন্তু স্বভাব কি আমার দুঃখে কখন দুঃখী হয়? একটা মনুষ্যের জীবন বড় লম্বা, শুধু স্বভাব ভালবাসিয়া কাটে না, আর কিছু চাই। মানুষ চাই, মনেরমতন মানুষ চাই। আমি তাহাকে চিনি, সে আমাকে চেনে। এমন মানুষ কোথায় পাই? আমার এ বিবাহে কে ঘটকালী করিবে? আমি কুল চাহি না, কোষ্ঠী চাহি না, গোত্র চাহিনা, পুরুষ চাহি না, পর্য্যায় চাহি না, দানসামগ্রী চাহি না। আমার এ বিবাহে দিন নাই, নক্ষত্র নাই, লগ্ন নাই, সম্বন্ধ হইলেই রাজযোটক হইবে। কাল অকাল দরকার নাই। পসন্দ

হইলেই যথেষ্ট—তৎক্ষণাৎ বিবাহ। কিন্তু ঘটক মিলে না, ঘটকে আর সব মিলাইতে পারে, কেবল মন মিলাইতে পারে না; আমার অমন ঘটকে কায নাই।

আরসীতে মুখ দেখিতে যাও—আরসীর দোষে আপনার মুখ কখন লম্বা দেখিবে কখন সরু দেখিবে, কখন দেখিবে বাঁকা, কখন দেখিবে গোল, কখন দেখিবে খেবড়া, কখন দেখিবে চেপ্‌টা। মানুষের মনও তেমনি আরসীবিশেষ। মানুষের মন যদি ভাল হয় সবই ভাল দেখায়। সবই সুন্দর দেখায়। কখন কখন বড় সুখের সময় সব সুখময় বোধ হয়, স্বর্গের সঙ্গীত দূর হইতে কাণ জুড়াইয়া দেয়, জনকোলাহলপূর্ণ নির্ব্বাতপ্রদেশও কোকিলকলরবসঙ্কুল নন্দনবনের ন্যায় বোধ হয়। সকল মানুষের মুখেই স্বর্গীয়সৌন্দর্য্য দেখায়। আবার কখন বোধ হয় সব অন্ধকার, পৃথিবী রসাতলে যাইতেছে। সমস্ত জগৎ কাঁদিতেছে—মানুষের মুখ শূকরের মত, আমার মন এখন আপন লইয়াই ব্যস্ত, আপন মনের মানুষ গড়িতে ব্যস্ত, অপর সকল বিষয়েই নির্জীব, উৎসাহশূন্য। আমার কাছে জগতের অস্তিত্ব নাই যদিও আছে ত নির্জীব প্রাণশূন্য। নদীর জল চলিতেছে, স্বভাবের নিয়মে; তাহাতে চন্দ্রকলা নাচিতেছে, স্বভাবের নিয়মে; ফুল ফুটিতেছে, স্বভাবের নিয়মে; মানুষে গান গাহিতেছে, স্বভাবের নিয়মে; আমিও ভালবাসার জন্য পাগল হইয়াছি স্বভাবনিয়মে জীবন কোথাও নাই। কিন্তু এই ভুবন নির্জীব বোধ হয় কেন? বাস্তবিকও স্বভাব আজিও যেমন আছে কালিও তেমনি থাকিবে কালি তেমনিই ছিল ইতরবিশেষ কিছু হয় নাই হইবে না হইবার সম্ভাবনাও নাই তবে আজি নির্জীব বোধ হয় কেন। ফিলজফরর। বলিতেন যাহা আমরা দেখিতে পাই না তাহা নাই, আরবের উপকূলভাগ নিরন্তর সুগন্ধে আমোদিত। কিন্তু তাহা ভোগ করিবার লোক নাই সুতরাং তাহা না থাকারই মধ্যে। জগতে জীবন আছে কিন্তু আমার মনে নাই। আমি যে আরসী দিয়া দেখি তাহার দোষে সবই নির্জীব বলিয়া বোধ হয়। আমার আরসীর দোষ কে সারিয়া দিবে? আমার কাষ্ঠপুত্তলীবৎ মৃণ্ময় দেবপ্রতিমাবৎ অন্তঃকরণে কে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে? এ প্রাণপ্রতিষ্ঠার পুরোহিত কোথায় মিলিবে? যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইলে জগৎ অবশ্য হাসিবে, নদীর জলে সুখের গান শুনিতে পাইব, পক্ষী গাইবে, প্রেমভরে। ঝিল্লী ডাকিবে রাগভরে। ফুল দুলিবে আলিঙ্গনের জন্য। কোকিল কুহু কুহু করিবে বিরহে। এ প্রাণ কে প্রতিষ্ঠা করিবে? কবে আবার এপ্রতিমা প্রাণ পাইয়া দুলিবে আর প্রকৃতি পুরোহিতপ্রদত্ত ধূপধুনা গন্ধপুষ্প উপহার পাইয়া হাসিবে! বিসর্জ্জনের সময় দূরে, এখন প্রাণপ্রতিষ্ঠা কখন হইবে। আমার মনের আকাঙ্ক্ষা কি মিলিবে? মনের মানুষ প্রাণের প্রাণ কি মিলিবে?

যৌবনে-সন্ন্যাসী

প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব। শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। ভারতসভার নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত ও প্রচারিত; মূল্য ৵০ আনা মাত্র। মুদ্রাযন্ত্রের উপকারিতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাস, ১৮৭৮ সালের ৯ আইনের বিবরণ এবং এই আইনজারি হওয়াতে দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের কি কি অপকার হইতেছে, সংক্ষেপে তাহা লিপিবার উদ্দেশ্যে এ প্রস্তাব প্রকাশ হইয়াছে। রজনীবাবু যথেষ্ট পরিশ্রম দ্বারা মুদ্রাযন্ত্রের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছেন; গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময় হিকি নামক একজন সাহেব, হিকির গেজেট (Hicky's Gazettee) নামে একখানি সংবাদপত্র ১৭৮১ সালে প্রকাশ করেন; এইখানি ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র। ১৮১৮ সালে মিসিনারি সাহেবেরা শ্রীরামপুর হইতে সমাচারদর্পণ নামে একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র বাহির করেন। এই সমাচার দর্পণই সমুদয় বাঙ্গালা সমাচারপত্রের আদি। তাহার পর সমাচার চন্দ্রিকা প্রকাশ হয়। ১৮৩৫ সালে চিরস্মরণীয় মেটকাপ্ সাহেব মেকলি সাহেবের সহযোগে দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দেন। ৪৫ বৎসর অবধি সেই স্বাধীনতা ছিল।

নয় আইন জারি হওয়াতে কি কি অপকার হইতেছে তাহা প্রস্তাব পাঠ করিয়া আমরা সমুদয় জানিতে পারিলাম না; পুস্তকখানি আমাদের অদৃষ্টক্রমে অসম্পূর্ণ। বোধ হয় তাহা দপ্তরীর দোষ। শেষভাগে লেখা আছে "সংবাদপত্রের মুখ একেবারে বন্ধ করিলে" —কি হয়?

চিকিৎসক (রোগ ও ঔষধ) শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায় জি, এল, সি, এস, ডি প্রণীত। হরিনাভী, মূল্য ৷৵০ আনা মাত্র। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন "পুস্তকখানি হস্তে পড়িলেই নেটিব ডাক্তার প্রণীত বলিয়া, বোধ হয় অনেকেই অশ্রদ্ধা করিবেন; কিন্তু পুস্তকখানি ডাক্তার রবার্টস্ ট্যানার, ওয়ারিং, এলিসন, হ্যামণ্ড, জেনার, কার্ব্বি, গ্রীনফিল্ড, রিঙ্গার, রিচার্ডসন, রিজলী, গুডিব চক্রবর্ত্তী, নর্ম্মান চিবার্স প্রভৃতি বিজ্ঞচিকিৎসকসগুলীর অনুমোদিত চিকিৎসাপ্রণালী অবলম্বনে প্রণীত, তবে কোন কোন স্থলে আমার ১০ বৎসরের বহুদর্শিতার যাহা উপাদেয় বিবেচনা হইয়াছে তাহাও উল্লেখিত হইয়াছে।"

পুস্তকখানি নেটিব ডাক্তারদের উপযোগী হইতে পারে কি না তাহা তাঁহারা আপনারা বিচার করিবেন বলিয়া গ্রন্থ হইতে একটী চিকিৎসাপ্রণালী উদ্ধৃত করা গেল।

"পানী বসন্ত। মৃদুবিরেচক, অন্তকালীন লাবণিক ঔষধ, কুইনাইন, লঘু পথ্য ইত্যাদি।"

বঙ্গদর্শন।

সপ্তম বৎসর।

৭৭ সংখ্যা।

অভিজ্ঞানশকুন্তল।

৩। শকুন্তলা,—নাটকের চরিত্র।

আমরা দেখিয়াছি যে দুষ্মন্ত অসীম বলের অধিকারী। তাঁহার বাহুবল দেবতাদিগের কাছেও পরিচিত। কি মনুষ্যের শত্রু, কি দেবতার শত্রু, তিনি সকলেরই দমনকারী—সকলেরই বিজেতা। আমরা আরও দেখিয়াছি, যে দুষ্মন্ত আলস্যবিদ্বেষী, শ্রমপ্রিয়, কষ্টসহিষ্ণু। তিনি দিবারাত্রি রাজকার্য্য করিয়া ক্লান্তি অনুভব করেন না—মধ্যাহ্নরবির ক্লিষ্টকারী কিরণরাশি তাঁহার কাছে তেজোহীন—অসীম শ্রমসাধ্য কার্য্য হইলেও তিনি তাহা সম্পন্ন করিতে পরাঙ্মুখ নন—তাঁহার অতুল দেহস্তম্ভ গিরিচর হস্তীর ন্যায় প্রভূত বলব্যঞ্জক। দুষ্মন্ত পুরুষপ্রধান—তাঁহার যে কয়টি গুণের উল্লেখ করিলাম, সে কয়টি পুরুষপ্রকৃতির গুণ। রমণীরত্ন শকুন্তলা সে রকমের নন। সখীদ্বয়ের সহিত শকুন্তলা সেই পবিত্রসলিলা মালিনীনদীতীরস্থ পরমরমণীয় শান্তিরসপরিপ্লুত তপোবনের তরুলতায় জলসেচন করিতে আসিতেছেন। তিনটি বালিকা দেখিতে প্রায় এক রকম—বয়সে প্রায় একরকম—একত্রে প্রতিপালিতা—এক-মন, এক-প্রাণ, এক-আত্মা। একটি সখী শকুন্তলাকে বলিতেছেন—

হলা শউন্তলে তত্তোবি তাতকণ্ণস্স অস্সমরুক্খআ পিঅদরা ত্তি তক্কেমি, জেণ ণোমালিআ-কুসুম-পরিপেলবাবি তুমং এদাণং আলবাল পূরণে নিউত্তা।

নবপ্রস্ফুটিত মল্লিকাফুল আর নবপ্রস্ফুটিত শকুন্তলাফুল একই বস্তু। এটিও যেমন সুন্দর ওটিও তেমনি সুন্দর। এটিও যেমন কোমল, ওটিও তেমনি কোমল। এটিও যেমন নরম, ওটিও তেমনি নরম। এটিও যেমন মধুরতাময়, ওটিও তেমনি মধুরতাময়। এটিও যেমন ক্ষুদ্র, ওটিও তেমনি ক্ষুদ্র। রমণীপুষ্প অনেক রকম আছে; কোনটি গোলাপ, কোনটি চাঁপা, কোনটি টগর, কোনটি

জবা, কোনটি ভায়লেট, কোনটি পদ্ম, কোনটী কর্ণিকার। এগুলির মধ্যে কোনটি ভাল কোনটি মন্দ। কিন্তু সকলেরই একটি সাধারণ গুণ আছে—সকলেই পুষ্পজাতীয় কোমলতার অধিকারী। সকলেই যে বৃক্ষকাষ্ঠ বা লতারজ্জু অবলম্বন করিয়া থাকে, সেই কাষ্ঠ এবং রজ্জু অপেক্ষা কোমল। নবপ্রস্ফুটিত মল্লিকাপুষ্প সেই কোমলতার প্রাণস্বরূপ। কেন না ইহা যেমন কোমল, তেমনি ক্ষুদ্র, তেমনি পাতলা এবং তেমনি ফুটফুটে। তাই অনসূয়া বলিতেছেন, যে মহর্ষি কণ্ব আশ্রমের তরুলতাগুলিকে শকুন্তলা অপেক্ষা ভালবাসেন। কেন না, শকুন্তলার দেহখানি যে রকম কোমল, তাহাতে সেই তরুলতাগুলিতে জল দিয়া বেড়াইতে হইলে, তাহা অবশ্যই শ্রমক্লিষ্ট হইয়া পড়িবে। আর হইলও তাই। দুই তিনটিমাত্র বৃক্ষে জলসেচন করিয়াই শকুন্তলা যেন একেবারে আলুথালু হইয়া পড়িলেন এবং হাঁপাইয়া উঠিলেন।

স্রস্তাংসা বতিমাত্রলোহিততলৌ বাহূ
ঘটোৎক্ষেপণা
দদ্যাপি স্তনবেপথুং জনয়তি শ্বাসঃ
প্রমাণাধিকঃ।
বদ্ধং কর্ণশিরীষরোধি বদনে ঘর্ম্মাম্ভসাং
জালকং
বন্ধে স্রংসিনি চৈকহস্তযমিতাঃ পর্য্যাকুলা
মূর্দ্ধজাঃ॥

ক্ষুদ্র কলসের ভারে শকুন্তলার ক্ষুদ্র বাহুলতা এলাইয়া পড়িল; শ্রমাধিক্যবশতঃ তাঁহার ধমনীপ্রবাহিতশোণিতস্রোত প্রবলতর হইয়া তাঁহার ক্ষুদ্র লোহিতবর্ণ করপল্লবটিকে অধিকতর লোহিতবর্ণ করিয়া তুলিল; তাঁহার নিঃশ্বাস ঘনঘন পড়িতে লাগিল, এবং নবযৌবনোন্নত বক্ষ ঝটিকাবিক্ষিপ্তস্রোতস্বিনীর ন্যায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; তাঁহার সুকোমল মুখখানি স্বেদবিন্দুতে পরিপূর্ণ হইল, এবং সেই স্বেদবিন্দুতে তাঁহার কর্ণের শিরীষপুষ্পগুলি অতি সুকোমলতা প্রযুক্ত জড়াইয়া গেল; তাঁহার কেশগুচ্ছ খসিয়া পড়িল, তাঁহার অলকাগুলি তাঁহার হস্তের অবরোধ না মানিয়া ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। সামান্য শ্রমে শকুন্তলাপুষ্পটী যেন বৃন্তস্খলিত হইয়া পড়িল। যেন ক্ষুদ্র লজ্জাবতী লতাটী অঙ্গুলিস্পর্শাস্বভব করিতে না করিতেই সঙ্কুচিত হইয়া গেল! এইজন্যই দুষ্মন্ত বলিয়াছিলেন যে শকুন্তলাকে তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া মহর্ষি কণ্ব যেন নীলোৎপলপত্রের কোমলতম ধারের দ্বারা কঠিনতম শমীবৃক্ষচ্ছেদনরূপ অসাধ্যসাধনের প্রয়াস পাইতেছেন।

ইদং কিলাব্যাজমনোহরং বপুঃ তপঃক্ষমং
সাধয়িতুং য ইচ্ছতি।
ধ্রুবং স নীলোৎপলপত্রধারয়া
শমীলতাং ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি॥

আমরা সকলেই পদ্মের পাতা দেখিয়াছি—নীলজলে বড় বড় পদ্মপত্র ভাসিতে দেখিয়াছি। জলের পাতায় প্রাণ—সে পাতা যেন কি রকম জলীয়

শক্তিতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। যেন কি রকমে জল একটু ঘন হইয়া পাতা হইয়া গিয়াছে। সে পাতা কি কোমল! কোমলতাময়ী শকুন্তলা নখদ্বারা সেই পাতাতেই অক্ষর কাটিয়াছিলেন। সে পাতায় নখের আঘাত সহ্য হয় না। নখস্পর্শে সে পাতা যেন গলিয়া যায়। আবার সেই বড় পাতাটিকে আস্তে আস্তে মৃণাল হইতে ছিঁড়িয়া তোল, পাতাটি অমনি যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবে। সে পাতার আবার ধার কি গা? যদি কোমলতার ধার থাকে তবে সে পাতার ধার সেই ধার। যদি কোমলতার কোমলতা থাকে, তবে সে কোমলতার নাম 'নীলোৎপলপত্রের ধার।' শকুন্তলার কোমলতা সেই রকম কোমলতা। যদি সে কোমলতার অপেক্ষা বেশী কোমলতা জগতে থাকে, তবে তাহা মনুষ্যের কল্পনাতীত। এখন সেই কোমলতার সহিত দুষ্মন্তের বলিষ্ঠতার তুলনা করিয়া দেখিলে যথার্থই বোধ হইবে যে, দুষ্মন্ত যে কঠিন শমীবৃক্ষ এবং কোমল নীলোৎপলপত্রের কথা বলিয়াছেন, স্বয়ং দুষ্মন্তই সেই শমীবৃক্ষ এবং তাঁহার শকুন্তলাই সেই নীলোৎপলপত্র। জগতে শারীরিক গঠন এবং শারীরিক বলসম্বন্ধে পুরুষ এবং স্ত্রীজাতির মধ্যে যথার্থই এত প্রভেদ। কর্ম্মের মূল শারীরিক বল এবং সেই জন্য জগতের কর্ম্মক্ষেত্র পুরুষের —রমণীর নয়। সামান্য জলসেচনশ্রমকাতরা শকুন্তলাকে দেখিয়া কে বলিবে যে ইনি পৃথিবীর ভয়ঙ্কর কর্ম্মক্ষেত্রে স্থান পাইবার যোগ্যা?

কিন্তু বলহীনা হইয়াও শকুন্তলা বলিষ্ঠা; কোমল হইয়াও শকুন্তলা কঠিনা; শ্রমকাতরা হইয়াও শকুন্তলা কষ্টসহিষ্ণু। আমরা দেখিয়াছি যে, একটি ক্ষুদ্র কলস বহন করিতে হইলে শকুন্তলা ভারাক্রান্তা বোধ করেন; আমরা দেখিয়াছি যে একটি ক্ষুদ্র কলস হইতে দুইটি কি চারিটি বৃক্ষমূলে জলসেচন করিয়া বেড়াইলেই শকুন্তলা আলুথালু হইয়া পড়েন। কিন্তু কোমলহৃদয়ে বিষম দুঃখভার ধারণ করিয়াও শকুন্তলা সুদীর্ঘ পথ হাঁটিতে শ্রান্তি অনুভব করেন না। হিমালয় পর্ব্বতের উপত্যকাস্থিত মহর্ষি কণ্বের আশ্রম হইতে হস্তিনাপুর বড় কমদূর নয়। সেই দূরপথ অরণ্যে পরিপূর্ণ। অরণ্যপথে গমনাগমন করা বিষম কষ্টসাধ্য। যেখানে অরণ্য নাই, সেখানে প্রচণ্ডরবি। ভারতের উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশে রবিকিরণ নিতান্তই অসহনীয়। আশ্রম হইতে যাত্রাকালে শকুন্তলার বিলম্ব দেখিয়া শার্ঙ্গরব কণ্বকে বলিতেছেন—

ভগবন্ দূরমধিরূঢ়ঃ সবিতা ত্বরয়াত্র-
ভবতীম্।

সেই প্রিয় আশ্রমপদ পরিত্যাগ করিয়া শোকবিহ্বলা শকুন্তলা সেই প্রচণ্ড রবিকিরণে হস্তিনাপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে কতই কষ্ট সহ্য করিলেন; করিয়া মধ্যাহ্নকালে দুষ্মন্তের রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়াই দুষ্মন্তের

বাক্যবাণ হৃদয়ে ধারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার দেহে ক্লান্তির চিহ্নমাত্র নাই—পথশ্রমের শ্রান্তিবিহ্বলতা নাই—আতপতাপিতার আরক্তিমতা নাই—দূরপথগমনের স্বেদবিন্দুমাত্র নাই। তখন তাঁহাকে দেখিয়া দুষ্মন্ত কেবল এই মাত্র বলিলেন—

কেয়মবগুণ্ঠনবতী নাতিপরিস্ফুটশরীর-
লাবণ্যা।
মধ্যে তপোধনানাং কিসলয়মিব পাণ্ডু-
পত্রাণাম্॥

আবার শকুন্তলা তখন মাতৃপদে আরোহণোদ্যতা! রমণি! তুমি কোমলতমা হইয়াও কঠিনতমা; তুমি বলহীনা হইয়াও বলিষ্ঠা; তুমি শ্রমকাতরা হইয়াও বিষম কষ্টসহিষ্ণু! তুমিই সৃষ্টির প্রকৃত রহস্য! একদিন জনকনন্দিনীও এই অদ্ভুত রহস্য দেখাইয়াছিলেন। নির্ব্বাসনাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া রাম সীতার নিকট গিয়া বলিলেন—"প্রিয়ে! অরণ্যে বিস্তর ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। তথায় গিরিকন্দর-বিহারী সিংহ নিরন্তর গর্জ্জন করিতেছে, উহা নির্ঝর জলের পতনশব্দ মিশ্রিত হইয়া কর্ণকুহর বধির করিয়া তুলে। দুর্দ্দান্ত হিংস্রজন্তু সকল উন্মত্ত হইয়া নির্ভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে, তাহারা সেই জনশূন্য প্রদেশে আমাদিগকে দেখিলেই বিনাশ করিতে আসিবে। নদীসকল নক্রকুম্ভীরসংকুল, নিতান্ত পঙ্কিল, উন্মত্ত মাতঙ্গেরাও সহজে পার হইতে পারে না। গমনপথে অনবরত কুক্কুটরব শ্রুতিগোচর হয় এবং উহা কণ্টকাকীর্ণ ও লতাজালে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, পানীয় জলও সর্ব্বত্র সুলভ নহে। সমস্ত দিন পর্য্যটনের পর রাত্রিতে বৃক্ষের গলিতপত্রে শয্যা প্রস্তুত করিয়া ক্লান্তদেহে শয়ন এবং মিতাহারী হইয়া ভোজনকালে স্বয়ং পতিত ফলে ক্ষুধাশান্তি করিতে হয়। তথায় বায়ু সততই প্রবলবেগে বহিতেছে, কুশ ও কাশ আন্দোলিত এবং কণ্টকবৃক্ষের শাখা সকল কম্পিত হইতেছে। রজনীতে ঘোরতর অন্ধকার, ক্ষুধার উদ্রেক সর্ব্বক্ষণ হয়, আশঙ্কাও বিস্তর। তন্মধ্যে বিবিধাকার বহুসংখ্য সরীসৃপ আছে, তাহারা পথে সদর্পে ভ্রমণ করিতেছে। স্রোতের ন্যায় বক্রগতি নদী-গর্ভস্থ উরগেরা গমনপথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছে। বৃশ্চিক কীট এবং পতঙ্গ ও দংশ মশকের যন্ত্রণা সর্ব্বদাই ভোগ করিতে হয়, কায়ক্লেশও বিস্তর, এই কারণেই কহিতেছি অরণ্য সুখের নহে। নিবারণ করি, তুমি তথায় যাইও না। বনবাস তোমায় সাজিবে না (১)।" কিন্তু বনবাস তাঁহাকে সাজিয়াছিল কি না তাহা সকলেই জানেন। ইতিহাসেও আমরা এই রহস্য দেখিয়া থাকি। বিপদগ্রস্ত শিশুসন্তানের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য

(১) হেমচন্দ্র—অযোধ্যাকাণ্ড, ১৫৩—৫৪ পৃষ্ঠা। স্থানে স্থানে দুই এক পংক্তি ছাড়িয়া দিলাম।

জননী অনেক সময়ে পর্ব্বতাদি উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন, অম্বুরাশি তুচ্ছ করিয়াছেন, জলরাশি ভেদ করিয়াছেন। ভারতে রমণীবীরত্ব সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। অসূর্য্যম্পশ্যা কোমলাঙ্গী বীর-দর্পে পুরুষোত্তম যাইতেছেন, গয়া-কাশী যাইতেছেন, কামরূপ-বৈদ্যনাথ যাই-তেছেন। এ রহস্যের অর্থ কি? আমা-দের বোধ হয় ইহার অর্থ এই—পুরুষ, শরীরের বলে বলিষ্ঠ; রমণী, হৃদয়ের বলে বলিষ্ঠা। পুরুষ সর্ব্বদাই কর্ম্মক্ষম; রমণী কেবল হৃদয়ের বেগে বেগবতী হইলেই কর্ম্মক্ষম। পুরুষ সর্ব্বক্ষণই জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করেন; রমণী কদাচিৎ কখন জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে দেখা দেন। কর্ম্মশীলতা পুরুষের স্বাভা-বিক ধর্ম্ম, রমণীর অবস্থাসাপেক্ষ ধর্ম্ম। কিন্তু রমণী যখন সেই অবস্থায় পতিত হন, তখন তাঁহাতে এবং পুরুষেতে কোন প্রভেদ থাকে না—তখন কোমলতম নীলোৎপলপত্র কঠিনতম শমীবৃক্ষ হইয়া উঠে। স্ত্রীজাতি এই আশ্চর্য্য বৈপরী-ত্যের আধার বলিয়া জগতের প্রধান রহস্যমধ্যে পরিগণিত।

যে হৃদয়ের গুণে শকুন্তলা বলিষ্ঠা, আবার সেই হৃদয়ের গুণেই শকুন্তলা বলহীনা। যে হৃদয়ের গুণে শকুন্তলা কার্য্য করিতে সক্ষম, আবার সেই হৃদ-য়ের গুণেই শকুন্তলা কার্য্য করিতে অক্ষম। রমণীহৃদয়ের এই আশ্চর্য্য রহস্য মহাকবি কালিদাস যে প্রকারে দেখাইয়াছেন জগতের আর কোন কবি সে প্রকারে দেখান নাই। দুষ্মন্ত রাজ-ধানীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। করিয়া তাঁহার স্বাভাবিক রীত্যনুসারে রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। কিন্তু শকুন্তলা সকল কর্ম্ম ভুলিয়া—প্রিয়তমা প্রিয়-ম্বদাকে ভুলিয়া—প্রিয়তমা অনসূয়াকে ভুলিয়া—আশ্রমের লতা মৃগগুলিকে ভুলিয়া—কেবল দুষ্মন্তকে ভাবিতেছেন। ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরের ভিতর বামকরতলে গণ্ড স্থাপন করিয়া প্রস্তরনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় নিস্পন্দভাবে দুষ্মন্তকে ভাবিতেছেন। এমন সময়ে প্রজ্বলিত হুতাশনপ্রতিম মহর্ষি দুর্ব্বাসা আসিয়া ভয়ঙ্কর স্বরে 'অয়মহং ভো' বলিয়া সেই ক্ষুদ্র কুটীর-স্থিতা ক্ষুদ্র বালিকার সম্মুখে আতিথ্য-প্রার্থী হইয়া দাঁড়াইলেন। সেই ভয়ঙ্কর স্বরে সমস্ত আশ্রমারণ্য যেন কাঁপিয়া উঠিল। অদূরে প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া শকুন্তলার ইষ্টদেবতার পূজার নিমিত্ত পুষ্পচয়ন করিতেছিলেন, তাঁহারা যেন শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু দুষ্মন্তনিমগ্না প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ নিস্পন্দা শকুন্তলা নিস্পন্দ-ভাবেই রহিলেন। তখন তিনি তাঁহাতে নাই; তখন তাঁহার কাছে বাহ্যজগৎ প্রলয়নিমগ্ন; মানবাত্মা যেমন পরমাত্মায় লীন হয়, তেমনি হৃদয়সর্ব্বস্ব শকুন্তলা তখন দুষ্মন্তহৃদয়ে লীন। তখন যদি এই পৃথিবী-গ্রহ-নক্ষত্রময় ব্রহ্মাণ্ড ঘোররবে ছিন্নভিন্ন হইয়া মহাপ্রলয়ে নিমগ্ন হইক, তাহা হইলেও দুষ্মন্তময়ী শকুন্তলা সেই

সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রলয়ে মিলাইয়া যাইতেন, জানিতেও পারিতেন না যে কি হইল! বজ্রগম্ভীর স্বরে দুর্ব্বাসা শাপ দিলেন—

আঃ কথমতিথিং মাং পরিভবসি।
বিচিন্তয়ন্তী য মননামানসা
তপোনিধিং বেৎসি ন মা মুপস্থিতম্।
স্মরিষ্যতি ত্বাং ন স বোধিতোঽপি সন্
কথাং প্রমত্তঃ প্রথমং কৃতামিব॥

এখনও সংজ্ঞা নাই! জীবিতা শকুন্তলা এখনও জীবনহীন! তাঁহার জীবন, জ্ঞান, দেহ, দৈহিকশক্তি—সকলই এখন তাঁহার অতলস্পর্শ হৃদয়ে বিলুপ্ত। সে হৃদয় যথার্থই অতলস্পর্শ। প্রেমানলসন্তাপিতা শকুন্তলা যখন প্রথম দুষ্মন্তের কথা বলেন, তখন প্রিয়ম্বদা বলিয়াছিলেন যে বেগবতী স্রোতস্বিনী মহাসাগরাভিমুখেই ছুটিয়া থাকে—সুকোমল মাধবীলতা চূতবৃক্ষকেই জড়াইয়া উঠে। দুষ্মন্ত নানাগুণে গুণবান্—তাঁহার চরিত্রের বিস্তার অনন্ত সমুদ্রের ন্যায় অসীম বলিলেই হয়। শকুন্তলাচরিত্রের বিস্তার নাই। তাঁহাতে দুষ্মন্তের বাহুবল নাই, শস্ত্রনৈপুণ্য নাই, মৃগয়াদক্ষতা নাই, পাণ্ডিত্য নাই, উচ্চ বিচারশক্তি নাই, অপরিমেয় কর্ম্মশীলতা নাই, অপরিমেয় শ্রমশীলতা নাই, অপরিমেয় কার্য্যদক্ষতা নাই। তাঁহার থাকিবার মধ্যে এক হৃদয় আছে। কিন্তু সে হৃদয়ের গভীরতা এবং অনন্ত সমুদ্রের গভীরতা সমান। পুরুষ, চরিত্রবিস্তারে সমুদ্রবৎ—রমণী, হৃদয়গভীরতায় সমুদ্রবৎ। পুরুষ ভালবাসায় সামগ্রীকে রমণীর মত তত আত্মগত করিতে পারে না—তত আপনাতে মিশাইয়া লইতে পারে না—তত আত্মবিস্মৃত হইয়া, তত জগদ্বিস্মৃত হইয়া ভাবিতে পারে না। পুরুষ-হৃদয়ের গভীরতা কম। সেই জন্য পুরুষ বিরহে অস্থির হইয়া পড়ে। রমণীহৃদয়ের গভীরতা অপরিমেয়। সেই জন্য রমণী বিরহে হৃদয়সর্ব্বস্ব, হৃদয়ময়ী হইয়া থাকে। দুষ্মন্তকে ভাবিতে ভাবিতে শকুন্তলা একেবারে জীবনহীন প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় স্পন্দহীনা। কিন্তু অঙ্গুরীয় পুনর্দর্শনান্তর শকুন্তলাকে ভাবিতে ভাবিতে দুষ্মন্ত অধীর, অস্থির, অনেকটা গাম্ভীর্য্যভ্রষ্ট, উন্মত্তের ন্যায় প্রগল্‌ভ। শকুন্তলার হৃদয় অনন্তাধার—যতই কেন দুঃখ হউক না সে হৃদয়কে ছাপাইয়া উঠিয়া দেহ বা জ্ঞানকে সংক্ষুব্ধ করিতে পারে না, কারণ হৃদয়ের তুলনায় শকুন্তলার দেহ এবং জ্ঞান নাই বলিলেই হয়। দুষ্মন্তের হৃদয় পরিমিতাধার,—ভাবনা একটু বেশী হইলেই সে হৃদয়কে ছাড়াইয়া উঠিয়া শরীরকে অস্থির করিয়া তুলে, জ্ঞানকে বিহ্বল করিয়া ফেলে। হৃদয়ের মোহে রমণী বাহ্যজগৎ ভুলিয়া যান, পুরুষ ভুলিয়া যান না। শকুন্তলা সেই ভয়ঙ্কর "অয়মহং ভো" শুনিতে পাইলেন না—সেই ভয়ঙ্করশাপ শুনিতে পাইলেন না। কিন্তু দুষ্মন্ত বিহ্বল-হৃদয়, বিহ্বল-জ্ঞান, এবং মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়াও বিপন্নের ভয়ার্ত্তরব শ্রবণমাত্র বীরবিক্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দুষ্মন্তকে শোক-

বিহ্বল দেখিয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত মাতলি মাধব্যকে ভয়প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দুষ্মন্ত মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'মাধব্যং প্রতি ভবতা কিমেবং প্রযুক্তম্।' মাতলি উত্তর করিলেন—

'তদপি কথ্যতে কিঞ্চিন্নিমিত্তাদপি মনঃসন্তাপাদায়ুষ্মান্ ময়া বিক্লবো দৃষ্টঃ পশ্চাৎ কোপয়িতুমায়ুষ্মন্তং তথা কৃতবানস্মি।'

মাতলি সিদ্ধকাম হইলেন। শোকবিহ্বল দুষ্মন্তের কাছে বাহ্যজগৎ প্রবল হইল। নিমেষমধ্যে দুষ্মন্তের শোকবিহ্বলতা কর্ম্মশীলতায় পরিণত হইল। কিন্তু হৃদয়মুগ্ধা শকুন্তলা ভয়ঙ্কর দুর্ব্বাসাসত্ত্বেও হৃদয়মুগ্ধাই রহিলেন। বিলুপ্ত বাহ্যজগৎ বিলুপ্তই রহিল। হৃদয়মধ্যায় নিশ্চেষ্টতা নিশ্চেষ্টতাই রহিল। যে হৃদয়ের গুণে রমণী চেষ্টাশীলা সেই হৃদয়ের গুণেই রমণী নিশ্চেষ্টা। হৃদয়ই রমণীচরিত্রের প্রধান ভিত্তি এবং প্রধান উপাদান। হৃদয়ের গুণেই স্ত্রীজাতি পুরুষজাতি হইতে ভিন্ন। কালিদাসের শকুন্তলা সেই রমণীহৃদয়রহস্যের উজ্জ্বলতম প্রতিমা। এবং সেই প্রতিমা পুরুষচরিত্রের তুলনায় উজ্জ্বলতম অপেক্ষা উজ্জ্বল। এমন তুলনামূলক নারীহৃদয়প্রতিমা জগতের আর কোন নাটকে নাই।

এখন জিজ্ঞাস্য এই, প্রিয়বস্তুর বিরহ রমণীহৃদয়ে এত লাগে কেন, পুরুষহৃদয়ে এত লাগে না কেন? দুষ্মন্ত ত শকুন্তলাকে রাখিয়া রাজধানীতে গিয়া রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুষ্মন্তকে ছাড়িয়া শকুন্তলা এমন হইলেন কেন। আমাদের বোধ হয় ইহার কারণ এই,—পুরুষ প্রিয়বস্তুকে শুধু হৃদয়ে রাখিয়াই অনেকপরিমাণে সন্তুষ্ট; রমণী তা নয়। রমণী প্রিয়বস্তুকে চোকে চোকে রাখিতে চায়। পুরুষ প্রিয়বস্তুর কল্পনাতে সন্তুষ্ট; রমণী খোদ প্রিয়বস্তু ব্যতিরেকে সন্তুষ্ট নন। ১৮৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের Nineteenth Century তে অধ্যাপক মেলক A Dialogue on Human Happiness নামক একটি প্রবন্ধ লেখেন। একটি পুরুষ আর একটী রমণী কথোপকথন করিতেছেন। রমণী সতেজে বলিতেছেন—"Heavens! do you know so little as to think that were a man in love really, he could endure to be absent, without necessity, a day from the woman he was in love with? No: he is never happy when away from her." সম্ভাষিত পুরুষ ইহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না, এবং বলিলেন যে ইহাকে যদি প্রণয় বলে তবে যেন প্রণয়ের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ না থাকে। রমণীহৃদয় শুধু হৃদয়ে ভর করিয়া থাকিতে পারে না। রমণী হৃদয়ের বস্তুকে সর্ব্বদাই চোকের উপর রাখিতে চাহেন। সেই নিমিত্ত যখন হৃদয়ের বস্তু চোকের

অন্তরালে থাকে, তখন রমণী আপন হৃদয়ের ভিতর লুকাইয়া কল্পনার বলে অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলেন, এবং সেই কল্পনাসম্ভূত বস্তুতে প্রকৃত বস্তু বোধে মিশাইয়া থাকেন। রমণী বাহ্য অবলম্বন ব্যতিরেকে থাকিতে পারেন না। পুরুষের মন অনেক পরিমাণে সেই মনসাপেক্ষ; কিন্তু রমণীহৃদয় বাহ্যজগৎসাপেক্ষ। এবং সেই নিমিত্তই বাহ্যজগতের অভাবে রমণী তাঁহার আশ্চর্য্য হৃদয়াভ্যন্তরে আশ্চর্য্যতম বাহ্যজগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সে আশ্চর্য্য বাহ্যজগতের কাছে প্রকৃত বাহ্যজগৎ অস্তিত্বহীন। পুরুষজাতির মধ্যে উচ্চশ্রেণীর কবি ভিন্ন আর কেহ সেরকম আশ্চর্য্য বাহ্যজগৎ সৃষ্টি করিতে পারে না। রমণীমণ্ডলে সকলেই উচ্চশ্রেণীর কবি। দার্শনিকেরা বলিয়া থাকেন এবং ইতিহাসেও দেখা যায় যে যেখানে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ জগৎ, সেখানে বাহ্যজগৎ বিলুপ্ত। যে যোগীর মনে পরমাত্মা প্রত্যক্ষ, সে যোগীর নয়নে বাহ্যজগৎ অপ্রত্যক্ষ—অস্তিত্বহীন। যে শকুন্তলার চক্ষে সম্মুখস্থ বাহ্যজগৎ অপ্রত্যক্ষ, সেই শকুন্তলার হৃদয়ে দূরবর্ত্তী দুষ্মন্ত প্রত্যক্ষ। রমণী প্রত্যক্ষপ্রিয়, প্রত্যক্ষানুরাগী, প্রত্যক্ষাপেক্ষী এবং সেই জন্য শোকে এবং বিরহে রমণী এত অন্তর্লীনতাপ্রিয়। কালিদাস ভিন্ন আর কোন কবি এই নিগূঢ়তত্ত্ব বুঝান নাই। পর্ণকুটীরে দুষ্মন্তনিমগ্না শকুন্তলা,—এটি উৎকৃষ্ট কবিপ্রতিভার অক্ষয়, অনন্তমহিমাপূর্ণ, উৎকৃষ্টতম কীর্ত্তি। এ কবি যাহাদের, তাহারা যথার্থই জগতে স্পর্দ্ধাপন্ন।

আমরা শকুন্তলার যে মূর্ত্তিটী দেখিলাম সেটি স্ত্রীজাতির অন্তর্লীন মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তিতে স্ত্রীজাতির অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অন্তর্নিহিত। সে মূর্ত্তি দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়, বিস্মিত হইতে হয়, ভীত হইতে হয়। এই আশ্চর্য্য অন্তর্লীনতা ভাবপ্রখরতার ফল। এত ভাবপ্রখরতা (Intensity of feeling) আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। এত ভাবপ্রখরতাপূর্ণ অস্তিত্ব আমাদিগকে প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হয়। আমাদের বোধ হয় যে, যে মুহূর্ত্তকালের জন্য বাহ্যজগৎ দেখিয়াছে এবং বাহ্যজগতে বাস করিয়াছে সে কখন এত অন্তর্নিমগ্ন হইতে পারে না, এত অন্তর্লীনতাপ্রাপ্ত হয় না। এই ভাবপ্রখরতাপূর্ণ অন্তর্লীনতা দেখিয়া আমরা ভীত হই। আমাদের বোধ হয় যে যাহার এত ভাবপ্রখরতা সে যদি শকুন্তলার ন্যায় ভাল হয়, তবে পৃথিবীতে তাহার অপেক্ষা ভাল জিনিস আর কিছুই হইতে পারে না, কিন্তু যদি সেক্ষপীয়রচিত্রিত লেডি মেকবেথের ন্যায় মন্দ হয়, তবে পৃথিবীতে তাহার অপেক্ষা মন্দ জিনিস আর কিছুই হইতে পারে না। এবং জগতের ইতিহাসেও দেখা যায় যে, পুরুষ যতই ভাল হউক না, ভাল স্ত্রীর মতন ভাল হইতে পারে না—এবং যতই মন্দ হউক না, মন্দ স্ত্রীর মতন

মন্দ হইতে পারে না। এই ভাবগ্রথ-রতাপূর্ণ অন্তর্লীনতা দেখিয়া আমরা বিস্মিতও হই। আমাদের বোধ হয় যেন একখানা প্রকাণ্ড হিমশিলাখণ্ড অনন্তকাল গিরিকন্দরাবদ্ধ রহিয়াছে—কখন গলে নাই, কখন গলিতে পারিবেও না। কিন্তু রমণীহৃদয় রহস্যময়। আবদ্ধ হিমশিলাখণ্ড যেমন গলে, আবদ্ধ রমণীহৃদয়ও তেমনি গলে। এবং হিমশিলা গলিয়া যেমন তরু, লতা, প্রস্তর সকলই ভাসাইয়া লইয়া যায়, রমণীহৃদয় গলিলেও তেমনি স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, কোমলহৃদয়, কঠিনহৃদয় সকলকেই ভাসাইয়া লইয়া যায়। কথাটি সত্য কি না, অভিজ্ঞানশকুন্তলের বিদায় দৃশ্যটি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়। সে দৃশ্যের ন্যায় কোমল, হৃদয়াপহারী, কবিতাময়, মানবপ্রকৃতিপ্রকাশক জিনিস আমরা আর কোথাও দেখি নাই। কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দিলাম :—

গৌতমী। বৎসে! স্বজনবৎ স্নেহপূর্ণ তপোবনদেবতারা তোমায় গমনে অনুমতি করিতেছেন। ইঁহাদিগকে প্রণাম কর।

শকুন্তলা। (প্রণাম পূর্ব্বক কয়েক পদ গিয়া জনান্তিকে) সখি প্রিয়ম্বদে, আমি যদিও আর্য্যপুত্রকে দেখিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি, তথাপি আশ্রমপরিত্যাগে আমার পা উঠিতেছে না।

প্রিয়ম্বদা। তুমিই যে কেবল তপোবনপরিত্যাগে কাতর হইয়াছ তাহা নহে, তপোবনও তোমার বিরহকাল উপস্থিত দেখিয়া কাতর হইতেছে। মৃগদিগের মুখের কুশগ্রাস পড়িয়া যাইতেছে, ময়ূরেরা নৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছে এবং লতাসকল পাণ্ডুপত্র মোচনচ্ছলে যেন অশ্রুপাত করিতেছে।

শকু। (স্মরণ করিয়া) পিতঃ! লতাভগিনী বনজ্যোৎস্নাকে সম্ভাষণ করি।

কণ্ব। জানি সেই লতার উপর তোমার সোদরস্নেহ আছে। এই সে দক্ষিণপার্শ্বে আছে।

শকু। বনজ্যোৎস্নে! তুমি সহকারের সহিত সমাগত হইলেও দূরপ্রসারিত শাখাবাহু দ্বারা আমাকে প্রত্যালিঙ্গন কর। আমি আজ অবধি তোমাকে ছাড়িয়া যাইতেছি।

ক। আমি তোমার জন্য অগ্রে যেরূপ ইচ্ছা করিয়াছিলাম তুমি স্বগুণে সেই আত্মসদৃশ স্বামী পাইয়াছ। আর এই নবমল্লিকা সহকারবৃক্ষের সহিত মিলিয়াছে। এক্ষণে তোমার ও ইহার জন্য আমার দুর্ভাবনা দূর হইয়াছে। এইস্থান দিয়া চল।

শকু। (সখীদ্বয়ের প্রতি) সখি, আমি এই লতাটিকে তোমাদের দুজনের হাতে সঁপিয়া দিলাম।

সখী। আমাদিগকে কাহার হাতে সঁপিলে?

ক। অনসূয়ে কাঁদিও না, তোমরাই ত এখন শকুন্তলাকে প্রবোধ দিবে।

(সকলেই যাইতেছে)

শকু। এই উটজচারিণী গর্ভমন্থরা মৃগী যখন ভালয় ভালয় প্রসব হইবে তখন তোমরা আমার নিকট লোক পাঠাইও। সে গিয়া আমাকে এই প্রিয়সম্বাদ দিবে।

ক। না, আমরা ইহা ভুলিব না।

শকু। (গতিব্যাঘাত দেখিয়া) কে আমার বস্ত্র আটকাইতেছে? (দেখিবার নিমিত্ত মুখ ফিরাইল)

ক। বৎসে! যাহার মুখ কুশাগ্রদ্বারা বিদ্ধ হইলে তুমি ক্ষতশোষক ইঙ্গুদীতৈল-সেক করিতে, তুমি যাহাকে শ্যামাক ধান্যমুষ্টি দিয়া পোষণ করিয়াছ, সেই তোমার কৃতকপুত্র মৃগ তোমার অনুসরণ করিতেছে।

শকু। বৎস! আমি তোমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছি, তুমি কেন আমার অনুসরণ কর। তোমার জননী তোমায় প্রসব করিয়াই মরিয়া যায়, তুমি সেই জননীব্যতীত আমার যত্নে এত বড়টি হইয়াছ। এখন আমি আবার চলিলাম। এখন পিতাই তোমার ভাবনা ভাবিবেন। যাও ফের। (রোদন করিতে করিতে প্রস্থান)

ক। বাষ্প তোমার উন্নতপক্ষ্মযুক্ত নেত্রদ্বয়ের দর্শনব্যাপার নিরোধ করিতেছে। এই ভূমিভাগ উন্নতানত। বাষ্পাবরোধ হেতু ইহা সম্যক্ লক্ষিত না হওয়াতে তোমার পদস্খলন হইতেছে।

শার্ঙ্গরব। ভগবন্ শুনা যায় যে নদী বা সরোবর পর্য্যন্ত স্নিগ্ধব্যক্তিকে অনুগমন করা কর্ত্তব্য। এই অদূরে সরোবরতীর। যা বলিবার থাকে এখানে বলিয়া ফিরুন।

ক। ভাল, আইস আমরা এই ক্ষীরবৃক্ষচ্ছায়ায় আশ্রয় লই।

(সকলের উপবেশন)

ক। বহুমানাস্পদ দুষ্মন্তের নিকট বলিতে পারা যায় এমন কি কথা বলিয়া দিব। (চিন্তা)

শকু। সখি, দেখ, চক্রবাক নলিনীপত্রের অন্তরালে আছে। চক্রবাকী তাহাকে দেখিতে না পাইয়া সকাতরে চীৎকার করিতেছে। কিন্তু আমি এতাবৎকাল আর্য্যপুত্রকে না দেখিয়া আছি। আমি দুষ্কর কার্য্য করিতেছি।

অনসূয়া। সখি, এমন কথা বলিও না। এই চক্রবাকীও প্রিয়ব্যতীত দীর্ঘতরা রজনীযাপন করিয়া থাকে। আশা অতি গুরুতর বিরহদুঃখও সহনীয় করিয়া দেয়।

ক। শার্ঙ্গরব, তুমি শকুন্তলাকে সম্মুখে রাখিয়া আমার বাক্যক্রমে সেই রাজাকে এইরূপ বলিবে।

শার্ঙ্গ। মহাশয় আজ্ঞা করুন।

ক। আমরা তপোধন, আমাদিগকে চিন্তা করিয়া, তোমার উচ্চবংশকে চিন্তা করিয়া, আর সুহৃদ্স্বজনেরা যাহা কোন রূপে ঘটাইয়া দেয় নাই, শকুন্তলার সেই স্নেহপ্রবৃত্তি চিন্তা করিয়া তুমি ভার্য্যাগণের মধ্যে সমান আদরে ইহাকে দেখিবে। ভাগ্যে থাকে ইহা অপেক্ষা

অধিক হইবে, বধূবন্ধুগণের তাহা বলা উচিত হয় না।

শার্ঙ্গ। মহাশয়ের কথা গ্রহণ করিলাম।

ক। বৎসে! এখন তোমাকে কিছু উপদেশ দেওয়া আবশ্যক। আমরা বনবাসী হইলেও লৌকিক ব্যাপার বুঝিয়া থাকি।

শার্ঙ্গ। বুদ্ধিমান্ লোকের কিছুই অজ্ঞাত থাকিতে পারে না।

ক। তুমি এ স্থান হইতে ভর্তৃকুলে গিয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিও, সপত্নীগণের প্রতি প্রিয়সখীবৎ ব্যবহার করিও, অপমানিত হইলেও পতির প্রতিকূলচারিণী হইও না, পরিচারকদিগের উপর অধিক অনুকূল হইও, এবং সৌভাগ্যকালে গর্ব্বিত হইও না। যুবতীরা এইরূপেই গৃহিণীপদ পায়। আর যাহারা ইহার বিপরীতাচরণ করে, তাহারা পতিকুলের যাতনাস্বরূপ হইয়া থাকে। এই বিষয়ে গৌতমীই বা কি বলেন?

গৌ। বধূর প্রতি এইই উপদেশ। বাছা, এই সকল মনে রাখিও।

ক। বৎসে! তুমি আমাকে ও সখীদিগকে আলিঙ্গন কর।

শকু। পিতঃ! প্রিয়ম্বদা প্রভৃতি সখীরা কি এ স্থান হইতেই ফিরিয়া যাইবে?

ক। বৎসে! প্রিয়ম্বদা ও অনসূয়ারও বিবাহ দিতে হইবে। তথায় যাওয়া ইহাদের উচিত হয় না। গৌতমী তোমার সহিত যাইবেন।

শকু। (পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া) আমি এখন তোমার অঙ্কচ্যুত হইয়া কিরূপে চন্দনবৃক্ষচ্ছিন্ন চন্দনশাখার ন্যায় বাঁচিয়া থাকিব?

ক। বৎসে! তুমি কেন এইরূপ কাতর হইতেছ। তুমি মহাকুলোৎপন্ন পতির স্পৃহণীয় গৃহিণীপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তাঁহার ঐশ্বর্য্যসম্ভারে দুর্ব্বহ গৃহকার্য্যে প্রতিক্ষণ ব্যস্ত থাকিব এবং পূর্ব্বদিক্ যেমন সূর্য্যকে প্রসব করে সেইরূপ অচিরাৎ এক পবিত্র পুত্র প্রসব করিয়া আমার বিরহজনিত শোক অনুভব করিতে পারিবে না।

শকু। (পিতৃচরণে প্রণাম করিলেন)

ক। আমার যাহা সংকল্প তোমার তাহাই হউক।

শকু। (সখীদিগের সন্নিহিত হইয়া) সখি, তোমরা দুজনে এককালেই আমায় আলিঙ্গন কর।

সখীদ্বয়। (আলিঙ্গন করিয়া) সখি, যদি সেই রাজা তোমায় চিনিতে না পারেন, তাহা হইলে তুমি তাঁহাকে এই তাঁহারই নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়টি দেখাইও।

শকু। আমি তোমাদের এই কথায় ভীত হইলাম।

সখীদ্বয়। ভয় পাইও না, স্নেহ অনিষ্ট আশঙ্কা করে।

শার্ঙ্গ। বেলা দ্বিতীয় প্রহর, তোমরা সত্বর হও।

শকু। (আশ্রমাভিমুখী হইয়া) পিতঃ কবে আবার তপোবন দেখিব

ক। শুন, তুমি বহুকাল যাবৎ এই সসাগরা পৃথিবীপতির মহিষী হইয়া, পুত্রকে নিষ্কণ্টকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পুত্রন্যস্তপ্রজারক্ষণভার ভর্ত্তার সহিত এই শান্ত আশ্রমে পুনর্ব্বার বাস করিবে।

গৌ। বাছা, গমনকাল অতীত হইতেছে, পিতাকে ফিরাইয়া দাও। অথবা শকুন্তলা অনেকক্ষণ ধরিয়া পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলিবে, তুমিই ফিরিয়া যাও।

ক। বৎসে! তপোনুষ্ঠানের ব্যাঘাত হইতেছে।

শকু। (পুনরায় পিতাকে আলিঙ্গন করিয়া) তোমার শরীর তপশ্চর্য্যায় পীড়িত, অতএব আমার জন্য আর অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত হইও না।

ক। (দীর্ঘনিশ্বাসপরিত্যাগপূর্ব্বক।) বৎসে! তুমি পর্ণশালার দ্বারদেশে যে খুঁড়িধান্যের পূজোপহার দিয়াছিলে, তাহা হইতে এখন অঙ্কুর বাহির হইয়াছে। আমি যখন তা দেখ্‌ব তখন কিরূপে আমার শোকসম্বরণ হইবে!

(শকুন্তলা সহযাত্রিগণের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইলেন)

আশ্রমপালিতা আশ্রমপ্রিয়া তাপসবালা চিরকালের জন্য আশ্রমত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। শকুন্তলা সেই পবিত্র আশ্রমের প্রাণস্বরূপ। তাঁহাকে গমনোদ্যতা দেখিয়া শকুন্তলা-পালিতা আশ্রমটী যেন শোকবিহ্বল হইয়া উঠিল। "মৃগদিগের মুখের কুশগ্রাস পড়িয়া যাইতেছে, ময়ূরেরা নৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছে এবং লতাসকল পাণ্ডুপত্রমোচনচ্ছলে যেন অশ্রুপাত করিতেছে।" যাহাকে বাসস্থান হইতে বিদায় দিতে হইলে, সমস্ত বাসস্থানটী বিরহকাতর বলিয়া অনুভব হয়, সে যথার্থই সেই বাসস্থানের প্রাণ। আজ প্রিয়ম্বদা প্রভৃতির বোধ হইতেছে যে, পশু পক্ষী প্রভৃতি নানাবিধ প্রাণীর শান্তিময় আশ্রয়স্থল সেই পবিত্র আশ্রমটী প্রাণহীন হইয়া পড়িতেছে। আশ্রমপ্রাণা শকুন্তলাও যেন প্রাণহীন হইয়া পড়িতেছেন। তিনি যেদিকে চাহিতেছেন, সেইদিকেই তাঁহার স্বহস্তপ্রতিপালিত, তাঁহার সুমধুর স্নেহপরিপুষ্ট তরু, লতা, মৃগ, মৃগীসকল বিমর্ষভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কয়েক পদ গমন করিয়া তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। ব্যাকুলিতান্তঃকরণে বলিয়া উঠিলেন—'পিতঃ! লতাভগিনী বনজ্যোৎস্নাকে সম্ভাষণ করি।' পিতা জানিতেন যে তাঁহার আশ্রমের সকল পদার্থই তাঁহার শকুন্তলার প্রাণ এবং তাঁহার শকুন্তলা তাঁহার আশ্রমের সকল পদার্থের প্রাণ। তিনি বলিলেন—'জানি সেই লতার উপর তোমার সোদরস্নেহ আছে। এই সে দক্ষিণপার্শ্বে রহিয়াছে।' অমনি শকুন্তলা বিদীর্ণহৃদয়ে বলিলেন—'বনজ্যোৎস্নে! তুমি সহকারের সহিত সমাগত হইলেও দূরপ্রসারিত শাখাবাহুদ্বারা আমাকে প্রত্যালিঙ্গন কর, আমি আজ অবধি তোমায়

ছাড়িয়া যাইতেছি!' পাঠক জানেন যে নবমল্লিকাটীকে শকুন্তলা বড়ই ভাল বাসিতেন। জলসেচনকালে নবমল্লিকাটীকে দেখিয়াই তিনি কল্পনাপূর্ণ স্নেহোচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বলিয়াছিলেন—

হলা রমণীত্তো কৃথু কালো ইমস্স পাদবমিহুণস্স রদিঅরো সম্বুত্তো জেণ এব কুসুমজোব্বণা ণোমালিআ অঅং পি বদ্ধফলদাএ উঅভোঅ কৃখমো সহআরো॥

তাই আজ শকুন্তলা তাহাকে শুধু সম্ভাষণ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। রমণীরত্ন রমণীরত্নের ন্যায় সখীদ্বয়কে বলিলেন—'সখি! আমি এই লতাটিকে তোমাদের দুজনের হাতে সঁপিয়া দিলাম!' সখীদ্বয় আকুলিতপ্রাণে বলিয়া ফেলিলেন—'আমাদিগকে কাহার হাতে সঁপিলে?' আমরাও যদি তখন সেখানে থাকিতাম তাহা হইলে প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়ার ন্যায় বিগলিতহৃদয়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাঁহাকে বলিয়া ফেলিতাম—'আমাদিগকে কাহার হাতে সঁপিলে?' তার পর সকলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শকুন্তলার প্রাণ আরো ব্যাকুলিত হইতে লাগিল। তাঁহার গর্ভমন্থরা মৃগীটীকে দেখিতে পাইলেন। পাইয়া স্নেহপূর্ণা বিগলিতপ্রাণা জননীর ন্যায় বলিলেন—'এই উটজচারিণী গর্ভমন্থরা মৃগী যখন ভালয় ভালয় প্রসব হইবে, তখন তোমরা আমার নিকট লোক পাঠাইও, সে গিয়া আমাকে এই প্রিয়সংবাদ দিবে।' আহা! ক্ষুদ্রবালিকার হৃদয় কতই ভালবাসিতে পারে, কত ভাবনাই ভাবিতে পারে! সে হৃদয় আজ কত যাতনাই সহ্য করিতেছে! পরক্ষণেই আবার কি যেন তাঁহার পশ্চাদ্ভাগ হইতে গতিরোধ করিতে লাগিল। মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন যে, যে মৃগটীর মুখ কুশাগ্রদ্বারা বিদ্ধ হইলে তিনি সযত্নে ক্ষতশোষক ইঙ্গুদীতৈলসেক করিতেন এবং যাহাকে শ্যামাকধান্যমুষ্টি দিয়া পোষণ করিয়াছেন সেই পুত্রাধিকপ্রিয় মৃগটী মুখাগ্র দ্বারা তাঁহার অঞ্চল ধরিয়া টানিতেছে! স্নেহময়ী কাঁদিয়া ফেলিলেন। বনপশু যাহার স্নেহে মুগ্ধ, যাহার বিরহে আকুলিতপ্রাণ, তাহার ক্রন্দন দেখিলে সমস্ত বিশ্বহৃদয় কাঁদিয়া উঠে—ফাটিয়া যায়—গলিয়া বেগবতী স্রোতস্বিনীর ন্যায় প্রবাহিত হইতে থাকে! কাঁদিয়া কাঁদিয়া যাইয়াও যাওয়া হইতেছে না দেখিয়া শার্ঙ্গরব বলিলেন—'ভগবন্, শুনা যায় যে নদী বা সরোবর পর্য্যন্ত স্নিগ্ধব্যক্তিকে অনুগমন করা কর্ত্তব্য। এই অদূরে সরোবরতীর, যা বলিবার থাকে এখানে বলিয়া ফিরুন।' তখন সকলে বটবৃক্ষছায়ায় উপবেশন করিলেন। উপবেশন করিলে পর মহর্ষি কণ্ব দুষ্মন্তকে যাহা বলিবার তাহা শার্ঙ্গরবকে বলিয়া দিলেন, শকুন্তলাকে যাহা বলিবার তাহা শকুন্তলাকে বলিলেন। বলিয়া শকুন্তলাকে বলিলেন—'বৎসে! তুমি আমাকে এবং সখীদিগকে আলিঙ্গন কর।' শকুন্তলা

জানিতেন যে কণ্ব তাঁহার সমভিব্যাহারী হইবেন না। কিন্তু প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়াকে ফেলিয়া যাইতে হইবে, তাহা তিনি মনেও ভাবেন নাই। এখন সহসা বুঝিলেন যে তাও তাঁহাকে করিতে হইবে। বুঝিয়া কাতরতম অপেক্ষা কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—পিতঃ প্রিয়ম্বদা প্রভৃতি সখীরা কি এস্থান হইতে ফিরিয়া যাইবেন? উত্তর প্রতিকূল হইল। কিন্তু সুশীলতমা শকুন্তলা বর্দ্ধিতযন্ত্রণা চাপিয়া রাখিয়া দ্বিরুক্তি না করিয়া বিহ্বলহৃদয়ে পিতাকে আলিঙ্গন করিলেন। করিয়া সখীদ্বয়ের কাছে গিয়া বলিলেন, সখি! তোমরা দুজনে একবারেই আমায় আলিঙ্গন কর! তিনহৃদয়ে একহৃদয়, একটির পর আর একটি ভাল লাগিবে কেন? তিনটি সন্তপ্তহৃদয় এক হইয়া গেল! তাই দেখিয়া সমস্ত বিশ্বহৃদয় সেই আশ্চর্য্য হৃদয়কুণ্ডে গলিয়া পড়িল! সমস্ত বিশ্বমণ্ডল হৃদয়ময় হইয়া সংক্ষুব্ধ মহাসাগরের ন্যায় উদ্বেলিত হইতে লাগিল! হৃদয়ময়ি শকুন্তলে, যেখানে তুমি সেখানে হৃদয় ভিন্ন আর কিছুই থাকিতে পারে না। তোমার কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হৃদয়পুঞ্জ! যাওয়া ত আর হয় না। শার্ঙ্গরব বলিয়া দিলেন যে প্রখররবি মধ্যগগনে উঠিয়াছেন। তখন যেন চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া, একান্তই যাইতে হইবে বুঝিয়া, আশ্রমের দিকে একবার শেষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, সমস্ত পূর্ব্বস্মৃতিপরিমিত যন্ত্রণাকাতরস্বরে শকুন্তলা জিজ্ঞাসা করিলেন—'পিতঃ কবে আবার তপোবন দেখিব!' কাতরহৃদয়ের শেষ নিশ্বাস—সংসারত্যাগীর শেষ মায়ার ক্রন্দন—জলমগ্নপ্রায় দুর্ভাগার শেষ চীৎকার—সংসারে ইহার অপেক্ষা যন্ত্রণা আর নাই। এ যন্ত্রণা দেখিলে বুক ফাটিয়া যায়, জীবাত্মা শিহরিয়া উঠে! কথাটি কণ্বের হৃদয়ে বাজিল। তিনি অনেক কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। তখন গৌতমী ব্যাঘাত বুঝিয়া বলিলেন—'বাছা! গমনকাল অতীত হইতেছে, পিতাকে ফিরাইয়া দেও। অথবা শকুন্তলা অনেকক্ষণ ধরিয়া পুনঃপুনঃ এইরূপ বলিবে, তুমিই ফিরিয়া যাও।' জ্ঞানময় তাপসপ্রধান হতজ্ঞান হইয়াছিলেন। সহসা যেন জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া শকুন্তলাকে কহিলেন—'বৎসে! তপোনুষ্ঠানের ব্যাঘাত হইতেছে।' ধর্ম্মানুরাগিণী তাপসবালা পিতার তপোনুষ্ঠানের ব্যাঘাত হইতেছে শুনিয়া আপনার সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার কোমলহৃদয় বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল। তিনি পিতাকে পুনরায় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন—'তোমার শরীর তপশ্চর্য্যায় পীড়িত; অতএব আমার জন্য আর অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত হইও না।' তাপসপ্রধান দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উত্তর করিলেন—'বৎসে! তুমি পর্ণশালার দ্বারদেশে যে খুঁড়িধানের পুষ্পোপহার দিয়াছিলে তাহা হইতে এখন অঙ্কুর বাহির হইয়াছে।

আমি যখন তা দেখ্‌ব, তখন কিরূপে আমার শোকসম্বরণ হইবে!" বিগলিত-হৃদয়া ক্ষুদ্রবালিকা এখন দৃঢ়মনা হইয়া সান্ত্বনাবাক্যপ্রয়োগ করিতেছেন; দৃঢ়-মনা পুরুষবর এখন বিগলিতহৃদয়া ক্ষুদ্র বালিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। ধন্য রমণীহৃদয়! যে হৃদয়ের কাছে জগতের ইন্দ্রতুল্য পুরুষও অবনত; জগতের তাপসকুলাচার্য্যও বিজিত! যে হৃদয় অতিমাত্র কোমল হইয়াও অতিমাত্র দৃঢ়! এ রহস্য কে বুঝাইবে! তার পর সহযাত্রিগণের সহিত শকুন্তলা নিক্রান্ত হইলেন। কাশ্যপাশ্রম প্রাণহীন হইল! হিমালয়প্রদেশের বন-জ্যোৎস্না ডুবিল! যে কৌশলে মহাকবি এই চমৎকার বিদায়-দৃশ্যের করুণরসোদ্দীপকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা মহাকবি সেক্সপীয়রপ্রদর্শিত এণ্টনীর বক্তৃতা-রচনা-কৌশল অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়।

শকুন্তলা স্নেহময়ী। কিন্তু সে স্নেহের একটি প্রণালী আছে। পুরুষের স্নেহ সে প্রণালীর অনুগামী নয়। কণ্ব আশ্রমের তরুলতা মৃগ প্রভৃতি সকলকেই ভালবাসেন। আমরা অনসূয়ার মুখে শুনিয়াছি যে তিনিই শকুন্তলাকে জলসেচনকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। দুষ্মন্ত তাঁহার সমস্ত সাম্রাজ্যের প্রজাদিগকে ভালবাসেন। দুষ্মনিকের উত্তরাধিকারিহীন নিরুপায়াবস্থাপন্নকে তিনি এই আজ্ঞা প্রচার করিলেন—

যেন যেন বিযুজ্যন্তে প্রজাঃ স্নিগ্ধেন
বন্ধুনা।
স স পাপাদৃতে তাসাং দুষ্মন্ত ইতি
ঘুষ্যতাম॥

কে কোথায় কবে বন্ধুহীন হইবে, তাহার ঠিকানা নাই। কিন্তু যেই যখন বন্ধুহীন হইবে, দুষ্মন্ত তাহার বন্ধুস্থানীয় হইবেন। এ স্নেহের পাত্রবিশেষ নাই। এ স্নেহ-প্রকাশের জন্য পাত্রবিশেষ দেখিবার প্রয়োজন নাই, পাত্রবিশেষ নিকটে রাখিবার প্রয়োজন নাই। এ স্নেহ শ্রেণীগত, পাত্রবিশেষনিহিত নয়। কষ্ট না দেখিতে পাইলেও এ স্নেহের বিকাশ আছে। আর এ স্নেহ পরের দ্বারা কার্য্য করিয়াই পরিতুষ্ট হয়। কিন্তু স্ত্রীজাতি-প্রতিম শকুন্তলার স্নেহ এ জাতীয় নয়। সে স্নেহের পাত্র কল্পনায় থাকে না, নয়নপথের বহির্ভূত থাকে না। সে স্নেহের পাত্র কে? সে স্নেহের পাত্র শকুন্তলা যে আশ্রমে বাস করেন সেই আশ্রমের তরুলতা, সেই আশ্রমের মৃগ-পক্ষী, সেই আশ্রমের স্ত্রীপুরুষ। সে স্নেহের অবয়ব কিরূপ? বলিতে গেলে সে স্নেহ সাকার। শকুন্তলার কাছে আশ্রমের তরুলতাগুলি ভাই ভগিনী, মৃগ মৃগীগুলি পুত্রকন্যা, পুষ্পগুলি চন্দ্র সূর্য্য। তিনি কোন লতাটিকে বন-জ্যোৎস্না বলিয়া ডাকেন, কোন লতা-টিকে না জানি আর কি বলিয়া ডাকেন। পুরুষের স্নেহ এ পদ্ধতির নয়। বলিতে গেলে সে স্নেহ নিরাকার। আর শকু

ন্তলা যাহাকে স্নেহ করেন, তাহাকে কি রকমে স্নেহ করেন? তাঁহার নিজের মুখে শুনিয়াছি যে তাঁহাদের আশ্রমের একটি মৃগী একটি বৎস প্রসব করিয়াই মরিয়া যায়। তিনি সেই মৃগশাবকটীর জননীস্বরূপ হইয়া তাহাকে ক্ষুধাতে ধান্য খাওয়াইয়া, তৃষ্ণায় জলপান করাইয়া, রোগে শুশ্রূষা করিয়া বড় করিয়াছিলেন। তিনি যখন জলসেচন করিতে যান, তখন তাঁহার বোধ হয় যে আতপতাপিতা তরুলতাগুলি তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। মহর্ষি কণ্ব বলেন—

পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মা-
স্বসিক্তেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন
যা পল্লবম্।
আদ্যে বঃ কুসুমপ্রসূতিসময়ে যস্যা
ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্বৈরনু-
জ্ঞায়তাম্॥

এখানে স্ত্রীজাতির আর একরকম কষ্টসহিষ্ণুতা দেখা যাইতেছে। পুরুষের শারীরিক ক্লেশ দেখিতে পাওয়া যায়; রমণীর শারীরিক ক্লেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। দূরপথগমন, রৌদ্রে ভ্রমণ, অবিশ্রান্ত হস্তপদসঞ্চালন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ কার্য্যে পুরুষের শারীরিক কষ্টসহিষ্ণুতার প্রকাশ। ক্ষুধায় উপবাস, তৃষ্ণায় পিপাসাক্লেশভোগ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অপ্রত্যক্ষ অবস্থায় রমণীর কষ্টসহিষ্ণুতা। দুইপ্রকার কষ্টসহিষ্ণুতার মধ্যে রমণীর কষ্টসহিষ্ণুতাই গুরুতর। উদরমরূপে পানাহার করিয়া কষ্টসাধ্য কার্য্য করা অপেক্ষা পানাহার না করিয়া কষ্টসাধ্য কার্য্য করা অধিক ক্লেশকর। কিন্তু পুরুষাপেক্ষা কষ্টসহিষ্ণু হইয়াও রমণীর কষ্ট অপ্রকাশ। যে কষ্টে জগৎ রক্ষিত হয়, সে কষ্ট জগৎ দেখিতে পায় না। রমণীর প্রকৃত বীরত্ব, রমণীর প্রকৃত মহত্ত্ব নিভৃতে নিস্তব্ধভাবে জগতের মহৎ কার্য্যসাধনে নিয়ত নিযুক্ত। কিন্তু খুঁজিয়া পাতিয়া না দেখিলে জগৎ সে বীরত্ব এবং সে মহত্ত্ব দেখিতে পায় না। সে মহত্ত্ব যেন অনন্তকাল খুঁজিয়া পাতিয়াই লইতে হয়। রমণীরত্ন যেন অনন্তকাল নিভৃতই থাকে! সে রত্ন জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে আসিলে নিস্তেজ, নিষ্প্রভ, নিষ্ফল, 'ফেলো' হইয়া পড়িবে। জন্ষ্টুয়ার্ট মিলের মত অবলম্বন করিয়া কেহ যেন পৃথিবীকে মায়াশূন্য, হৃদয়শূন্য, ধাত্রীশূন্য, জননীশূন্য না করেন।

একবার একটি মৃগশাবক তাহার জননীকে দেখিতে না পাইয়া কাতরভাবে এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতেছিল। দেখিয়া প্রিয়ম্বদা অনসূয়াকে বলিলেন,

অণসূএ জহ এসো ইদো দিণ্ণদিট্ঠী উস্সুও মিঅপোদও মাদরং অণ্ণেসদি এহি সংজোএম ণং।

এই বলিয়া সেই মৃগশাবকটীকে তাহার মার কাছে দিতে গেলেন। শকুন্তলাও এইরূপ করেন।

এখন বুঝা যাইতেছে যে, রমণীর

অন্তর্লীনতাও যেমন প্রগাঢ়, বাহ্যবিলীনতাও তেমনি প্রগাঢ়। রমণী যেমন বাহ্যজগৎ ভুলিয়া আপনাতে মিশিতে পারেন, তেমনি আপনাকে ভুলিয়া বাহ্যজগতেও মিশিতে পারেন। স্নেহময়ী রমণী স্নেহের বস্তু পাইলে স্বয়ং তাহার শুশ্রূষা করেন, স্বয়ং তাহাকে লালন পালন করেন, স্বয়ং তাহাতে মিশিয়া যান। পুরুষের স্নেহ বস্তুবিশেষন্যস্ত নয়; পুরুষ রমণীর ন্যায় স্নেহের বস্তুকে 'কোলে পিঠে' করিয়া রাখেন না; স্নেহের বস্তুর জন্য নিজের ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া যান না, রাত্রিকে দিবা করেন না, দিবাকে রাত্রি করেন না; স্নেহের বস্তুতে লীন হন না। পুরুষের স্নেহ মনে মনে থাকে; রমণীর স্নেহ বস্তুতে থাকে। পুরুষের স্নেহ abstract নিহিত; রমণীর স্নেহ concrete নিহিত। পুরুষের স্নেহ অন্তর্জ্জগৎনিবদ্ধ; রমণীর স্নেহ বাহ্যজগৎলিপ্ত। এই নিমিত্তই রমণীকে জগদ্ধাত্রী বলে। এই নিমিত্তই রমণী শিশুর ধাত্রী, রোগীর চিকিৎসক, আতুরের বন্ধু, জগতের পালয়িত্রী। এই নিমিত্তই ফ্লরেন্স নাইটিঙ্গেল (Florence Nightingale;) এই নিমিত্তই কৃপাময়ী-ভগিনীসম্প্রদায় (sisters of mercy)। পূর্ব্বেও দেখিয়াছি এখনও দেখিতেছি, রমণীহৃদয় সাকারপ্রিয়, জড়ানুরক্ত। সেইজন্য রমণীমণ্ডলে পৌত্তলিকধর্ম্ম সর্ব্বত্র প্রবল। সেইজন্য ১৭৯৩ সালের ফরাসিবিপ্লবে ফরাসীদার্শনিকেরা যাদান রোলেনের শিষ্য হইয়া বিপ্লবের পদ্ধতি শিক্ষা করিয়াছিলেন। হৃদয়ের অতি উৎকৃষ্টভাব সকল স্ত্রীজাতির মনে শুধু ভাবরূপে থাকে না; বস্তুবিশেষের সহিত সংযুক্ত হইয়া অবস্থান করে। রমণীর আধ্যাত্মিকতা জড়জগৎজড়িত এবং জড়জগৎসাপেক্ষ। এই নিমিত্ত রমণীর স্নেহ সর্ব্বদাই কার্য্যে পরিণত হয়। জগতে 'সেন্টিমেণ্টাল' রমণী নাই বলিলেই হয়।

কালিদাসের শকুন্তলা সেক্সপীয়রের পোর্শিয়া, রোজালিন্দ কি ইজাবেলার ন্যায় প্রখরবুদ্ধি নন। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয় তিনি সামান্য হিসাবে বুদ্ধিমতী। তিনি পোর্শিয়ার ন্যায় নৈয়ায়িক নন, ইজাবেলার ন্যায় নীতিশাস্ত্রবেত্তাও নন। আমাদের বোধ হয় যে তাঁহার বয়সে এবং তাঁহার অবস্থাতে সে রকম হইলে ভালও হইত না। আমাদের আরও বোধ হয় যে কালিদাস শকুন্তলাকে সাধারণ স্ত্রীজাতির আদর্শরূপে চিত্রিত করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে হৃদয়প্রধান করিয়াছেন। স্ত্রীজাতির মধ্যে দুই চারিটী জ্ঞানপ্রধান থাকে বটে। কিন্তু সে দুই চারিটী স্ত্রীপ্রকৃতির নিয়মবহির্ভূত। জ্ঞানপ্রধান হইতে হইলে রমণীকে প্রায়ই রমণীপদ এবং রমণীধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে হয়। মিস্ মার্টিনো তাঁহার স্বরচিত জীবনীতে বলিয়াছেন যে, রমণী যদি পণ্ডিতা হইতে চান তবে তিনি যেন সংসারাশ্রম প্রবেশ না করেন।

আর যেখানে রমণী সংসারাশ্রম প্রবেশ না করিয়া পণ্ডিতা হইবার উদ্দেশে যাবজ্জীবন শাস্ত্রচর্চ্চা করেন, সেখানেও রমণীকে বড় একটা পূর্ণমনোরথ দেখা যায় না*।

কিন্তু শকুন্তলার স্ত্রীত্বোপযোগী বুদ্ধি যাহা আছে তাহা ঠিক পুরুষের বুদ্ধির মতন নয়। পুরুষের বুদ্ধি বিচারশক্তিমূলক। শকুন্তলার বুদ্ধি সে রকমের নয়। আশ্রমের নিভৃত প্রদেশে দুষ্মন্ত যখন তাঁহার হস্ত ধরিবার উপক্রম করেন তখন তিনি বারম্বার তাঁহাকে এই বলিয়া নিষেধ করেন যে, স্বজন এবং গুরুজনের সম্মতি ব্যতীত আমি আত্মসমর্পণে অক্ষম। জ্ঞানপ্রধান দুষ্মন্ত যুক্তিদ্বারা তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা পাইলেন যে, গুরুজনকে না জানাইয়াও তিনি আত্মসমর্পণ করিতে পারেন। ক্ষুদ্রবুদ্ধি শকুন্তলা সে যুক্তি খণ্ডন করিতে পারিলেন না, খণ্ডন করিবার চেষ্টাও করিলেন না, তথাপি গুরুজনের নাম করিয়া নিষেধ করিতে লাগিলেন। যিনি অভিজ্ঞানশকুন্তল পড়িয়াছেন তিনি জানেন যে জ্ঞানপ্রধান দুষ্মন্ত ঠিক মীমাংসা করেন নাই; ক্ষুদ্রবুদ্ধি শকুন্তলা ঠিক মীমাংসা করিয়াছিলেন। এ রহস্যের অর্থ কি? ইহার অর্থ এই,—দুষ্মন্ত বিচারশক্তি সহকারে ঐতিহাসিক প্রথা ধরিয়া মীমাংসা করিয়াছিলেন; শকুন্তলা উন্নতমনা ধর্ম্মানুরাগিণী রমণীবক্ষের নৈসর্গিক সৎপ্রবৃত্তির বলে মীমাংসা করিয়াছিলেন। দুষ্মন্তের মীমাংসা বিচারশক্তিমূলক; শকুন্তলার মীমাংসা উন্নতহৃদয়ের অভিব্যক্তি মাত্র। অনেক প্রধান প্রধান ইয়ুরোপীয় দার্শনিক এমন বলিয়া থাকেন যে, পুরুষের জ্ঞান বিচারমূলক; রমণীর জ্ঞান রমণীহৃদয়ের অভিব্যক্তি মাত্র। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের 'লিবর্টি' নামক প্রবন্ধের ভূমিকায় এই কথা একরকম স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে। কালিদাসের শকুন্তলা এই কথার একটি প্রমাণ।

শকুন্তলাচরিত্রের সমালোচনায় আমরা যাহা যাহা পাইলাম তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই :—

১। পুরুষের শরীর বলিষ্ঠ; রমণীর শরীর কোমল—রমণীর শরীর নাই বলিলেই হয়।

২। পুরুষ শারীরিক বলে কষ্টসহিষ্ণু; রমণী হৃদয়ের বলে কষ্টসহিষ্ণু। কষ্টসহিষ্ণুতায় রমণী পুরুষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

৩। কর্ম্মশীলতা পুরুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, রমণীর হৃদয়ের অবস্থাসাপেক্ষ ধর্ম্ম।

৪। পুরুষ জ্ঞানে এবং শারীরিক বলে রমণীর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, রমণী হৃদয়ের বলে পুরুষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পুরুষচরিত্র বিস্তারগুণবিশিষ্ট; রমণীচরিত্র গভীরতা-

* আফিংসেবক শ্রীশ্রীযুক্ত কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় আফিঙ্গের নেশায় স্ত্রীজাতির বুদ্ধিকে নারিকেলের মালার সহিত তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে তিনি সে মালা কখন আধখানার বেশী দেখেন নাই।

গুণবিশিষ্ট। পুরুষের অন্তর্লীনতা এবং বাহ্যবিলীনতা কম; রমণীর অন্তর্লীনতা এবং বাহ্যবিলীনতা অপরিমেয়।

৫। রমণীর আধ্যাত্মিকতা পুরুষের আধ্যাত্মিকতা অপেক্ষা অনেক অধিক। কিন্তু পুরুষের আধ্যাত্মিকতা অনেকটা স্বাধীন; রমণীর আধ্যাত্মিকতা সম্পূর্ণরূপে জড়জগৎসাপেক্ষ।

৬। পুরুষের বুদ্ধি বিচারশক্তির ফল; রমণীর বুদ্ধি হৃদয়ের অভিব্যক্তি মাত্র।

৭। রমণী বৈপরীত্যের আধার—কোমল হইয়াও কঠিন, দুর্ব্বল হইয়াও বলিষ্ঠ, শ্রমকাতর হইয়াও কষ্টসহিষ্ণু, নরম হইয়াও দৃঢ়, বুদ্ধিমতী হইয়াও বিচারশক্তিহীন, আধ্যাত্মিক হইয়াও জড়জগৎসাপেক্ষ। জগতে রমণীর ন্যায় রহস্য আর নাই।

স্ত্রীপ্রকৃতির এত উজ্জ্বল, প্রশস্ত এবং প্রগাঢ় চিত্র কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল ভিন্ন আর কোন নাটকে নাই। একটি সামান্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া এত বড় ছবিও অন্য কোন কবি তুলিতে পারেন নাই। জগতের নাটককারদিগের মধ্যে কালিদাস অদ্বিতীয় শিল্পী। শিল্পপ্রতিভায় সেক্সপীয়রও তাঁহার সমকক্ষ নন।

কালেজীশিক্ষা।

আমরা কালেজে যে শিক্ষা পাই সে শিক্ষা কোন কাজেরই নহে। উহা না একমুখীশিক্ষা না সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা। উহা যে একমুখীশিক্ষা নহে তাহা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ উহাতে আমাদের কোন বিষয়েই সম্পূর্ন শিক্ষা দেয় না। উহা সর্ব্বতোমুখী শিক্ষাও নহে। কারণ উহাতে শারীরিক শিক্ষার নামও নাই, যাহাতে হৃদয়বৃত্তির উন্নতি হয় উহাতে তাহার কিছুই নাই, যাহাতে ইচ্ছাশক্তি বা কর্ম্মক্ষমতা বৃদ্ধি হয় তাহাও উহাতে নাই। উহাতে আছে শুদ্ধ কয়েকটি বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা তাহাও উচ্চতর বৃত্তিপুঞ্জের নহে। প্রধানতঃ কেবল স্মরণশক্তির উন্নতির দিকেই অধিক দৃষ্টি।

সত্য বটে এক্ষণে সর্ব্বত্র ড্রিলশিক্ষা হইয়াছে কিন্তু তাহার উন্নতি নাই। কর্ত্তৃপক্ষের তাহাতে দৃষ্টি নাই। সত্য বটে স্কুলে কাব্যপাঠ হয় কিন্তু তাহা হৃদয়বৃত্তিসমূহের পরিচালনার জন্য নহে শুদ্ধ ভাষাশিক্ষার জন্য। আর বই পড়িয়া যে হৃদয়বৃত্তির পরিচালনা সেও বিড়ম্বনা মাত্র। ইচ্ছা বা কর্ম্মক্ষমতার মধ্যে আমাদের থাকে পাশকরা সুতরাং তাহা ভিন্ন অন্যবিষয়ে আমাদের কর্ম্মক্ষমতা বড় একটা নাই।

যাহা একটু আমরা কালেজে শিখি

তাহাও শিখিবার উপায়ও ভাল নহে। আমরা সব শিখি বই পড়িয়া। বিধাতা যেন আমাদের চক্ষুনামক একমাত্র জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রদান করিয়াছেন অপর-ইন্দ্রিয় যেন কোন কাজেই আসে না। যে সকল জিনিস ঘরের দ্বারে আছে তা-হাও আমরা কেতাব পড়িয়া শিখিতে যাই। দেখিয়া ও শুনিয়া আমরা কিছুই শিখি না। যে জিনিস একবার দেখিলে তৎক্ষণাৎ শিখিব এবং জন্মে ভুলিতে পারিব না, সেই জিনিস আমাদের কেতাবে পড়িয়া তিনমাসে বুঝিতে হইবে ও মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা পর্য্যন্ত মনে রাখিতে হইবে। শিখিতে আমোদ হয় এমন করিয়া কোন শাস্ত্র বা কোন বিষয়ই শিখান হয় না। তাহার উপর যদি আবার মাষ্টারে যত্ন করিয়া বুঝাইয়া দেন তাহা হইলেও হয়। তাহা না হইয়া মাষ্টারগণ (একে ত ডাওনিসি-য়সের বংশ) তাহাতে আবার ইংরেজী পড়িয়া রুক্ষমেজাজ হইয়াছে। সাহেব প্রোফেসরদিগের ত কথাই নাই। অনেকে বলেন তুমি বুঝ আর নাই বুঝ আমার নাম বাহির হইয়া গিয়াছে, আ-মার মাসিক বেতন বাড়িবে বই কমিবে না।

যদি নিজভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা হইলে অনেকটা সহজে হয়। তাহা না হইয়া এক অতি কঠিন অতি দূরবর্ত্তী জাতির ভাষায় আমরা শিক্ষা পাই। শুদ্ধ সেই ভাষাটি মোটামুটী শিখিতে রোজ চারি ঘণ্টা করিয়া অন্ততঃ আটদশ বৎসর লাগে। ভাষা শিক্ষাটা অথচ কিছুই নহে, ভাষাশিক্ষা কেবল অন্য ভাল জিনিস শিখিবার উপায়—উহাতে শিখিবার পথ পরিষ্কার হয় মাত্র—সেই পথ পরিষ্কার হইতে এত সময়ব্যয় ও এত পরিশ্রম। তবুও কি সে ভাষা বুঝা যায়? তাহার যো কি! বাঙ্গালা হইলে এই কেতাবী জিনিসই আমরা কত অধিক পরিমাণে শিখিতাম। ইংরেজীতে আ-মরা কখন কথা কহি না। এখন আমরা ইংরেজীতে চিঠিপত্রও বড় লিখি না অথচ আমাদের জ্ঞান-উপার্জ্জনের এক মাত্র দ্বার ইংরেজী। ইংরেজী আমাদের রাজভাষা। যাঁহারা ইংরেজের সংসর্গে আসিবেন তাঁহাদের ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন। তাই বলিয়া ছয় কোটী ছবট্টি লক্ষ লোক ইংরেজী পড়িয়া মরিবে কেন? বলিবে, ইংরেজ যখন রাজা, সক-লেই কোন না কোন সময়ে ইংরেজের সংসর্গে আসিবেন। স্বীকার। ইংরেজী ভাষা শিক্ষা কর ভাল করিয়াই শিক্ষা কর। ইংরেজীতে অঙ্ক কসিতে হইবে, ইতিহাস পড়িতে হইবে, বিজ্ঞান শিখিতে হইবে ইহার অর্থ কি? বাঙ্গালা দিয়া ইংরেজী শিখ না কেন? ইংরেজী দিয়া শাস্ত্র শিখিতে যাও কেন? আরও অধিক দুঃখের কথা এই যে আমাদের সংস্কৃত শিখিতে হইলেও ইংরেজিমুখে শিখিতে হয়।

যেরূপ চলিতেছে ইহাতে জ্ঞান অল্প হয়

ইংরেজি শিক্ষা অল্প হয় আর পরিশ্রম অনন্ত করিতে হয়। আর শিক্ষিতদিগের সহিত অশিক্ষিতের মনোমিল থাকে না; শিক্ষিতগণ যেন একটি নূতন জাতি হইয়া দাঁড়ান। অত্যন্ত অধিকপরিমাণে শ্রম করিয়া অতি অল্প জ্ঞানলাভ হয়।

যাও বা শিখি তাহাও শিখিবার জন্য শিখি না; জ্ঞানঅর্জ্জনের জন্য শিখি না। শিখি একজামিন পাশ করিবার জন্য। আচ্ছা করিয়া পড়ি; যেমন প্রশ্ন দিক, ঠকাইতে পারিবে না এ জন্য পড়ি না, কেমন প্রশ্ন দিবে বাছিয়া বাছিয়া তাহাই পড়ি, অনেক সময়ে মাষ্টার মহাশয়েরাও তাহাই পড়ান। ইহার এক ফল এই যে যখন একজামিন নাই তখন পড়ি না, একজামিনের সময় রাত দিন পড়ি। লাভ এই হয় কতকগুলা গুরুপাক জিনিস উদরস্থ হয়, সব হজম হয় না। রাতজেগে যাহা পাঠ করা গেল, তাহা মাসখানেকের মধ্যে ভুলিয়া যাই।

অতএব লেখা পড়ার যে উদ্দেশ্য —মনোবৃত্তিনিচয়ের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি—তাহা একেবারেই হয় না। যে চিন্তাশক্তিবলে শিক্ষিতদিগের দ্বারা সমাজের উপকার হইবে তাহা হয় না। চিন্তা করিবার শক্তি নাই অথচ জ্ঞান আমি বড় বুঝি, ইহার অনেক দোষ, কালেজী শিক্ষায় সে দোষগুলি সমুদয়ই ঘটে। যদিও চিন্তাশক্তি দুইচারিজনের জন্মে তাহাও শূন্যের উপরে। যদি এরূপ হইত, তবে এইরূপ ফল হইত। কিন্তু চিন্তা abstractএর উপর। যাহা আছে তাহার উপর নহে। যাহাই হউক, তবুও চিন্তাস্রোতঃ প্রবাহিত হইলেই সেটি বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাহা ত হয় না।

অতএব কালেজী শিক্ষায় চিন্তাশক্তি উত্তেজিত হয় না, উহা শুদ্ধ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার জন্য, এজন্য উহাতে জ্ঞান-অর্জ্জন হয় না। জ্ঞান-অর্জ্জন একটু আধটু হইলেও ইংরেজীমুখে অর্জ্জন করিতে হয় বলিয়া সেই একটুকুতেই অনেক শ্রম লাগে, যাহা শিখি তাহাতে বুদ্ধিবৃত্তিও দুই পাঁচটার মাত্র চালনা হয়, হৃদয়বৃত্তি ও ইচ্ছাশক্তির কিছুই হয় না। কোন একটি বিষয়ও সম্পূর্ণরূপ শিক্ষা হয় না; অতএব উহাদ্বারা পরিণামে যে করিয়া খাইবে তাহাও হয় না। কালেজে না একমুখী শিক্ষা হয়, না সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা হয়।

কালেজের ছেলেরা প্রায় পিতামাতা স্বজন প্রভৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন ও সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাসায় অথবা হিন্দু-হষ্টেলে বাস করে, সুতরাং সমাজে থাকিলে ও বাড়ীতে থাকিলে যে সকল মনোবৃত্তি পুষ্ট হয় তাহার কিছুই হয় না, স্নেহ, মমতা, বিশেষ ভক্তি একেবারেই থাকে না। বাড়ী বা সমাজে যে সকল অভিজ্ঞতালাভ হয়, ইহাদের তাহার কিছুই হয় না। অন্য লোকে কিসে মনে ব্যথা পাইবে, তাহা একেবারেই জ্ঞান থাকে না; অর্থাৎ হৃদয়বৃত্তিসমূহের

কিছুমাত্র স্ফূর্ত্তি হয় না। শুদ্ধ যদি বাপ মা বা গুরুজনের চোকে, চোকে থাকিত, তাহা হইলেই এ সকল লাভগুলি অবশ্যই হইত। সংসারে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে অনেক কষ্টে এই সকলগুলি শিখিতে হয়। অনেকে হয় ত অনেক জিনিস একেবারেই শিখিতে পারে না। অশিক্ষিতের সহিত সমবেদনা প্রায়ই থাকে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

অতএব কালেজীশিক্ষা সম্পূর্ণ শিক্ষা নহে। প্রথম, কালেজে যাহা শিক্ষা হওয়া উচিত, তাহাই আমাদের কালেজে অল্প শিক্ষা হয়। সকল শাস্ত্রের কিছু কিছু পড়ান একেবারেই হয় না। কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম হয়। একজন কর্ত্তার খেয়াল হইল, জরীপবিদ্যা পড়ান আরম্ভ হইল, কিন্তু ভূগোলবিদ্যা উঠিয়া গেল। ভূগোল পড়িলে দেশীয় কুসংস্কার যত শীঘ্র অপনীত হয় এত আর কিছুতেই হয় না। সেই ভূগোল উঠিয়া গেল। আর একজন বলিলেন, ছয় বিষয়ে পরীক্ষা ছেলেরা পারিবে কেন? পাঁচ কর। আর একজন বলিলেন, পাঁচেও বেশী হয় তিন কর। সুতরাং সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা হয় না। শুদ্ধ কেতাব পড়িয়া শিখিতে হইলে চরটা বিষয় শিখা কঠিন হয় বটে, কিন্তু যদি এক এক বিষয়ে উৎকৃষ্ট অধ্যাপকের নিকট সেই সেই বিষয় শিক্ষা হয় ও কতক দেখিয়া শুনিয়া শিখিতে পারে তবে অনেক জিনিস অল্পে শিক্ষা হইতে পারে।

কালেজী শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে হইলে, উহার সঙ্গে সঙ্গে গার্হস্থ্য শিক্ষা চাই, সামাজিক শিক্ষা চাই। প্রাকৃতিক শিক্ষা চাই, হাতে হাতীয়ারে অনেক কাজ করা চাই। ঠেকিয়া শিখা চাই, প্রোফেশন শিক্ষা চাই।

আমাদের দেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে আমাদের দেশীয় ভদ্র সন্তানগণ যে শিক্ষা পাইত, সে শিক্ষা সম্পূর্ণ শিক্ষা। কালেজী শিক্ষার সহিত তুলনা করিলে কেতাবী জিনিস তাহারা কিছুই শিখিত না। তাহারা না ভূগোল শিখিত, না ইতিহাস জানিত, না বিজ্ঞান জানিত, না গণিত জানিত। কেতাবী বিষয়ে তাহাদের শিক্ষা অল্প থাকিলেও তাহারা অন্যান্য সকল বিষয়ে অল্প পরিশ্রমে আমাদের অপেক্ষা অনেক অধিক শিখিত। কেমন করিয়া নম্র বিনীত হইতে হয়, গুরুজনের প্রতি ভক্তি করিতে হয়, কেমন করিয়া অল্প সময়, শ্রম ও অর্থব্যয়ে সুন্দররূপে সংসার চালাইতে হয়, গৃহস্থালী করিতে হয়, তাহা সুন্দররূপে শিখিত। পিতার সহিত সে সর্ব্বত্র ফিরিত, সকল জিনিস দেখিত, সকল সমাজে যাইত, সে যেন জন্মিয়া অবধি মানুষ হইবার জন্য এপ্রেণ্টিস্ বা শিক্ষানবীশ থাকিত। এখনকার মত সংসার হইতে, সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অরণ্যবাস করিতে হইত না। যদিও কেতাবী শিক্ষা অল্প হইত, সর্ব্বপ্রকার শিক্ষিত লোকের সংসর্গে আসিয়া

সে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় আপনা আপনি শিখিত। মোটামুটি সে অনেক বিষয় জানিত। সেকালে জ্ঞানের উন্নতি ছিল না। জ্ঞানসীমা এত বর্দ্ধিত হয় নাই, সুতরাং প্রাচীনকালে অর্থাৎ সমাজের প্রথম অবস্থায় যেমন মোটামুটি বিদ্যা ছিল তখনও ঠিক তেমনি ছিল; আর সেই মোটামুটি জিনিস অধিকাংশ ভদ্রসন্তান জানিত ও শিখিত। এখনকার ছেলে যদি লেখা পড়া করিতে গেল অমনি বাপ মা বলিয়া বসেন "রাম আমার সংসারের কোন কাজই করিবে না, এ কর্ম্ম আমার রামকে করিতে দিও না, রামের সময় নষ্ট হবে।" রাম শুদ্ধ লেখা পড়া করিয়াই সময় কাটাইলেন। যখন কালেজ হইতে বাহির হইলেন, একটী গ্রাজবানর বাহির হইলেন। যদি ভাল চাকরী পাইলেন, কি মোটা টাকা রোজকার করিলেন এক রকম চলিয়া গেল, নহিলে দাঁড়িয়ে সর্ব্বনাশ। সমাজে গেলেন যদি, যেখানে দশজন লোক আছে সেখানে গেলেন যদি, একপাশে বসিয়া রহিলেন। জানেন না কেমন করিয়া লোকের সঙ্গে মিশিতে হয়, মিশিতে পারিলেন না। লোকে জানিল রামটা লেখা পড়া শিখিলে কি হয়, বড় অহঙ্কারী নরলোকের সঙ্গে কথাই কহেন না। আমরা রামকে বেশ জানি, রামের অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই, শুদ্ধ শিক্ষার দোষে বেচারার নিন্দা হইল।

কালেজী শিক্ষার দোষপ্রদর্শন অনেক করা গেল। কালেজী শিক্ষার অনেক উৎকৃষ্ট গুণ আছে বলিয়াই আমরা উহার দোষপ্রদর্শনে এত যত্নবান্ হইয়াছি। আমাদের দেশীয় কালেজী শিক্ষার প্রধান গুণ এই যে উহাতে স্বাধীনচিন্তাশক্তি উদ্রেকের যেমন সুবিধা এমন আর কিছুতেই নাই। সামাজিক অত্যাচারে, সাংসারিক (পিতৃমাতৃকৃত) অত্যাচারে, শিক্ষকদিগের অত্যাচারে চিন্তাশক্তির শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে না; আমাদের কালেজে এ তিনের একটিও নাই। আমাদের কালেজের ছাত্রগণের কুসংস্কার যত অল্প এত আর বোধ হয় কোথাও নাই। কিন্তু কালেজী শিক্ষার গুণকীর্ত্তন আমাদের আবশ্যক নাই, উহার শত দোষসত্ত্বেও আমরা উহাকে ভালবাসি ও আমরা এরূপ সুন্দর শিক্ষা পাইয়াছি বলিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করি। এবং এইরূপ মনে করি বলিয়াই অদ্য উহার দোষকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যাহা হউক আমাদের সংস্কার এই যে আর দুই সময়ে দুই জাতির অতি উৎকৃষ্ট শিক্ষা হইয়াছিল, সেই দুইটির সম্যক্ বর্ণনা করিয়া তাঁহাদের দোষগুণ নির্ব্বাচন করিব। পাঠকগণ দেখিবেন কালেজী শিক্ষার কত উন্নতি হইলে উহা সম্পূর্ণ শিক্ষা বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে। কালেজীশিক্ষার যদি দোষসকল অন্তর্হিত হয় তবে উহাই পৃথিবীর সকল জাতীয়শিক্ষা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিক্ষা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবে।

আমরা যে দুইটি শিক্ষার কথা বলিতেছিলাম তাহার একটি ভারতবর্ষের আর একটি গ্রীসের। একটি ব্রাহ্মণদিগের আর একটি এথিনীয়দিগের। একটিতে ব্রাহ্মণ তৈয়ারি হইত আর একটিতে সিটিজেন তৈয়ারি হইত। একটির ফল সংস্কৃত সাহিত্য ও ভারতে ব্রাহ্মণজাতির চিরপ্রাধান্য আর একটির ফল গ্রীক্ আর্টস্, গ্রীকসাহিত্য, গ্রীকচিন্তার চিরপ্রভুত্ব। দুই জাতিই জগতের প্রথম ও প্রধান শিক্ষক, উভয়ের শিক্ষা হইতেই অমৃতময় ফল উৎপন্ন হইয়াছে।

ব্রাহ্মণগণ হয় ১৮ না হয় ২৭ না হয় ৩৬ বৎসর পর্য্যন্ত গুরুকুলে বাস করিতেন। তৎকালপ্রচলিত যাবতীয় শাস্ত্রই তাঁহারা অধ্যয়ন করিতেন। বেদ বেদান্ত দর্শন সাহিত্য, ব্যাকরণ চিকিৎসা তাঁহারা এ সমস্তই কেতাব হইতে শিখিতেন। গুরু তাঁহাদিগকে শিখাইতেন, গুরু ও শিষ্যে পিতাপুত্র সম্বন্ধ। এক জন ভাল বাসিয়া শিখাইবার জন্য যত্ন করিত আর একজন ভক্তি করিয়া শিখিবার জন্য যত্ন করিত। শিক্ষা উত্তম হইত। শিষ্য গৃহস্থালিতে গুরুর সহায়তা করিতেন সুতরাং পিতামাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে যে শিক্ষা হওয়া অসম্ভব সে শিক্ষা অতি সহজেই হইত। গুরু তাঁহাদিগকে লোকের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় কিরূপে সংসারের কার্য্য করিতে হয় তাহা দেখাইয়া দিতেন। স্নেহমমতা তাঁহারা গুরুকুলে অনেক শিখিতেন। গুরু তাঁহাদিগকে সমাজে যাইতে শিখাইতেন, গুরু যেখানে যাইতেন শিষ্য তাঁহার সঙ্গে থাকিতই থাকিত। শিষ্যকে অনেক শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইত। কিন্তু শিষ্যের গৃহস্থজীবনে যা কিছু আবশ্যক হইত গুরু সমস্ত শিখাইতেন, কেমন করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য করিতে হয়, যাগ যজ্ঞ করিতে হয়, বিচার করিতে হয়, মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তি করিতে হয়, ব্যবস্থা দিতে হয় এই ৩৬ বৎসর মধ্যে তাহারা সব শিখিত। তাহারা প্রাকৃটিকেল ও থিয়োরেটিকেল দুইরকমই শিখিত। বাহির হইয়া যখন এরূপ একটি শিক্ষিতব্রাহ্মণ সংসারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, তিনি সমাজের মূর্ত্তিমান্ শক্তিস্বরূপ হইলেন। বড় বড় রাজারা তাঁহার তোষামোদ করিতে লাগিলেন। যিনি তাঁহাকে আপন রাজ্যে স্থাপন করিতে পারিলেন তিনিই মনে করিলেন আমার রাজ্য ধন্য হইল। তাঁহাকে সকলে অগ্নির সহিত তুলনা করিত, কারণ অগ্নির যেমন তেজঃ তাঁহারও তেমনি। অগ্নি যেমন সর্ব্বভুক্ তিনিও তেমনি সর্ব্বব্যাপিনী বিদ্যার আধার, অনন্তশক্তির আধার। আমরা এখানহইতে বেশ দেখিতে পাইতেছি তাঁহার শিক্ষার অনেক দোষ ছিল। তাঁহার শিক্ষা অনেকটা প্রোফেসনাল, তিনি ব্রাহ্মণের যাহা দরকার তাহাই শিখিতেন। মানুষের যাহা দরকার

তাহা ত শিখিতেন না,ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনেক কুসংস্কার তাঁহার থাকিয়াই যাইত। ব্রাহ্মণের শিক্ষার মধ্যে পুরোহিতের শিক্ষা অনেক থাকিত। পুরোহিতশিক্ষায় কলাশিক্ষা একেবারে হইত না, সুরুচি (টেষ্ট) বলিয়া যে জিনিস তাহার তাঁহারা সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। ব্রাহ্মণ নৃত্য গীতাদি শিখিলে পতিত হইতেন। তাঁহার শিক্ষার এত দোষসত্ত্বেও তাঁহার ব্রাহ্মণের শিক্ষা সম্পূর্ণই হইত। আগে সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা তাহার পর একমুখী শিক্ষা না হইয়া,একমুখী শিক্ষার জন্য যতদুর প্রয়োজন, সর্ব্বতোমুখী শিক্ষা ততদুর পাইত।

গ্রীকেরা কেতাব পড়িয়া অতি অল্প শিখিত। কথাবার্ত্তা নাট্যশালা, সভাগৃহ প্রভৃতি হইতে তাহাদের শিক্ষা হইত। হৃদয়বৃত্তির পরিচালনা তাহাদের সম্পূর্ণরূপ হইত। তাহাদের মত উৎকৃষ্ট রুচি আর কোন জাতির কি আছে? তাহাদের নাটক, তাহাদের কাব্য, তাহাদের ভাস্করকার্য্য, তাহাদের রুচিশিক্ষার উৎকৃষ্ট পরিচয় দিতেছে। শারীরিক শিক্ষা তাহাদের মত আর কাহারও হইত না, তাহাদের মেলায় পারিতোষিক দেওয়া হইত সেই পারিতোষিক পাইত বলিয়া সকলেই ব্যায়াম করিত, শরীরের সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্টি গ্রীকদিগের যেমন হইত এমন কি আর কখন কোন জাতির হইয়াছে? তাহাদের মধ্যে শারীরিক দোষবিশিষ্ট অন্ধ, কুব্জ, খঞ্জ অতি অল্প ছিল। সৌন্দর্য্য তাহাদের প্রায় সকলেরই ছিল। বিশ্রীলোক কাণা খোঁড়া কুৎসিত তাহাদের দেশে হইতেই পারিত না। তাহারা সকলপ্রকার শিক্ষার জন্য প্রাইজ দিত; হেরোডোটস্ ইতিহাস লিখিয়া পড়িলেন, পারিতোষিক পাইলেন, যে, যে কোন কাজই করুক না, যদি তাহাতে সাধারণ লোকের সন্তোষ হইল অমনি প্রাইজ। এত উৎসাহে গ্রীকদিগের যে সর্ব্বাঙ্গীণসুন্দর শিক্ষা হইবে আশ্চর্য্য কি! বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা গ্রীসে যত হইয়াছিল, এত আর কোন জাতির হয় নাই; সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শনের যে শুদ্ধ সূত্রপাত হইয়াছিল এমন নহে, অনেক উন্নতিও গ্রীসে হইয়াছিল। কর্ম্মক্ষমতা গ্রীকদিগের মত আর কাহার ছিল? দুই পাঁচজন লোকের প্রতিজ্ঞায় যেখানে পারস্যরাজ্যের অক্ষৌহিণী সূর্য্যকরস্পৃষ্ট নীহারবৎ দ্রবীভূত হইয়া গেল, তাহাদের মত কার্য্যক্ষমতা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা কাহার? বাস্তবিক গ্রীকবিশেষ এথিনীয়দিগের মত সর্ব্বাঙ্গীণ শিক্ষা আর কোন জাতির কখন হয় নাই। কিন্তু এত উৎকৃষ্ট শিক্ষা তাহারা বিনাপরিশ্রমে লাভ করিত। শুদ্ধ বিনাপরিশ্রমেই বলি কেন তাহারা আমোদ করিয়া শিখিত। ইস্কাইলিস সফোক্লিস তাহাদের শিক্ষা দিত। তাহারা শুদ্ধ আমোদের জন্য থিয়েটারে আসিত অথচ কিছু না কিছু শিখিয়া যাইত। আবার নাগরিকদিগকে রাজ্যের সমস্ত কার্য্য করিতে হইত,তাহাতে তাহা-

দের প্রাক্টিকাল শিক্ষাও অনেক হইত। নাগরিকগণ বিচার করিতে শিখিত, যুদ্ধ করিতে শিখিত, মন্ত্রিসভায় পরামর্শ দিতে শিখিত অথচ কাজ করিতেছি বলিয়া কাহারও গায়ে লাগিত না।

ব্রাহ্মণদিগের শিক্ষা ধর্ম্মপ্রধান, গ্রীকদিগের সৌন্দর্য্যপ্রধান। সুতরাং গ্রীকদিগের শিক্ষা ক্রমে ছড়াইয়া সমস্ত নাগরিকগণমধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল; ব্রাহ্মণদিগের উচ্চতর শিক্ষা গুটাইয়া ক্রমে অল্পসংখ্যকমাত্র লোকে ন্যস্ত হইয়াছিল। গ্রীকেরা ইচ্ছা না থাকিলেও আপনি শিখিতে বাধ্য হইত, ব্রাহ্মণেরা অনেক যত্ন ও শ্রম করিয়া শিখিত।

আমাদের কালেজী শিক্ষা এ দুইয়ের কোনটীরই মত নহে। কিন্তু দোষ সংশোধন করিয়া লইলে ইহা হইতে গ্রীকদিগের অপেক্ষাও উচ্চতর শিক্ষা হইতে পারে। কারণ আমাদের শিক্ষায় স্বাধীন চিন্তার বড় শ্রীবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। গ্রীকদিগের কুসংস্কারাপন্ন নাগরিকগণের দোষে তাহা কখনই হইতে পারিত না। যেখানে সক্রেতিসকে নাস্তিক ও দেবদ্বেষী বলিয়া বধ করিল, তাহাদের চিন্তাশক্তি আধুনিক বাঙ্গালি শিক্ষিত যুবকদিগের মত উন্নতরূপিণী ছিল কেমন করিয়া বলিতে পারি।

শশ-ধর।

স্থান—গৃহ-চূড়; সময়—গভীর-নিশি।

১

পার না কি শশ-ধর, ঢালিতে কিরণ—
এই দগধ-পরাণে?
অনন্ত-আকাশ-তল, অনন্ত এ ভূ-মণ্ডল,
কর নিত্য আলোকিত কিরণ প্রদানে,
পার না কি এক বিন্দু ঢালিতে এ প্রাণে?

২

নিরেট, নির্ম্মম ওই প্রকৃতির বুকে—
কেন এতই আদর?
ও কি আশা করেছিল, কিবা আশা না পূরিল?
পূর্ণানন্দে পরিপূর্ণ উহার অন্তর;
ও কি জানে চন্দ্রালোক কত স্নিগ্ধ-কর!

৩

শশ-ধর,
প্রকৃতির শূন্য-বক্ষ শুধুই দেখিলে—
এ অনন্ত-কাল ধরে!
দেখ দেখি একবার, ভগ্ন-বক্ষ অভাগার,
কি আছে লুকান এই প্রাণের ভিতরে,
কত সুধা শুষ্ক এই পঞ্জরে পঞ্জরে!

৪

দুখী-মানবের মন এই স্নিগ্ধালোকে—
শশি দেখ একবার;
গগনের কক্ষে কক্ষে, অনন্ত-সাগর-বক্ষে,
হেরিয়াছ কি নক্ষত্র, কি রতন ছার—
দেখ দেখি হতাশের হৃদয়-ভাণ্ডার!

৫

কত পৃথ্বী, কত বিশ্ব হয়েছে বিনষ্ট—
এই প্রাণের ভিতরে!
কত তারা কক্ষ-চ্যুত! কত রত্ন ভষ্মাবৃত!—
আঁধারে পড়িয়া আছে কন্দরে কন্দরে;
কত নদী—কত সিন্ধু—শুষ্ক কলেবরে!

৬

হেন বক্ষ ছাড়ি তবে কেন শশ-ধর—
শূন্যে ঢালিছ কিরণ?
যাহার বুকের মাঝে, নিরাশার বজ্র বাজে,
কর তার বুক ভরি কৌমুদী ক্ষরণ;
সে বুঝিবে কি মধুর তোমার কিরণ।

৭

কি মধুর বেশে শশি কিরণে তোমার—
আজ সজ্জিত ভুবন!
উর্দ্ধে নীল-নভস্তল, নিম্নে পৃথ্বী-বক্ষঃ-স্থল,
ভাসিতেছে শুক্লালোকে স্বপ্নের মতন।
পার না কি ও আলোকে ভাসাতে জীবন?

৮

শূন্য মরুভূমি ওই সু-দূর-প্রান্তর,
তাও—শোভিছে কেমন!—
বালুকায় বালুকায়, চন্দ্র-কর-প্রতিভায়,
কি বর্ণ—কি মূর্ত্তি, মরি করেছে ধারণ!
পার না কি ওই বর্ণে রঞ্জিতে জীবন?

৯

প্রাসাদের মূলে ওই "পদ্ম" সরোবর—
আজ কত মনোহর!
পূর্ণ-বক্ষ জ্যোৎস্না-ময়, নক্ষত্রের সর প্রায়,
শোভিতেছে শান্ত-ভাবে—সলিল নিথর;
এই শান্তি, দগ্ধ-চিত্তে কতই সুন্দর!

১০

নিশা-নাথ,
এত শান্তি, এত সুধা, কেন অকারণ—
ঢাল ওই সরোবরে?
শীতল-হৃদয় তার, কেন স্নিগ্ধ কর আর,
নাহিক বিষের জ্বালা উহার অন্তরে,
বৃথা জ্যোৎস্না ঢাল তাহে এমন আদরে।

১১

অহো!
এই পূর্ণিমায় হেন প্রাসাদের চূড়ে—
আজ কত শত নরে,
খুলিয়া হৃদয়-দ্বার, দেখিতেছে অনিবার,
কত স্মৃতি—কত স্বপ্ন—উন্মত্ত-অন্তরে,
উথলিয়া জীবনের নিরুদ্ধ-সাগরে।

১২

আর আমার মন,
সেই পূর্ণিমায় সেই প্রাসাদ-শিখরে—
আমি কি দেখি এখন!
নেত্রে ঝরে অশ্রু-ধার, বুকে ঢাকা অন্ধকার,
দগ্ধ, আশা—দগ্ধ, স্মৃতি—তাপে দগ্ধ মন;
স্তূপাকার-ভস্ম-রাশি আমার জীবন!

১৩

শশধর,
কত দগ্ধ-হর্ম্ম্য-পথ কর আলোকিত—
তব মধুর-কিরণে;
বিনষ্ট-পম্পের* বক্ষে, বস্তু-গৃহে কক্ষে কক্ষে,
ঢালিয়াছ এই শান্তি পীযূষ-ক্ষরণে,
কেন নাহি ঢাল তবে এ দগ্ধ-জীবনে?

* Disinterred remains of the ancient city of Pompeii.

পাতিয়া দিয়াছি বক্ষ কিরণে তোমার—
চিত্তে ঢাল একবার ;
ছড়ায়ে জোছনা-রাশি, কর
আলোকিত—হাসি,
আঁধার, আঁধার-ময় জীবন আমার ;
ভাঙ্গা-ঘরে চাঁদ-আলো দেখি একবার।

১৫

পারিবে না ? বুঝিয়াছি, জ্যোৎস্নায়
এ প্রাণ—
কভু হাসিবে না আর ;
তবে যদি মর্ম্ম-স্থলে, সেই ক্ষীণ-শিখা জ্বলে,
জ্বলে উঠে কোন মতে আলোক তাহার,
ত্রিদিব-পূর্ণিমা হৃদে হইবে সঞ্চার।

১৬

দুরাশা!—যে ক্ষীণালোক হয়ে ক্ষীণ-তর—
ক্রমে হতেছে নির্ব্বাণ,
আজ কোন্ পুণ্য-বলে, সে শিখা উঠিবে জ্বলে,
কে করিবে তৈল-সেক—কার হেন প্রাণ?
যে করিবে—সে যে সেই কঠিন-পাষাণ।

শ্রীঈঃ—

মাধবীলতা।

১৮

সায়ংকাল অতীত হইলে পর কিঞ্চিৎ বিলম্বে রাজা বহির্ব্বাটীতে পুনরাগমন করিলেন। দেওয়ানের সমভিব্যাহারে নানা কথার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কতকগুলি ভট্টাচার্য্য আমার কুমারকে কাড়িয়া লইতে আসিয়াছিলেন কেন? আমি তাঁহাদের ভাব ঠিক বুঝিতে পারি নাই, ব্যাপারখানা কি? সত্য সত্যই কি তাঁহারা আমার ক্রোড় হইতে আমার সন্তান কাড়িয়া লইতে গিয়াছিলেন?"

দেও। একপ্রকার তাহাই বটে, দশরথ নামে একজন ভট্টাচার্য্য মনে করিয়াছেন যে, রাজকুমার তাঁহার সন্তান, তাহাই তিনি মহারাজের নিকট সন্তান চাহিয়াছিলেন।

রাজা। বোধ হয় ভট্টাচার্য্যমহাশয়েরা দিবসেই চক্রে বসিয়াছিলেন। তাহার পর, তাঁহারা কিরূপে ক্ষান্ত হইলেন?

দেও। ক্ষান্ত তাঁহারা এখনও সম্পূর্ণরূপে হন নাই, বোধ হয় তাঁহারা এই দাবি আবার মধ্যে মধ্যে করিতে আসিবেন; কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়াছি।

রাজা। তবে কি তাঁহাদের সত্য সত্যই এই ধারণা?

দেওয়ান্ এই সময় সংক্ষেপে ব্রাহ্মণদের সমুদয় কথার পরিচয় দিলেন। রাজা দুই একবার সজোরে নস্য টানিলেন। প্রকাশ্যে চিন্তা করা তাঁহার অভ্যাস ছিল; তিনি মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন,

ব্রাহ্মণ—অধ্যাপক—শাস্ত্রব্যবসায়ী—এক জন নয়, দুইজন নয়, অনেকগুলি—সকলেই ত পাগল নহে—আমার সঙ্গে তাঁহাদের কাহার ত শত্রুতা নাই—তাঁহারা কেন মিথ্যা বলিবেন? অবশ্য তাঁহাদের কথার কোন বিশেষ হেতু থাকিতে পারে—তাঁহারা বলিয়াছেন, "রাণীর দুইজন সখী এ কথা জানে," সখীরা ত আমার লোক, ব্রাহ্মণেরা যখন তাহাদের কথার উপর নির্ভর করিয়াছেন, তখন বুঝা যাইতেছে যে, ইহার মূল কিছু আছে। যাহাই হউক, আমার ভগিনীও এ কথার অবশ্য কিছু জানেন, আমার ভগিনী—রাজভগিনী, কখন তিনি মিথ্যা বলিবেন না, তাঁহার স্বামী জীবিত থাকিলে, তিনিও আজ মহারাণী—এক্ষণে কাঙ্গালিনী—কিছুতেই দুঃখ নাই—সকল সময়েই হাসিমুখ, অথচ একটু ম্লান—জ্যোৎস্নাবতী ঠিক নাম, গম্ভীর অথচ আলোকময়—কিন্তু একটু ম্লান—তাঁহার ম্লানতা আর ঘুচিবে না। আজ জ্যোৎস্নাবতী চক্ষের জল ফেলেছেন, হয় ত মনে কি ব্যথা পাইয়াছেন—রাণী বলেন জ্যোৎস্নাবতী আজ চোখের জল ফেলিয়া অলক্ষণ করিয়াছেন, স্ত্রীজাতির মন।—

এই বলিয়া রাজা সশব্দে আবার নস্য-গ্রহণ করিলেন। দেওয়ানমহাশয় বলিলেন:—

"আমি মনে করিয়াছিলাম, এ বিষয়ের কোন তদন্ত আবশ্যক হইবে না। আমার স্পষ্ট বোধ হইয়াছিল যে, কোন রাজশত্রু এই কথা রটাইয়াছে। দশরথ ভট্টাচার্য্য কতকটা সাদা লোক, রটনার কৌশল বুঝিতে না পারিয়া রাজসমক্ষে আসিতে সাহস করিয়াছেন।"

রাজা। তা বটে, কিন্তু কথাটা এই যে রাজভগিনী সাক্ষী, তিনি ত রাজশত্রুর দলে নহেন। তাঁহার কথা আমি কখন অবিশ্বাস করিতে পারি না।

দেও। রাজভগিনী ত সাক্ষী নহেন, ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই। রাজভগিনী এ কথা অবশ্য জানেন এই অনুভব আপনিই করিতেছেন।

রাজা। তা সত্য, তাঁহাকে এ কথা অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। কিন্তু পরের সন্তান পিণ্ড দিলে আমার পিতৃপুরুষ গ্রহণ করিবেন না; তবে এমন সন্তান লইয়া কেবল অধর্ম্মাচরণ করিবার ফল কি?

দেওয়ান। এখনও ত স্থির হয় নাই যে রাজকুমার দশরথ ভট্টাচার্য্যের পুত্র, যদি তাহা মহারাজের প্রতীতি জন্মে, তখন কর্ত্তব্য বিবেচনা করা যাইবে। কিন্তু এই সময় রাজশত্রুরা মহারাজের অভিপ্রায় জানিতে পারিলে, নানা ব্যাঘাত ঘটাইবে।

রাজা। না, আমি কোন কথাই এখন বলিতেছি না; রাজভগিনীকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না, তাঁহাকেও কোন কথা এক্ষণে জিজ্ঞাসা করিব না; তিনি বোধ হয়, কোন রূপ মনোব্যথা পাইয়াছেন।

জ্যোৎস্নাবতী বাস্তবিক সে দিবস বড় মনের কষ্টে ছিলেন, তাঁহার প্রতি রাণীর মনোভঙ্গ হইয়াছে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। উৎসবের দিনে জ্যোৎস্নাবতী চক্ষের জল ফেলিয়াছেন,বলিয়া রাণীর প্রথম বিরক্তি জন্মে; তাহার পর রাজকুমারকে আশীর্ব্বাদ করিবার সময় জ্যোৎস্নাবতীকে খুঁজিয়া আনিতে হইয়াছিল বলিয়া রাণীর চিত্তবিকার আরও অধিক হয়, শেষ রাণী যখন সভাদর্শনে গিয়াছিলেন, সকল স্ত্রীলোকই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কেবল জ্যোৎস্নাবতী উঠেন নাই; রাণীকে সম্মান করা দূরে থাক, একবার ফিরিয়াও চাহেন নাই; এই তাচ্ছিল্য রাণীর অসহ্য বোধ হইয়াছিল, এমন কি তিনি আর সেখানে তিলার্দ্ধ অপেক্ষা না করিয়া শয়নমন্দিরে আসিয়া শয়ন করিলেন।

দশরথ দেবশর্ম্মা গোপনে যে দুইজন দাসীর নাম করিয়াছিলেন, তাহারা রাণীর সর্ব্বদাই সঙ্গে থাকিত, রাণীর মনের গতি বিশেষ বুঝিত, অতএব রাণীর সঙ্গে সঙ্গে শয়নাগারে আসিয়া ব্যজনহস্তে ইচ্ছাপূর্ব্বক জ্যোৎস্নাবতীর প্রসঙ্গে দুই একটি কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া দেখিল, রাণীর রাগ বরং তাহাতে বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। কাজেই দাসীরা ক্রমে ক্রমে সুর ফিরাইল, সাবধানে জ্যোৎস্নাবতীর দুই একটি নিন্দাবাদ আরম্ভ করিল; এমন সময় অপর একজন পরিচারিকা অতি ব্যস্ত হইয়া শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল, "ঠাকুরাণী কোথায়? বিষম বিপদ উপস্থিত; অনেকতক লোক রাজকুমারকে লইয়া পলাইতেছিল।" "রাজা কোথা!" বলিয়া রাণী বাঘিনীবৎ সদর্পে উঠিলেন। পরিচারিকা বলিল, "রাজকুমারকে বুকে করিয়া তিনি অন্তঃপুরে আসিতেছেন।" রাণী শিথিলোদ্যম হইয়া আবার পর্য্যঙ্কে বসিলেন। পরিচারিকা চলিয়া গেল।

যে দুইজন দাসী রাণীকে ব্যজন করিতেছিল, একজন বলিল, "আমরা তা আগেই জানি, রাজভগিনীর মহলে রাম না হতে রামায়ণ হয়ে গিয়াছে। আজ ছেলে কাড়িয়া লইতে আসিবে পরামর্শ হয়েছিল, আমরা তাহা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম।"

রাণী। কি শুনেছিলি?

প্রথম দাসী। আমাদের সে সকল কথা বলিতে সাহস হয় না।

দ্বিতীয় দাসী। আমাদের বলা ভালও হয় না, আমরা যেমন লোক সেইরূপ থাকাই ভাল, আমাদের কথায় রাজঘরে মনান্তর হইলে আমাদের সে কলঙ্ক রাখিবার স্থান হবে না।

রাণী। আমি সকল কথা শুনিতে চাই, আমার লোক হয়ে, আমার বিরুদ্ধের কথা যে গোপন করিবে, আমার বাটীতে তার স্থান হবে না।

প্রথম দাসী। আমাদের উভয় সঙ্কট, তা আর ভয় করিলে কি হবে, রাগ করিবেন না; একদিন আমরা দুইজনে রাজভগিনীর মহলে গিয়া শুনিয়াছিলাম

যে এতদিনের পর রাজবংশে পিণ্ডলোপ হলো। যে ছেলে আমরা লালনপালন করিতেছি, সে ছেলে নাকি কোন্ বামুনদের। প্রসবের সময় যখন আপনি মূর্চ্ছা যান, তখন নাকি রাজভগিনী মরা মেয়ে ভূমিষ্ঠা দেখে, কাঁদিতে কাঁদিতে আপন মহলে চলে যান, তাহার পর আমরা না কি কোন ধাইকে দিয়ে সেই মরা মেয়ে কোন্ বামুনদের আঁতুড়ে রেখে, তাদের নাকি ছেলে আপনার আঁতুড়ে এনে দিই। আবার নাকি টাকার লোভে আমরা এ কাজ করেছিলাম; চোখখাগিরা বলে কি, রাজপুত্র হলে বড় ঘটা হবে, অনেক দান ধ্যান হবে, তাই নাকি আমরা দুজনে পরামর্শ করে ছেলে বদল করেছিলাম।

রাণী। তোরা রাজভগিনীর মুখে এ কথা শুনেছিলি?

প্র, দা। না, তাঁর মুখে কেন? আমাদের কি এত সাহস হয় যে আমরা সে কথা বলিতে পারি। আর পাঁচজনে এ কথা বলিতেছিল, তবে তিনি সেখানে বসে ছিলেন। তা তাঁর বলা কাজেই হল বই কি, তিনি ত বলিলেন না যে একথা মিথ্যা।

রাণী তৎক্ষণাৎ সিংহীর ন্যায় ফুলিয়া উঠিলেন। মাথা বাঁকাইয়া প্রথম দাসীর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। দুর্দ্দম রাগহেতু কিয়ৎক্ষণ কথা কহিতে পারিলেন না। তাহার পর কথঞ্চিৎ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া বলিলেন, "তোমরা একজন যাও, জ্যোৎস্নাবতীকে বল গিয়া, যে যত দিন তিনি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, তত দিন তাঁর এ বাটীতে থাকা ভাল দেখাইয়াছিল।"

প্রথম দাসী চলিয়া গেল। কয়েক পদ গেলে আবার রাণী তাহাকে ফিরাইয়া বলিলেন, "জ্যোৎস্নাবতীকে ডাকিয়া তাঁহার নিজের মহলে লইয়া গিয়া এই কথা বলিবে। আমার মহলে এ কথা বলিবে না।"

দাসী বিনীতভাবে জ্যোৎস্নাবতীকে ডাকিয়া তাঁহার মহলে লইয়া গেল। তাঁহার পাদমূলে বসিয়া দুই একবার চক্ষের জল মুছিল, তাহার পর বলিল, "রাণীঠাকুরাণীর কি হয়েছে, সকলকেই কটুবাক্য বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এমন দিন যায় না যে অনর্থক দুই একবার আমরা তিরস্কার না খাই—"

জ্যোৎ। তাই বলে তোমরা কিছু মনে কর না, তিনি স্বাভাবিকই একটু রাগী, রাগটা পীড়ার মধ্যে, রাগ যার আছে তার উপর দয়া হয়। যদি স্ত্রীলোকে রাগ করে কথা কয়, তাহা হইলে বড় কুৎসিত দেখায়, স্ত্রীলোকের রাগ শুনিলে আমার বড় লজ্জা হয়। গল্প আছে যে, সত্যভামা একবার রাগ করে একজনকে গালি দিতেছিলেন, এমন সময় শ্রীকৃষ্ণ একখানি দর্পণ লইয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন, সত্যভামা আপনার রাগভরা মুখ দেখে বড় লজ্জিত হলেন, আর সেই অবধি কখন তিনি

রাগ করে কথা কহেন নাই। রাগ হলে চুপ করে থাকিতেন।

দাসী। তা যাহাই হউক, আমাদের উপর রাগ করে যাহাই বলুন, আমরা সকলই সহ্য করি, কিন্তু এখন যে বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিলেন।

"কেন, আবার কার উপর রাগ করে কি বলেছেন?" এই কথাটি জ্যোৎস্নাবতী কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখ মলিন হইয়া গেল।

দাসী। তা আপনি ত বুঝেছেন।

জ্যোৎ। তা হোক্, রাণী আমার উপর অন্য জন্ম রাগ করুন।

দাসী। তিনি রাগ করে বলিলেন যে—

জ্যোৎ। যাহাই বলুন, সে কথা আমায় আর শুনাইবার আবশ্যক কি?

দাসী। আবশ্যক আছে বই কি, তিনি যে সে কথা শুনাইবার জন্য আমায় পাঠালেন।

জ্যোৎ। তুমি বল গে "বলে এসেছি, তাহা শুনে অনাথিনী জ্যোৎস্নাবতী অনেক কেঁদেছেন," তাহা হইলেই ত রাণীর তৃপ্তি হবে?

দাসী। না, তিনি বলেছেন আপনাকে এখান হতে চলে যেতে, না গেলে তাঁহার তৃপ্তি হবে না।

দাসী এই বলিয়া চলিয়া গেল, যাইবার সময় জ্যোৎস্নাবতীর প্রতি আর ফিরিয়া চাইতে পারিল না।

১৯

সেই দিবস রাত্রি দুই প্রহরের সময় জ্যোৎস্নাবতী ছাদের উপর শয়ন করিয়া চন্দ্রের প্রতি চাহিয়া আছেন, নিকটে তাঁহার পরিচারিকা মাতঙ্গিনী বসিয়া আছে, মধ্যে মধ্যে বলিতেছে, "রাত্রি অধিক হয়েছে ঘরের ভিতর চলুন।" জ্যোৎস্নাবতী বাক্যদ্বারা কোন উত্তর না দিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বা অঞ্চলে মুখ মুছিয়া উত্তর দিতেছেন। যখনই মাতঙ্গিনী কথা কহিতেছে, তখনই জ্যোৎস্নাবতী এইরূপ করিতেছেন; মুখে কথা নাই, চক্ষে জল নাই বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় স্থিরভাবে আছেন।

অনেকক্ষণ পরে জ্যোৎস্নাবতীর চক্ষে জল আসিল। পূর্ণিমার রাত্রি মেঘাবৃত হইলে ম্লানজ্যোৎস্না দেখিয়া যেমন কখন কখন প্রাণ কাঁদে, জ্যোৎস্নাবতীর ম্লানমুখে চক্ষের জল দেখিয়া সেইরূপ মাতঙ্গিনী কাঁদিল। মাতঙ্গিনী হয় ত ভাবিল, জ্যোৎস্নাবতীর মনোবেদনা বাড়িল। মাতঙ্গিনী অল্পবয়স্কা; বুঝিল না, যে যখন বিষম ঝড় বহিতে থাকে তখন এক ফোঁটাও জল পড়ে না—ঝড় থামিলেই জল হয়। জ্যোৎস্নাবতীর হৃদয়ে যতক্ষণ ঝড় বহিতেছিল, ততক্ষণ চক্ষে জল আইসে নাই; ঝড় মন্দীভূত হইল, আর চক্ষে জল আসিল।

মাতঙ্গিনীর ঘন ঘন নিশ্বাস শুনিয়া জ্যোৎস্নাবতী তাহার মুখপ্রতি ফিরিয়া চাহিলেন, শেষ উঠিয়া তাহার চক্ষের

জল মুছিয়া দিলেন। জ্যোৎস্নাবতী স্নেহময়ী—সকলকেই ভালবাসিতেন, সকলকেই স্নেহ করিতেন, বিশেষতঃ আবার দুঃখীদিগকে; যে নিজে দুঃখী, সেই কেবল অন্যের দুঃখ বুঝিতে পারে। মাতঙ্গিনী পিতৃমাতৃহীনা, আশ্রয়হীনা, বিধবা, বিশেষতঃ সে মাতৃসম্বোধন করিত বলিয়া জ্যোৎস্নাবতী তাহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন।

মাতঙ্গিনীর চক্ষের জল মুছিয়া জ্যোৎস্নাবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাতি! তুই কাঁদিস্ কেন?"

মাতঙ্গিনী উত্তর করিল, "এখন আপনি তবে কোথায় যাবেন?"

জ্যোৎস্না। আমার আর এ জগতে স্থান কোথা?

মাত। কেন—আপনার শ্বশুরবাড়ী? শুনিয়াছিলাম আপনার শ্বশুর রাজা ছিলেন, আপনি কেন সেইখানে যান্ না। আপনার সঙ্গে ত সম্বন্ধ ঘুচে নাই।

জ্যোৎস্না। ঘুচে গেছে বৈ কি, আর এখন কি সম্বন্ধ! শ্বশুরবাড়ীর কথা মনে করিতে বড় কষ্ট হয়।

এই বলিয়া জ্যোৎস্নাবতী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে বসিয়া রহিলেন। মাতঙ্গিনী আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। শেষ জ্যোৎস্নাবতী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সে শ্বশুরবাড়ীর কথা মনে করিব না কেনই বা বলি। দিবানিশি যে সেই কথাই আমার জপ, সেই কথাই লয়ে আমার সুখ, সেই কথাই লয়ে আমার দুঃখ। আজ আবার যে আদ্যন্ত সে সকল কথাই মনে পড়িতেছে।"

মাত। আপনার শ্বশুরবাড়ীর কি কথা মা? আমি কোন কথা কখন শুনি নাই।

জ্যোৎ। হলদির জাঙ্গাল দেখেছ?

মাত। দেখেছি—সেই জাঙ্গাল দিয়ে আমার মামার বাড়ী গিয়াছিলাম।

জ্যোৎ। তার ধারের গাছগুলি কত বড় হয়েছে?

মাত। সে সব খুব বড় হয়েছে। বটগাছ থেকে ঝুরি নেমে অনেকদূর অবধি অন্ধকার হয়ে আছে।

জ্যোৎ। সে জাঙ্গাল দিয়ে লোকজন চলে?

মাত। বড় নয়—কখন কেহ যায়। কেহ যায় না বলিয়া তাহার মাঝখানে বড় জঙ্গল হয়েছে।

জ্যোৎ। তবে ঠিক আমার অদৃষ্টের মত হয়েছে।

মাত। কেন মা?

জ্যোৎ। সেই জাঙ্গাল আমার বিয়ের সময় হয়। সেই জাঙ্গাল দিয়ে আমার শ্বশুর বিয়ে দিতে এসেছিলেন।

মাত। বিয়ের পর আপনি শ্বশুরবাড়ী গিয়েছিলেন?

জ্যোৎ। তা ত যেতে হয়। সেখানে গিয়ে ষোল বৎসর থাকি; তার পর

চিরদুঃখিনী হয়ে এখানে আবার ফিরে আসি।

জ্যোৎস্নাবতী এই বলিয়া চক্ষের জল মুছিলেন।

মাত। তা—এতদিনের মধ্যে এঁরা আপনাকে আর জানেন নাই কেন?

জ্যোৎ। এ সকল রাজকায়দা। আমার যেমন বিপদের সময় বড় ইচ্ছা হয়েছিল, একবার এখানে এসে কাঁদি। আমি তখন সতের বৎসরের। বিপদের কি জানি। সংসারের কি জানি, কপালের কথাই বা কি জানি।

মাত। কেন মা, কি হয়েছিল।

জ্যোৎ। কি হয়েছিল তার কোন্‌খানটা বলিব, যখন তাঁর বয়স ২২ বৎসর তখন সেই সর্ব্বনাশ হয়, তার পূর্ব্বে আমি কত সুখে ছিলাম; ভাবিতাম পৃথিবীর সুখই বুঝি এইরূপ, এ সুখ থাকে কি যায়, সকলের কপালে ঘটে কি না ঘটে, তাহা একবারও মনে ভাবিতাম না, আপনার সুখে আপনি ডুবে থাকিতাম, তাঁর যত্নে অন্ধ হয়ে থাকিতাম। এজগতে কাহারও যে কষ্ট আছে তাহা একেবারে জানিতাম না, তাঁরে আদর করিতাম তাতে সুখ, আবার তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করিতাম তাতেও সুখ। তাঁরও সুখের সীমা ছিল না। কিন্তু কি তাঁর দুর্ব্বুদ্ধি হয়েছিল আমায় লেখা পড়া শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। আমি শিখিতে কত আপত্তি করিতাম, পায়ে ধরে পর্য্যন্ত বলিতাম, যে "আমাদের লেখা পড়া শিখিতে নাই, শিখিলে অদৃষ্ট মন্দ হয়।" তিনি তাহা কিছুই শুনিতেন না, আমার সকল কথা হাসিয়া কাটাইতেন, বলিতেন, "স্ত্রী রামায়ণ পড়িলে যদি স্বামী মরে, ত এমন স্বামী মরাই ভাল।" এ কথায় বড় ব্যথা পাইতাম। চোখের জল মুছিয়া পড়িতে বসিতাম। তিনি আমাকে পড়াইয়া পাখী পড়াইতে যাইতেন; হাসিয়া বলিতেন, "এটিও তোমার মতন—খাঁচায় থাকে, জানে না যে কেন এ খাঁচা, কেন আপনার এতরূপ, কেন এত মিষ্টস্বর, কেন বা ঐ সূর্য্য, কেন বা ঐ চন্দ্র, কেন বা এ পৃথিবী, কেন বা এ জগৎ।" আমি হাসিয়া বলিতাম, "বল, এ দুটীর মধ্যে কারে ভালবাস।" এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেই হাসিয়া পলাইতেন, তাঁর হাসি কি আর ভুলিতে পারিব? পাখীটি তাঁর হাসি বুঝিত, তাঁর হাসি শুনিলে সুখে সে কত কথাই কহিত, আমি ভাবিতাম যে আমা অপেক্ষা বুঝি পাখী তাঁরে বেশী আদর করিল। আমার মনে মধ্যে হিংসা হইত, আমি তখন আর কার হিংসা করিব? তিনি চলিয়া গেলে তাঁর হাসি কি কথা না শুনিতে পাইলে পাখীটি নীরবে থাকিত, আমি রাগ করে তার খাঁচা ধরে কত গালি দিতাম, পাখী একবার এ কাণ একবার ও কাণ ফিরাইয়া আমার গালি শুনিত, কোন উত্তর দিত না, একবার একবার লাফাইয়া আমার আঙ্গুল ঠোকরাইত, আমি আবার গালি

দিতাম; তিনি ঘরে আসিলে তাঁর সাক্ষাতেও গালি দিতাম, বলিতাম, "ও আমার সতীন!" তিনি হাসিয়া উঠিতেন, পোড়া পাখী সে হাসি শুনিবামাত্র আবার আপনার সুর ধরিত। কত কথা কহিত, তিনিও যেন তার সকল কথা বুঝিতেন, সেই মত তাহার সঙ্গে আমোদ করিতেন। আমি রাগ করিয়া বসিয়া থাকিতাম, তখন বুঝিতাম না যে তাঁরে পাখীটি পর্য্যন্ত সকলে ভালবাসে। উঠানে বাহির হইলে তাঁহাকে পায়রায় আসিয়া ঘেরিত, যে তাঁর শরীরে বসিতে না পাইত, সে তাঁরে বেড়িয়া উড়িত, তিনি মুখ তুলিয়া তাহাদের সঙ্গে কথা কহিতেন, উর্দ্ধমুখখানি কত সুন্দর দেখাত!

রাজবাটীতে যত হাতী ছিল, সকলে তাঁরে চিনিত, ভালবাসিত। তাঁর স্নানের সময় পুষ্করিণীতে সকলগুলি আসিত; তাঁরে লইয়া জলে কতই খেলা করিত। শুঁড়ে বসাইয়া কেহ তাঁরে জলে নামাইত, আর সকলে সেই সময় শুঁড় দিয়া তাঁর গায়ে জল ছিটাইত। এক একদিন পুষ্করিণীর ধারে যখন জলচৌকিতে বসিয়া তিনি তৈল মাখিতেন সেই সময় কোন হাতী হয় ত জল হইতে ধীরে ধীরে শুঁড়ের আগা বাড়াইয়া তাঁর শরীর স্পর্শ করিত, তাঁর অঙ্গস্পর্শ না করিলে যেন সে আর থাকিতে পারে না। জলে নামিতে দেরি হতেছে বলে কোন দুরন্ত হাতী হয় ত জল-চৌকি ধরিয়া টানিত, তিনি হাসিয়া গালি দিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন; জলের ভিতর লুকাইতেন, আর সকল হাতীরা তাঁরে খুঁজিয়া বেড়াইত, আমি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে জানেলায় বসিয়া থাকিতাম, তার পর তিনি একদিকে ভাসিয়া উঠিলে সকল হাতী সেই দিকে গিয়া পড়িত। শেষ তিনি সকল হাতীর শুঁড়ে এক একবার করিয়া দাঁড়াইলে তাহাদের তৃপ্তি হইত। তাহার পর স্নান হইলে একটা হাতী শুঁড় দিয়া ছাতি ধরে বরাবর তাঁকে দরজা পর্য্যন্ত দিয়া যাইত।

স্নানের পর পূজা করিতে বসিতেন। তখন তাঁর কি আশ্চর্য্য মূর্ত্তি হইত, মুখ দেখে বোধ হইত, যেন এ পৃথিবীতে আর তাঁর কোন সংস্পর্শ নাই। যখন চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করিতেন, সম্মুখের দেবতারা তাঁর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন। লোকে বলিত, দেবতারা তাঁর সঙ্গে কথা কহিতেন। তা হবে, আশ্চর্য্য কি! তাঁর সঙ্গে কথা কহিতে দেবতাদের ইচ্ছা হতে পারে, মানুষের মধ্যে তাঁর মত পবিত্র আর কে ছিল? মার নিকট বসে আহার করিতেন, কোন কোন দিন আহারের পর মার কোলে মাথা রাখিয়া একটু শয়ন করিতেন, তখন তাঁহার মুখখানি শিশুর মত কোমল হইত যেন আদর-ভরা।

তার পর বিষয়কার্য্য দেখিতে যাইতেন, যে-পর্য্যন্ত তিনি কাছারিবাটীতে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিলেন, সেই পর্য্যন্ত দেওয়ানের ভয় হইয়াছিল।

তাঁকে সকলেই ভালবাসিত, কেবল দেওয়ান্ বিষ দেখিত ; সেই দেওয়ানই আমার কাল হয়েছিল ; কিন্তু তিনি থাকিতে দেওয়ান্ কিছু করিতে পারে নাই।

তাঁর সকলই গুণ ছিল, কেবল এক দোষের নিমিত্ত সকলেই তাঁর নিন্দা করিত ; তিনি চেষ্টা করে বিপদ আনিতেন। বিপদ্ না ঘটে এই সকলের চেষ্টা, কিন্তু তাঁর চেষ্টা ছিল কিসে বিপদ হবে। আমি তাঁরে কত বলিতাম, তিনি কিছুই শুনিতেন না, হাসিয়া বলিতেন, "অনেকে মধ্যে মধ্যে পা না টেপাইলে কষ্ট পায়, আমারও সেইরূপ মধ্যে মধ্যে বিপদে না পড়িলে বড় কষ্ট হয়।" আমি অবাক্ হয়ে শুনিতাম। একবার কোন্ দেশে কাছারী দেখিতে গিয়াছিলেন, বাটী আসিতে পথে শুনিলেন যে, দূরে এক পুষ্করিণীতীরে ডাকাতেরা বড় দৌরাত্ম্য করিতেছে, পূর্ব্বদিন একজন ভদ্রলোকের কন্যা পাল্কী করে শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিল, এমন সময় ডাকাতেরা তাহাদের সকলকে মেরে ফেলেছে। শুনে সঙ্গীরা বলিল, ওপথে যাওয়া হবে না, শুনে তিনি বলিলেন, ঐ পথেই যেতে হবে। এই বলে বৌ সেজে পাল্কীতে উঠিয়া সঙ্গীদের ফেলে চলিয়া গেলেন, সাত আট জন ডাকাতকে ধরে বাটী আনিলেন, কিন্তু তাহাদের সঙ্গে লাঠালাঠি করিবার সময় একজন ডাকাত খুন হয়। সেই অবধি আমার কপাল ভাঙ্গে, কেমন তাঁর ধারণা হয় যে তাঁর লাঠিতেই ডাকাত মরেছে, অথচ সে সময় তাঁর হাতে লাঠি একেবারে ছিল না। যার লাঠিতে মরিয়াছিল সে আপনি স্বীকার করেছিল, বখসীসও পেয়েছিল তথাপি তাঁহার সন্দেহ ঘুচিল না।

প্রথমে তিনি পূজা ছাড়িলেন, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, আমি এখন অশুচি—দেবতারা আর আমার পূজা লবেন না। তার পর ক্রমে ক্রমে অন্যমনস্ক হইতে লাগিলেন, এক একবার বলিতেন, প্রায়শ্চিত্ত করিব, অন্যের জন্য মরিলেই এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে। আমি কিছুই বুঝিতে পারিতাম না, কেবল বুঝিতাম সে মুখে আর হাসি নাই। শেষ একদিন বেড়াইতে গিয়া দেখিলেন যে পথে একটা দুরন্ত ছেলে ইট হাতে করে একজন পাগলকে বলিতেছে, "আমি তোরে মারিব।" পাগল ভয়ে হাঁ করিয়া কাঁদিতেছে, যতবার বালক বলিতেছে, "এই মারি" ততবার পাগল কাঁদিয়া উঠিতেছে ; এই দেখে তিনি কেমন ব্যাকুল হলেন, হয় ত ভয় পেলেন, তিনিও যেন ভয়ে কাঁদিয়া উঠেন, তাঁর এইরূপ বোধ হলো, কিন্তু বাড়ী এসে তাহা আর কিছুই বলিতে পারিলেন না। আমি বলিলাম, "পাগলের কান্না দেখে তুমি ভয় পেয়েছ কেন, তুমি ক্ষেপেছ নাকি ?" অমনি তিনি আমার মুখ চাপিয়া বলিলেন, "ও

কথা কেন বলিলে ? আমার ভয় করিতেছে ; তবে কি সত্যই,—" এই বলিয়া আমার হাত ছিনিয়া পলাইলেন।

আমার নিকট হইতে পলাইয়া মার নিকটে গেলেন, দুই হাতে মার পায়ের ধূলা সর্ব্বাঙ্গে মাখিতে মাখিতে বলিলেন "মা, আমার পীড়া হয়েছে, তোমার চরণরেণু মাথিলেই আমি ভাল হব।" মা এই কথায় কাঁদিয়া উঠিলেন, কান্না দেখিয়া আবার ভয় পেয়ে বলিলেন, "তবে সত্যই।" অমনি সেইখান হইতে পলাইলেন, একবার আসিয়া পিতাকে প্রণাম করিলেন, পিতা ভাবিলেন, অসময়ে এ প্রণাম কেন ? কিন্তু তিনি কোন কথা না বলে চলে গেলেন।

রাত্রে আর তাঁকে কেহই খুঁজিয়া পাইল না। সেই দিন অবধি রাজবাড়ী শূন্য হলো।

চারিদিন পরে একজন জেলে আসিয়া সম্বাদ দিল যে রাজপুত্রকে পাওয়া গিয়াছে। শুনিবামাত্র রাজবাড়ীর সকলে জেলের সঙ্গে ছুটিল, গ্রামের লোকও পালে পালে গেল। আমি একা বসে মনে মনে করিতে লাগিলাম যে, এবারে তাঁরে পেলে আর তিলার্দ্ধের জন্য ছেড়ে দিব না ; একবার তাঁরে দেখিতে পেলে হয়। অনেকক্ষণ পরে আবার পালে পালে লোক ফিরে আসিতে লাগিল, রাজবাটীরও লোক সকল ফিরে আসিল ; কিন্তু তাঁর আমার কথা কেহ বলে না। আমি ছটফট করিতে লাগিলাম, শেষ রাজমহলে কান্নার গোল উঠিল, আমি তখনও কিছুই বুঝিতে পারিলাম না ; কিন্তু কেমন একটা আতঙ্ক হলো, আমি গিয়া লুকায়ে রহিলাম, আপনি লুকালে ও কুসম্বাদ লুকান থাকে না ; ক্রমে শুনিলাম, নদীতীরে তাঁর দেহের সংকার আরম্ভ হয়েছে, জেলে জাল ফেলিতে গিয়ে তাঁর দেহ পাইয়াছিল, তাই রাজবাটীতে খবর দিতে এসেছিল, কেহ তার কথা প্রথম বুঝিতে পারে নাই শেষ নদীরধারে গিয়া বুঝিতে পারিল। তার পর আমার কি হলো আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। যখন উঠে বসিতে পারিলাম, তখন একদিন শ্রাদ্ধের কথা আমার কাণে গেল, আমার যে কি সর্ব্বনাশ হয়েছে তখন কিছু কিছু বুঝিতে পারিলাম। সর্ব্বনাশের কথা আমার আগে সকলেই বুঝেছিল, পোড়া আমি কেবল বুঝিতে পারি নাই। পায়রা আর সেরূপ গোলমাল করে না, কার্ণিসের নীচে চুপ করে বসে থাকে। একদিন স্নানের সময় জানেলায় বসে পুষ্করিণীর ধারে তাঁর শ্বেতপাথরের জলচৌকিখানি দেখিতেছিলাম, এমন সময় একটি হাতী দৌড়িয়া সেইখানে আসিল, সঙ্গে সঙ্গে কত লোক ছিল, কিন্তু হাতীর কাছে কেহই আসিল না। লোকে ভেবেছিল হাতী ক্ষেপেছে, কিন্তু হাতীটি ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; তিনি এই হাতীটিকে বড় ভাল বাসিতেন, এই হাতীটিই তাঁরে হাতী

ধরিত, এই হাতীটিই এক একদিন শুয়ে থাকিত, আর তিনি তার পেটে ঠেস দিয়ে বসে বাঁশী বাজাতেন। হাতীটি অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত ঘাটে দাঁড়ায়ে এদিক ওদিক ফিরে ঘুরে দেখিতে লাগিল, আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম তাঁরে খুঁজিতেছে, এক-বার তাঁরে চীৎকার করে ডাকিল, শেষ জলে নামিল, মনে করিল, তিনি জলের ভিতর কোথাও লুকায়ে আছেন, কত-বার ডুব দিল, কতবার মাথা তুলে চারিদিকে দেখিতে লাগিল। আবার জল হতে উঠে জলচৌকির নিকট দাঁড়াল, জলচৌকি সরাইয়া দেখিল। হাতী কি চায়, কি খুঁজিতেছে, মাহুত তা বুঝিল, কাছে এসে গা চাপড়ে বলিল, "আর কেন খোঁজ? সে ধন হারিয়ে গেছে।" হাতী সে কথা কিছুই শুনিল না, দাঁড়ায়ে রহিল, একজনের হাতে একটি ছাতী ছিল শুঁড় দিয়া তাহা কাড়িয়া লইল, জলচৌকির উপর ক্ষণেক তাহা ধরিয়া রহিল, তার পর যেন তাঁরে স্নান করাইয়া বাড়ী আনিতেছে এই ভাবে ছাতী ধরে দরজা পর্য্যন্ত আসিল; এই দেখে মাহুত কেঁদে উঠিল। জানেলা থেকে আমায় দাসীরা সকলে উঠাইয়া নিয়ে গেল।

তার পর শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধ করিতে আমায় লয়ে গেল, আয়োজন দেখে তা বুঝিতে পারিলাম। আমি প্রথমে কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরে আসিলাম, আর কোন মতে গেলাম না। শেষ আমার শ্বশুর নিজে এসে একবার কাঁদিতে লাগিলেন, একবার সাধিতে লাগিলেন। আমি তখন আর কি করি, মিছে করে বলিলাম যে, "তিনি ত মরেন নাই, তিনি আবার ফিরে আসিবেন। জেলের কথা শুনে যে দেহের সৎকার করা হয়েছে, সে দেহ ত তাঁর নহে। যারা দেখিতে গিয়েছিল তারা কেবল কাপড় দেখে চিনেছিল; কিন্তু অন্য লোকে কেহ যদি তাঁর কাপড় পরে থাকে?"

এই কথা শুনে আমার শ্বশুর অবাক্ হয়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তার পর বলি-লেন, "সত্য কথা, আমি কেন এতক্ষণ বুঝিতে পারি নাই। আমার চাঁদ বেঁচে আছে। আবার আসিবে ঠিক কথা। আমি দেওয়ান্‌কে বলি গিয়ে।

কিন্তু পাষণ্ড দেওয়ান্ তাঁর সকল কথা উল্টাইয়া দিল। আবার শ্বশুর এসে জেদ করে ধরিলেন যে "শ্রাদ্ধ করিতে হবে, নতুবা তাঁর গতি হবে না, প্রেত অবস্থায় কত কষ্ট পাবেন।" আমি আর কি করি; শ্রাদ্ধ করিলাম।

মাতঙ্গিনী। আপনার খাশুড়ি কিছু বলিলেন না, আপনি তাঁর কোন কথাই ত বলিতেছেন না।

জ্যোৎ। তিনি বৃথা মানুষ ছিলেন, কখন কখন তাঁর জ্ঞান থাকিত না। আমার বিবাহের পর বরাবর দেখেছি বেশ সহজ লোক ছিলেন; কিন্তু যখন শুনিলেন যে, তাঁর সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে

তিনি কথাও কহিলেন না, একদিন কাঁদিলেনও না, আমি কাঁদিলে বলিতেন, আমার ছেলের অকল্যাণ হবে। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, রোজ আমার কপালে সিন্দুর পরায়ে যেতেন। কিন্তু অধিক দিন বাঁচিলেন না। আমার শ্বশুর দিনকতক শোক করিলেন, তার পর ক্রমে ক্রমে পুত্রশোক পর্য্যন্ত ভুলে গেলেন; বুড়ালোকের শোক কত দিন থাকে?

মাতঙ্গিনী। শোক নাকি আবার বুড়া যুবার পৃথক্!

জ্যোৎ। কিন্তুর পৃথক্। তা আমার শ্বশুর হতে থছি। একবৎসর না যাইতেই তিনি পোষ্যপুত্র লইলেন। একদিনের জন্যও আপন পুত্রকে স্মরণ করিলেন না। তার পর আর এক কাণ্ড হয়ে গেল, যার অদৃষ্ট মন্দ তার যন্ত্রণা পদে পদে, বিধাতা যেন তারে একবার মেরে তৃপ্তি হন না।

আমি বিধবা হবার দশবৎসরের পর একদিন বৈকালে পাঁচজনে একত্রে বসে আছি, এমন সময় আমার শ্বাশুড়ির একজন দাসী ছুটে এসে বলিল, "আবার যে কি শুনিতে পাই।" শ্বাশুড়ির মরণের পর অবধি দাসী আর রাজবাড়ীতে থাকিত না; কখন কখন আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিত। আমি তারে জিজ্ঞাসা করিলাম "কি কথা শুনিতে পাও?" সে বলিল, "এবার সত্য সত্যই নাকি রাজকুমার ফিরে এসেছেন, তিনি কাঞ্চনবাগে বসে আছেন কাপকে খবর পাঠায়েছেন, রাজামহাশয় সেখানে এই গেলেন।"

এই সময় আর একজন দৌড়াদৌড়ি এসে বলিল, "আমি এই তাঁরে স্বচক্ষে দেখে এলাম, বড় কাল হয়ে গেছেন; প্রথমেই আমার সঙ্গে দেখা, আমি কাঞ্চনবাগের পুকুরে জল আনিতে গিয়া দেখি ঘাটে একজন সন্ন্যাসী বসে আছে। কে আর বল সন্ন্যাসীর দিকে ফিরে চায়, আমি কলসী হাতে জলে নামছি এমন সময় সন্ন্যাসী আমায় ডেকে বলিলেন 'কাদম্বিনি আমায় তোমরা চিনিতে পার?' আমি অবাক্ হয়ে তাঁর মুখ দেখিতে লাগিলাম, মনে হতে লাগিল ঠিক যেন আমাদের রাজকুমারের মত, কিন্তু তিনি ত নাই। তার পর তিনি আমার মনের কথা বুঝিতে পেরে হাসিমুখে বলিলেন, 'তবে আমায় আর বুঝি চেনা যায় না।' সে হাসি দেখিবামাত্র আর আমার সন্দেহ রহিল না; আমি কাঁদিয়া উঠিলাম, গলায় কাপড় দিয়ে প্রণাম করে যোড় হাতে বলিলাম, আর এখানে কেন? তিনি বলিলেন, 'আমার বিলম্ব আছে;' আমি বলিলাম যে, তবে এই সময় বৌ-রাণীকে খবর দিই গে, তিনি সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে বলিলেন, 'তিনি নাকি এখন বড় বিজ্ঞ হয়েছেন? বিজ্ঞবতীকে একবার জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক যে কোন্ বিজ্ঞতার দরুণ

তিনি জীবিত স্বামীর শ্রাদ্ধ করেছেন।' তা আমি আর কোন কথার উত্তর না করে ঘাটের উপর কলসী রেখে একেবারে ছুটে এসেছি; বাড়ীও যাই নাই।"

এই সম্বাদের পর আমার মহলে আহ্লাদের ঢেউ উঠে গেল, চারিদিকে সকলে ছুটাছুটি করে বাড়ী পরিষ্কার করিতে লাগিল। আমি নির্জ্জনে গিয়ে কাঁদিতে লাগিলাম, কেন কাঁদিলাম তাহা জানি না, অনেকক্ষণ ধরে কাঁদিলাম। তার পর সেখানে দাসীরা আমার চুল বাঁধিতে গেল, আমি বারণ করিলাম না, তার পর তাহারা যখন আমায় অলঙ্কার পরায়, তখন আমি বলিলাম, যে এখন রাখ তিনি এসে আমায় আপনি পরাইয়া দিবেন, দাসীরা বলিল, "সে কি কথা! তিনি কি এসে আপনার এই বিধবার বেশ দেখিবেন?" আমি কোন কথা বলিলাম না। দাসীরা গহনা পরাইল। পরে তিনি এসে প্রথমে আমায় কি বলিবেন আমি তাঁকে কি বলিব এই কথাই মনে মনে কেবল ভাবিতে লাগিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হলো, তখনও তিনি এলেন না; মনে করিলাম বাপের কাছে এই দশবৎসরের কষ্টের কথা পরিচয় দিতেছেন; তার পর রাত্রি এক প্রহর হলে আমি একজনকে বলিলাম যে, তোমরা একজন রাজমহলে যাও সম্বাদ কি জানিয়া আইস। সে বলিল যাবার উপায় নাই, দরজা বন্ধ। দেওয়ানের হুকুমমত দরওয়ানেরা দরজার চাবি দিয়াছে; যারা রাজপুত্রের সম্বাদ এনেছিল, তারাও বাড়ী যাইতে পায় নাই। আমার বড় সন্দেহ হলো, কিছু বুঝিতে পারিলাম না। সমস্ত রাত আমরা সকলে বসে রহিলাম, কোন সম্বাদ পেলাম না, দরজাও কেহ খুলে দিল না। সে দিন গেল, তার পর দিন গেল, এইরূপে আটদিন গেল দরজার চাবি কেহ খুলে দিল না। এই আসেন এই আসেন মনে করে মানুষ কয়দিন বসে থাকিতে পারে! ক্রমে আমার শরীর অবসন্ন হয়ে পড়িল, আমি অজ্ঞান হলেম, জ্বরবিকার বলে আমার চিকিৎসা আরম্ভ হলো আমি কয়দিন অজ্ঞান ছিলাম তা জানি না, যখন আমার জ্ঞান হলো, তখন আমার কিছুই মনে ছিল না, ক্রমে ক্রমে সকল কথা মনে হলো, আমি শয্যায় পড়ে সকলের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতাম, কেহই আমায় কিছু বলিত না; জিজ্ঞাসা করিতে আমার সাহসও হইত না; একদিন আমি সাহস করে জিজ্ঞাসা করিলাম, যাহা শুনিলাম, তাতে আর এ প্রাণ রাখিতে ইচ্ছা হলো না। দুর্ভাগীর প্রাণ কি বাহির হয়? সেই আমি আজও বেঁচে আছি।

মাতঙ্গিনী। আপনি কি শুনিলেন?

জ্যোৎ। যে দিন তিনি ফিরে এলেন, ফাল্গুনবাগ হতে পিতাকে একখানি পত্র লিখিলেন, পত্র পাইবামাত্র রাজা ফাল্গুনবাগে ছুটিলেন, সেখানে

দিয়া পুত্রকে বুকে করে কত কাঁদিলেন, তার পর যখন আমার শাশুড়ীর মরণের কথা হতেছিল, তখন দেওয়ান্‌মহাশয় ফাল্গুনবাগে গেলেম; কিন্তু তিনি রাজপুত্রকে চিনিতে পারিলেন না। রাজা স্বয়ং চিনিয়াছেন, দেওয়ান্ চিনিতে পারুন বা না পারুন, তাহাতে আর কি ক্ষতি? রাজা বলিলেন, "এখন তবে বাড়ী চল;" রাজপুত্র রাজার সঙ্গে উঠিতেছিলেন, এমত সময় দেওয়ান্ বলিলেন, "একটা কথা আছে, ভ্রমক্রমে শ্রাদ্ধ করা হইয়াছে, এক্ষণে বাটী যাইবার পূর্ব্বে ভট্টাচার্য্যদের নিকট ব্যবস্থা লওয়া আবশ্যক; যদি তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে সেটা করা চাই।" রাজা বলিলেন, "এ কথা সঙ্গত বটে, আমি এখনই বাটী গিয়া ভট্টাচার্য্যদের ডাকাইতেছি।"

রাজা বাটী গেলে রাজপুত্রের সেবার নিমিত্ত কয়েকজন চাকর ফাল্গুনবাগে আসিল, তাহারা সকলেই নূতন লোক, রাজপুত্র তাহাদের কাহাকেও চেনেন না, তাহারাও কেহ রাজপুত্রকে চেনে না। রাজপুত্র তাহাদিগকে পুরাতন চাকরদের সম্বাদ একে একে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা বলিল, "পুরাতন চাকর আর রাজসরকারে কেহই নাই।" রাজপুত্র কিছু আশ্চর্য্য হলেন, কিছুই হেতু অনুভব করিতে পারিলেন না।

পরদিবস প্রাতে পেস্কার আসিয়া রাজপুত্রকে বলিল, "যদি আপনাকে রাজপুত্র বলিয়া গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে একটা প্রায়শ্চিত্ত করা আবশ্যক; ভট্টাচার্য্যেরা এইরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন; তাহার উদ্যোগ করিতে দুই একদিন বিলম্ব হইবে, অতএব যে পর্য্যন্ত তাহা না হয়, সে পর্য্যন্ত আপনি এই ফাল্গুনবাগে থাকিবেন। যাহাতে আপনার কোন কষ্ট না হয়, তাহার নিমিত্ত রাজাবাহাদুর আমাকে পাঠাইয়াছেন।" এই কথায় রাজপুত্র কিঞ্চিৎ বিরক্ত হলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "(যদি রাজপুত্র বলিয়া আপনাকে গ্রহণ করা হয়) এ কথা বলিতে কে তোমায় শিখাইয়া দিয়াছেন?" পেস্কার বলিল, "রাজাবাহাদুর নিজে, তিনি যেমন বলিতে বলিয়াছেন, আমি ঠিক সেইরূপ নিবেদন করিয়াছি।"

রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ পিতাকে একখানি পত্র লিখিয়া একজন চাকরের হস্তে দিয়া বলিলেন, "এই মুহূর্ত্তে রাজবাটী যাও, পত্রখানি রাজাবাহাদুরের হাতে দিবে, অন্যথা না হয়।" চাকর "যে আজ্ঞা" বলিয়া বিদায় হইল; পরে অনেক বিলম্বে উত্তর আসিল। উত্তরখানি দেওয়ান্ মহাশয়ের স্বহস্তের লেখা; কিন্তু তাহার শিরোভাগে রাজার দস্তখত ছিল। রাজপুত্র পত্রখানি দুই তিনবার পড়িলেন, তাহার প্রথমভাগে স্নেহপূর্ণ বাক্য, শেষভাগে বিপরীত কথা। রাজপুত্রের বড় সন্দেহ হইল; কিন্তু সে দিবস আর কিছু বলিলেন না। রাত্রে তাঁহার মনে হইল যে, তিনি দুই দিবস আসিয়া-

ছেন, গ্রামবাসীরা এ সম্বাদ অবশ্য পাইয়াছে; অথচ কেহ এপর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখিতে আসিল না, ইহার তাৎপর্য্য কি? সকলেই ত তাঁহাকে ভাল বাসিত। পরদিবস একজন চাকরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এ গ্রামের প্রধান প্রধান লোকদের চেন।" সে উত্তর করিল, "আমি কাহাকেও চিনি না।" রাজপুত্র বলিলেন, "কোন পুরাতন আমলাকে আমার নিকট ডাকিয়া আন।" সে উত্তর করিল, "পুরাতন আমলা কেহই আর রাজবাটীতে নাই।" রাজপুত্র আশ্চর্য্য হইলেন—সাবেক কোন চাকর নাই, দরওয়ান নাই, আমলাও নাই, তাৎপর্য্য কি!

পরদিন প্রাতে রাজার নিজ হাতের এক পত্র পৌঁছিল; তাহাতে লিখিত ছিল, "নগরবাসীদের মধ্যে রাষ্ট্র যে তুমি রাজপুত্র নহ, কোথাকার একজন বৈষ্ণবের সন্তান, আমার দুর্ভাগ্য শুনিয়া আমায় প্রতারণা করিতে আসিয়াছ; যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে তোমার চেষ্টা বৃথা; তোমার এখানে থাকাও বৃথা। আর যদি তুমি সত্যই আমার পুত্র হও, তাহা হইলে অনায়াসেই বুঝিতে পারিবে যে, এই অবস্থায় তোমায় গ্রহণ করিলে লোকের বিশ্বাস জন্মিবে, যে আমি বৈষ্ণবের সন্তান গ্রহণ করিয়াছি। যদি আমার পৌত্র হয়, লোকে তাহাকে বৈষ্ণবের পুত্র বলিবে, এ কলঙ্ক হইলে আমরা কেহই সুখী হব না; অতএব তুমি নিজেই বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবে। আমার বিবেচনার উপর নির্ভর করিও না; আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, তাহাতে পুত্রশোকাকুল, এ সময় সকলেই আমায় প্রতারণা করিতে পারে, তাহা না হইলে সে দিবস তুমি 'পুত্র' বলিয়া পরিচয় দিবামাত্র আমি তোমায় কেন বুকে করিয়া কাঁদিলাম? কিছুই দেখিলাম না, শুনিলাম না, কোন তদন্তও করিলাম না; আমি তখন একেবারে ভাবিলাম না যে, যে সন্তান মরিয়াছে, যাহার দেহ দাহ করাইয়াছি, যাহার শ্রাদ্ধ করাইয়াছি, সে সন্তান আবার কিরূপে ফিরে আসিবে? অতএব তুমি আর কোন চেষ্টা করিও না, এ পত্রের উত্তর আমি চাহি না, উত্তর দিলে সে পত্র আমার নিকট পৌঁছিবে না; আমার সহিত সাক্ষাৎ করাও বৃথা, তাহার চেষ্টা করিলেও সাক্ষাৎ হইবে না; বরং তাহাতে তোমার ক্ষতি হইবে।"

রাজপুত্র পত্র পাইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বসিয়া রহিলেন, তাহার পর হঠাৎ উঠিয়া বৈঠকখানা হইতে বাহির হইলেন; পেস্কার আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইতেছেন?" রাজপুত্র বলিলেন, "রাজবাটী।" পেস্কার বলিল, "যাইতে নিষেধ।" রাজপুত্র তাহা গ্রাহ্য না করিয়া চলিয়া গেলেন। পেস্কার তৎক্ষণাৎ একজন ঘোড়সওয়ার রাজবাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন; রাজপুত্র সেখানে আসিয়া দেখিলেন, রাজদ্বারের

সম্মুখে কয়েকজন বলিষ্ঠ সিপাহী যেন তাঁহারই নিমিত্ত দাঁড়াইয়া আছে; তাহাদের মধ্যে একজন অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি চান?" রাজপুত্র বলিলেন, "রাজদর্শন।" সিপাহী উত্তর করিল, "নিষেধ আছে।" তথাপি রাজপুত্র অগ্রসর হইলেন, সিপাহী পথরোধ করিল, রাজপুত্র তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া রাজবাটী প্রবেশ করিতে চেষ্টা পাইলেন, তখন আর সকল সিপাহী আসিয়া তাঁহাকে শৃগাল কুকুরের মত ধরিল, তিনি প্রথমে রাগে চীৎকার করিয়া উঠিলেন; সিপাহীরা তাঁহার হাত পা বাঁধিল, শেষ তিনি বলিলেন, "আর প্রয়োজন নাই, এখন আমি বুঝেছি।" সিপাহীরা ক্ষান্ত হইল। তিনি আপনার দ্বারে আপনার চাকরের হাতে বাঁধা পড়িলেন, সেইখানে পিতা বসে, ফিরেও চাহিলেন না। অদৃষ্ট মন্দ হলে পিতাও শত্রু হয়।

সিপাহীরা তাঁহাকে স্থানান্তরে লইয়া গেল। পথে বিস্তর লোক জমিল; সকলেই "জালরাজা" বলিয়া উপহাস করিতে লাগিল, কেহ কেহ গায়ে ধুলা দিতে লাগিল। রাজপুত্র আর মুখ তুলিলেন না।

আটদিনের পর আমার মহলের দরজা খুলে দিলে আমার দাসীরা গিয়া সম্বাদ আনিল; প্রথমেই সকল কথা জানিতে পারি নাই; ক্রমে জানিলাম। তখন আমি নিজে রাজমহলে গিয়া শ্বশুরের পায়ে কাঁদিয়া পড়িলাম। তিনি বলিলেন, "যাহা শুনিয়াছ সকল মিথ্যা। একজন দুষ্টলোক জাল সেজে এসেছিল, আমি তারে বাঁধিয়া দেশছাড়া করে দিয়াছি।" আমি বলিলাম, "আপনি তাঁকে নিজে চিনেছিলেন, তাঁরে পেয়ে কত কেঁদেছিলেন, তবে এরূপ কেন করিলেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমি চিনিলে কি হয়, আমি বৃদ্ধ, আমার ভ্রম হতে পারে; কিন্তু দেওয়ান্ তাঁরে বাল্যকালাবধি দেখে আসিতেছে, দেওয়ানের ভুল হবার ত কোন কথা নহে। যখন দেওয়ান্ বলিল "এ ব্যক্তি রাজপুত্র নহে" তখন অবশ্যই আমার সন্দেহ হইতে পারে।"

আমি বলিলাম দেওয়ান্ তাঁকে নিশ্চয়ই চিনেছিলেন, কেবল আপনাকে তাহা বলেন নাই। আপনি কি ভুলে গেছেন যে দেওয়ানের পুত্রকে আপনি পোষ্যপুত্র লয়েছেন? আপনার পুত্র ফিরে আসিলে দেওয়ানের অবশ্য ক্ষতি আছে, কাজেই দেওয়ান মহাশয় আপনার নিকট মিথ্যা বলিয়াছিলেন।

এই কথায় শ্বশুরমহাশয় অন্যমনস্ক হইলেন; ক্ষণবিলম্বে বলিলেন, "এমন হতে না; এত অধর্ম্ম আচরণ দেওয়ান্ কখনই করিবে না। আমি তারে চিরকাল প্রতিপালন করেছি, তার কত উপকার করেছি, আমার সে নিতান্ত অনুগত, সে কখন এমন অধর্ম্মাচরণ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি এসেছিল, তার আকার অবয়ব কতকটা আমার ছেলের সঙ্গে

মিলেছিল বটে, কিন্তু বর্ণ সে নয়, মুখের সে হাসি নয়, শরীর তেমন নরম নয়, আবার কতকগুলা দাড়ি আছে। তবে এরে দেখিলে তারে মনে পড়ে বটে। কাজেই দেওয়ানের কোন দোষ ছিল না। —কিন্তু আমার এক কথা আছে, দেওয়ানের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে যখন প্রথম আমার সন্দেহ উপস্থিত হয়, তখন আমি তাহারে বলিয়াছিলাম 'আর একবার আমি নিজে গিয়া সন্দেহভঞ্জন করে আসি।' কিন্তু দেওয়ানই তাহার বাধা দিয়াছিল।"

আমি সময় পাইয়া বলিলাম, "প্রথম সন্দেহও বোধ হয় দেওয়ান্ মহাশয়ই উথাপন করে থাকিবেন।" রাজা ভাবিয়া বলিলেন, "তাও সত্য, কিন্তু গ্রামশুদ্ধ লোক তাহাকে জালরাজা বলেছে, কেহই ত চিনিতে পারে নাই। সকলেই ত তারে দেখেছে।"

আমি উত্তর করিলাম, "গ্রামের কেহই ত তাঁকে দেখে নাই। ফাল্গুনবাগে কাহারও যাবার হুকুম ছিল না, দেওয়ান্ মহাশয় নিজের লোক তথায় রাখিয়াছিলেন, কাহাকেও তথায় যাইতে দেন নাই; যদি কেহ যাইতে পাইত, তাহা হইলে সকলেই তাঁরে চিনিত। তিনি যখন এসে পুষ্করিণীর ধারে বসেছিলেন, তখন কাদম্বিনী তাঁহাকে দেখিবামাত্র চিনেছিল। তিনি ত তখন তার কাছে "রাজপুত্র" বলে পরিচয় দেন নাই, তখন কাহারও কাছে নিজের পরিচয় দেন নাই, আপনাকেও তখন পত্র লেখেন নাই; কাদম্বিনী যেমন দেখিবা মাত্র তাঁকে চিনেছিল, দেখিলে আর সকলেও সেইমত চিনিত। আর কেহই না চিনুক, আপনি ত তাঁকে চিনেছিলেন। তবে যে লোকে জালরাজা বলে গোলযোগ করেছিল তাহা তাহাদের দোষ নয়; দেওয়ান মহাশয় লোকের কাছে যেমন পরিচয় দিয়াছিলেন, লোকও তেমনি বলাবলি করেছিল। কেহ ত ফাল্গুনবাগে প্রবেশ করিতে পায় নাই।"

রাজা অনেকক্ষণ অবধি নীরবে রহিলেন, তার পর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এতদিন আমায় এ সকল কথা বল নাই কেন?" আমি বলিলাম, "দেওয়ান্‌মহাশয় আমার মহলে আটদিন চাবি বন্ধ করে রাখিয়াছিলেন, কাজেই আমি কোন কথা বলিয়া পাঠাইতে পারি নাই।"

আমার শ্বশুর বলিলেন, "এখন দেওয়ানের ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিলাম, আমায় বৃদ্ধ পাইয়া আমার এই দুর্গতি করেছে, আমার সোণার চাঁদকে তাড়াইয়াছে। যাবার বেলা ছেলে আমার কত ব্যথা পেয়ে গেছে; আমায় না জানি কি ভাবিয়া গিয়াছে! আমি কি নরাধম! আমি এখনই তারে খুঁজিতে চারিদিকে লোক পাঠাইব।"

আমি বলিলাম, "এক্ষণে লোক পাঠান বৃথা, তাঁকে অনুসন্ধান করে এমন লোক আপনার আর একটিও নাই।

যাহারা আপনার লোক ছিল, তাহারা সকলেই একে একে ছেড়ে গিয়াছে; এখন যাহারা আছে, তাহারা কি আমলা, কি চাকর, কি সিপাহী, সকলেই দেওয়ানের লোক, দেওয়ানের ইচ্ছা না থাকিলে তারা কখনই অনুসন্ধান করিবে না।” রাজা বলিলেন, “বটে, আমার এমন অবস্থা করেছে! আমি এখনই দেওয়ানকে তাড়াইব।” এই বলিয়া মহা রাগত হয়ে বাহিরে গেলেন, আমিও আমার মহলে আসিলাম। রাজা তখনই দেওয়ান্‌কে বরখাস্ত করিয়া রাজবাটী হইতে চলিয়া যাইতে অনুমতি পাঠাইলেন। দেওয়ান্ রাজাজ্ঞা শুনিয়া প্রথমে ঈষৎ হাসিল, তার পর মুখ ভার করে যোড়হাতে রাজসভায় গিয়া এক-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “দাসের কি অপরাধ হয়েছে?” তাহার নম্রতা দেখে রাজার কিঞ্চিৎ রাগ কমিল। রাজা বলিলেন, “তুমি ষড়যন্ত্র করে রাজপুত্রকে তাড়াইয়াছ, অতএব তুমি এই মুহূর্ত্তে আমার বাটী হইতে যাও। যদি রাজ-পুত্রকে তল্লাস করে পুনরায় আনিতে পার, তবেই আমার এখানে আবার তোমার স্থান হবে: নতুবা এই পর্য্যন্ত।” দেওয়ান্ রাজার পা ধরিয়া বলিল, “ক্ষমা করুন, আমার কোন অপরাধ নাই; আমি কোন ষড়যন্ত্র জানি না, তাহা হইলে অনেক কাল অবশ্য ধরা পড়িতাম। আমি বালককাল অবধি এই রাজসরকারে প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছি। আমি নিতান্ত অনুগত বলে সামান্য মুহুরীর পদ হইতে ক্রমে ক্রমে দেওয়ানের পদ পেয়েছি, এতদিন কখন ত আমার কলঙ্ক ছিল না। বোধ হয় এতদিনের পর আমি নষ্টচন্দ্র দেখে থাকিব, অথবা এতদিনের পর আমার কেহ শত্রু জুটে থাকিবে, নতুবা জানত আমি কোন অপরাধ করি নাই।” রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি আমার পুত্রবধূর দরজায় চাবি দিয়াছিলে কেন?” দেওয়ান্ তখন বুঝিল, যে আমার দ্বারা এই কাণ্ড হইয়াছে। দেওয়ান তখন যোড়হস্তে বলিল, “নির্জ্জন হইলে সে সকল কথা নিবেদন করিতে পারি।” রাজা নির্জ্জনে গেলে দেওয়ান বলিল, “সকল কথা আপনার সাক্ষাতে বলা উচিত নয়, কিন্তু কি করি বলিতে হই-তেছে। রাজবধূর চরিত্রসম্বন্ধে মহাশয় অবশ্য এত দিন কিছু শুনিয়া থাকিবেন, সে সকল কথা আমার বলা ভাল হয় না। সম্প্রতি তিনি নিজে পত্র লিখিয়া এই জালরাজাকে আনাইয়াছিলেন; ভদ্র ঘরে এই জন্যই স্ত্রীলোককে লেখাপড়া শিখায় না। আমি বিবেচনা করিলাম, যদি দুইজনে এই সময় চিঠি লেখালিখি চলে, তাহা হইলে শেষ ভয়ানক কলঙ্ক রটিবে; তাহাই আমি আপনাকে না জানাইয়া পত্রযাতায়াতের পথ বন্ধ করি-য়াছিলাম। বিশেষতঃ কাদম্বিনীনামে একজন স্ত্রীলোক মধ্যবর্ত্তিনী জুটিয়া ছিল। জালরাজা আসিয়াই তাহার দ্বারা প্রথম পত্র পাঠান, আমি সময়ে সময়ে

পাইয়া অন্দরের দরজায় চাবি দিয়াছিলাম। কাদম্বিনী ফিরিয়া যাইতে পায় নাই, কাজেই পত্রও চালাচালি হয় নাই। চাবি না দিলে বোধ হয় জালরাজার সঙ্গে তিনি চলিয়া যাইতেন, কেন না শেষ যখন জালরাজা দেখিলেন যে, তাঁহার শঠতা ধরা পড়েছে, তখন পেস্কারকে ডাকিয়া চুপি চুপি বলেন, "আমার ধনসম্পত্তি কিছুরই আর কাজ নাই, আমার স্ত্রীকে দিলেই আমি চলিয়া যাই। তিনি আমার সঙ্গে যাইতে সম্মত আছেন।"

রাজা পেস্কারকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করায় পেস্কারও তাহাই বলিল। আমি সেইদিন হইতে আর শ্বশুরবাটীতে স্থান পাইলাম না; তৎক্ষণাৎ দরজায় পাল্কী আসিল। বিদায়ের সময় শ্বশুরকে প্রণাম করিব বলিয়া এত জানাইলাম, শ্বশুর তাতে একেবারে কাণ দিলেন না, শেষ বলিয়া পাঠাইলেন, যে তিনি দুশ্চরিত্রার মুখদর্শন করেন না; আমি কাঁদিতে কাঁদিতে পাল্কীতে উঠিলাম। সেই অবধি আমার শ্বশুরবাড়ীর সম্বন্ধ ঘুচিয়া গিয়াছে।

মাতঙ্গিনী। আপনার কি বরদাস্ত।

জ্যোৎ। অভাগীর, বরদাস্ত চিরকালই আছে; যাহারা ভাগ্যবতী সুখের কোলে নিদ্রা যায়, তারাই একটুতে কাতর হয়। যাহার অদৃষ্ট মন্দ, তাহার বরদাস্ত আপনিই হয়।

মাতঙ্গিনী। যিনি এসেছিলেন, তিনি সত্যই কি রাজপুত্র?

জ্যোৎ। আমি তাঁরে ত তখন দেখি নাই। কাদম্বিনী দেখেছিল; সে কেনই বা মিথ্যা করে বলিবে?

মাতঙ্গিনী। তবে আপনি ত বিধবা নন?

জ্যোৎ। তিনি বেঁচে আছেন, আমি তাঁরে দেখেছি।

মালাচন্দন।

ইংরেজি কেতার সম্মান বাঙ্গালিরা বড় বুঝেন না, শীঘ্র বুঝিবেন এমনও বোধ হয় না। ইংলণ্ড ও বাঙ্গালা পরস্পর যেরূপ দূর, পরস্পরের ব্যবহারও সেইরূপ দূর। আমরা হাততালি দিয়া উপহাস করি, ইংরেজেরা হাততালি দিয়া "বাহবা" দেন। বৈপরীত্য বড় সামান্য নয়। আমাদের চক্ষে নতশির, নিম্নদৃষ্টি নম্রতার লক্ষণ, সাহেবদের চক্ষে তাহা অপরাধের অকাট্য প্রমাণ; তাঁহারা ভাবেন, 'যখন এই ব্যক্তি মুখ তুলিয়া চাহিল না, তখন ইহার বিরুদ্ধে আর প্রমাণের বাকি কি?' উভয় জাতির মনের গতি স্বতন্ত্র, এই জন্য ইংরেজেরা আমা-

দিগকে এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলেন না, আমরাও ইংরেজদের বুঝিলাম না। গবর্ণমেণ্ট আমাদের উপকার এবং উৎসাহের নিমিত্ত কতই কৌশল করিতেছেন, কিন্তু আমরা কেবল এই জন্যই তাহার অধিকাংশ বুঝিতে পারি না, তাহার অনেক গুলি গ্রহণ করি না। ফেলারাম বিশ্বাস "ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া" হইলেন, তাঁহার ভ্রাতা খেলারাম তাহা কিছুই বুঝিল না। ফেলারাম যদি নিজগ্রামে গেলেন, তথায় কেহই তাঁহার নূতন সম্মান অনুভব করিতে পারিল না; ফেলারাম কাজেই সুখী হইলেন না। "ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া" হওয়া অপেক্ষা ফেলারাম যদি কোথায়ও মালাচন্দন পাইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় তিনি অধিক সুখী হইতেন; কেননা সে সম্মান লোকে দেখিতে পায়, আত্মীয়স্বজনে বুঝিতে পারে। যে শ্রেষ্ঠ, যে সর্ব্বপ্রধান, কেবল সেই মালাচন্দন পায়; যখন শত শত লোক একত্র সমবেত হয়, তখন সর্ব্বসম্মুখে সর্ব্বপ্রধানকে মালাচন্দন দিয়া সম্মান করা হয়। ক্রিয়াকলাপ উপলক্ষে লোকে এইরূপে সর্ব্বপ্রধানকে সর্ব্বদা সম্মান করিয়া থাকে। সেখানে ফেলারাম শর্ম্মা—ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়া—বসিয়া থাকুন, লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসাও করিবে না; মালাচন্দন দিবার সময় তাঁহার দিকে কেহ চাহিয়াও দেখিবে না। তবে সমাজে "ষ্টার অব্ ইণ্ডিয়ার" সম্মান কই?

এই জন্য বলি গুণবানের মান প্রচার করিবার জন্য যে বিলাতী পদ্ধতি ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় ভাল খাটিতেছে না। নামের পরে নাইট কম্পানিয়ান প্রভৃতি সেকেলে কথা যুড়িয়া দেওয়া হইতেছে, কিন্তু সে যোড়া দেওয়া কয়টা লোক দেখিতে পাইতেছে কিম্বা জানিতে বা বুঝিতে পারিতেছে?

"ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" বা ভারতনক্ষত্র যাঁহারা হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দুই একজন হয় ত জানেন, যে তাঁহাদের কিরণে ভারতের কোন অংশই আলোকময় হয় না, ভারতের অনেক লোকই তাঁহাদের আলোক দেখিতে পায় না। তাহাই তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিবেচনা করেন, যে লোকের উচিত, "ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" বলিয়া তাঁহাদের মালাচন্দন দেয়, অন্ততঃ গবর্ণমেণ্ট সে সম্বন্ধে কোন হুকুম দেন। পূর্ব্বকালের মালাচন্দন যে দেখিয়াছে, সেই জানে যে গুণের কিরূপ সমাদর এ দেশে সর্ব্বদা করা হইত; কাজেই ভারতনক্ষত্রের মনে মালাচন্দনের জন্য লোভ হইতে পারে।

কিন্তু মালাচন্দনের আর গৌরব নাই। যে অবধি বাঙ্গালির দুরদৃষ্ট আরম্ভ হইয়াছে, সেই অবধি ভালমন্দ বিচার করিবার আর আমাদের শক্তি নাই। কাহাকে পূজা করি, কাহাকে সম্মান করি, কাহাকে আদর্শ করি, এ সকলের আর কিছুই ঠিকানা নাই। বোধ হয় সম্মানোপযোগী লোক বাঙ্গালায় থাকিলে

বাঙ্গালার দুর্দ্দশা আরম্ভ হইত না। সম্মানোপযোগী লোক গিয়াছে কিন্তু তাঁহাদের বংশ আছে, কাজেই বংশপূজা আরম্ভ হইয়াছে, কুলীনের বংশোদ্ভব বলিয়া অনেক 'জড়' মালাচন্দন পাইতেছে, ফল আরও মন্দ দাঁড়াইয়াছে। ভাল আরম্ভ হইলে যেমন ক্রমেই আরও ভাল হইতে থাকে, মন্দ সম্বন্ধেও সেইরূপ; একবার মন্দ আরম্ভ হইলে ক্রমে সেই মন্দই বাড়িতে থাকে; স্বভাবের নিয়মই এই। যখন জন্তুবৎ সামান্য ব্যক্তিরা কুলগৌরবে পূজা হইল, তখন বাঙ্গালায় রুচি আরও মন্দ হইতে লাগিল; ব্যক্তিগত গুণ আর সমাজে লক্ষ্য হইল না, উৎসাহ পাইল না, বাঙ্গালায় আর টান ফিরিল না।

এক্ষণে এই ভুলের প্রতি দৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে; কেহ কেহ বলিতেছেন, কেবল কুলপূজা করা ভুল। তাঁহাদের বলিবার তাৎপর্য্য যে, যে পর্য্যন্ত বঙ্গসমাজে ব্যক্তিগতগুণের জন্য মালাচন্দন আরম্ভ না হইবে, সে পর্য্যন্ত বাঙ্গালার শনির দশা ঘুচিবে না। কুলপূজা এক কারণে ভাল, কিন্তু শত কারণে মন্দ। সৎকুলে সৎ জন্মিবার সম্ভাবনা সত্য; কিন্তু যেখানে তাহার বিপরীত ফল দেখা গিয়াছে, সেখানে আর কুলপূজা কেন?

কুলকিরণ অনেক প্রকারে বিকীর্ণ হইয়া থাকে, সেই কিরণে 'বুনিয়াদী' 'আধুনিক' এই সকল বিচারের জন্ম। কেহ ভাবেন, 'আমার পূর্ব্বপুরুষ প্রথম সৃষ্টি হয়, আর সকলের পূর্ব্বপুরুষ পরে সৃষ্টি হইয়াছে; তাই আমি বুনিয়াদী।' আবার কেহ ভাবেন, তাঁহারও যে বুনিয়াদ, রামাবাগ্দীরও সেই বুনিয়াদ। যদি তাঁহার অপেক্ষা রামাবাগ্দীর বিশেষ গুণ থাকে, তবে রামাবাগ্দী তাঁহার নিকট মালাচন্দন পাইতে পারে। এইরূপ বিবেচনা বাঙ্গালায় ক্রমেই বিস্তার হইতেছে, কাজেই "ষ্টার অব ইণ্ডিয়ার" এক সময় মালাচন্দন পাইবার সম্ভাবনাও বাড়িতেছে।

যিনিই যাহাই বলুন, বোধ হয় মালাচন্দনের রীতি উঠিয়া যাওয়া ভাল নহে। যদি বিচার করিয়া মালাচন্দন দেওয়া হয়, তাহা হইলে উন্নতিই সম্ভব।

বঙ্গদর্শন।

সপ্তম বৎসর।

৭৮ সংখ্যা।

মুচিরামগুড়ের জীবনচরিত।

শ্রীদর্পনারায়ণ পুতিতুণ্ড প্রণীত।

প্রথম পরি[illegible]

মুচিরাম গুড়মহা[illegible] ত্র করিবার জন্য, [illegible] ণ করিয়াছিলেন [illegible] খে না। ইতি[illegible] কার বদমাইসি ক[illegible] দেশে ইতিহাসের ক[illegible] নচেৎ উচিত ব্যবস্থা [illegible]।

যশোদা দে[illegible] গর্ভে সাফলরাম গুড়ের ঔরসে তাঁহার জন্ম। ইহা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই; কেন না উচ্চবংশের [illegible] কিছুই বলিতে পারা গেল না। [illegible] ইহা বলা যাইতে পারে যে, তিনি [illegible]কুলোদ্ভব। গুড় শুনিয়া কেহ [illegible] না করেন যে তিনি মিষ্টবিশেষ [illegible]ত জন্মিয়াছিলেন।

[illegible]াফলরাম গুড় কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ [illegible]লেন। তাঁহার নিবাস সাধুভাষায় [মো]হনপল্লী অপর ভাষায় মোনাপাড়া। মোহনপল্লী ওরফে মোনাপাড়ায় কেবল ঘরকতক কৈবর্ত্তের বাস। গুড়মহাশয় এক ব্রাহ্মণ—যেমন এক চন্দ্র রজনী আলোকময়ী করেন, যেমন এক বিষ্ণুই পুরুষোত্তম, যেমন এক বার্ত্তাকুদগ্ধ গুড় মহাশয়ের অন্নরাশির উপর শোভা করিতেন, তেমনি সাফলরাম একা মোহনপল্লী উজ্জ্বল করিতেন। শ্রাদ্ধশান্তিতে কাঁচা কদলী আতপ তণ্ডুল এবং দক্ষিণা, ষষ্ঠী মাকালের পূজায় অন্নপ্রাশনাদিতে নারিকেল নাড়ু, ছোলা, কলা আদি তাঁহার লাভ হইত। সুতরাং যাজনক্রিয়ায় তাঁহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। তাঁহারই ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হইয়া মুচিরাম শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করিলেন।

জন্মগ্রহণের পর মুচিরাম দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলেন। দেখিয়া যশোদা, সেটা বালকের অসাধারণ পৌরুষের লক্ষণ বিবেচনা করিয়া, অতিশয় গর্ব্বা-

ষিতা হইলেন। যথাকালে মুচিরামের অন্নপ্রাশন হইল। নামকরণ হইল মুচিরাম, এত নগেন্দ্র গজেন্দ্র চন্দ্রভূষণ বিধুভূষণ থাকিতে তাঁহার মুচিরাম নাম হইল কেন তাহা আমি সবিশেষ জানি না, তবে দুষ্টলোকে বলিত যে, যশোদা দেবীর যৌবনকালে কোন কালো কোলো কোঁকড়া চুল নধরশরীর মুচিরাম দাসনামা কৈবর্ত্তপুত্র তাঁহার নয়নপথের পথিক হইয়াছিল, সেই অবধি মুচিরাম নামটি যশোদার কাণে মিষ্ট লাগিত।

যাহাই হউক যশোদা নাম রাখিলেন মুচিরাম। নাম পাইয়া মুচিরামশর্ম্মা দিনে দিনে বাড়িতে লাগিলেন। ক্রমে মা, "বাবা" "দু" "দে" ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করিতে শিখিলেন। তাঁহার অসাধারণধীশক্তির বলে মিছাকান্নায় এক বৎসর পার হইতে না হইতেই সুপণ্ডিত হইলেন। তিনবৎসর যাইতে না যাইতেই গুরুভোজনে দোষ উপস্থিত হইল এবং পাঁচবৎসর যাইতে না যাইতেই মহামতি মুচিরাম মাকে পিতৃ উচ্চারণ করিতে এবং বাপকে শালা বলিতে শিখিলেন। যশোদা কাঁদিয়া বলিতেন, এমন গুণের ছেলে বাঁচ্‌লে হয়।

পাঁচবৎসরে সাফলরাম গুড়মহাশয় কিছু গোলে পড়িলেন। যশোদা ঠাকুরাণীর সাধ, পাঁচবৎসরে পুত্রের হাতে খড়ি হয়। সর্ব্বনাশ! সাফলরামের তিনপুরুষের মধ্যে সে কাজ হয় নাই। মাগী বলে কি? যেদিন কথা পড়িল, সেদিন সাফলরামের নিদ্রা হইল না।

যমুনার জল উজান বহিতে পারে, তবু গৃহিণীর বাক্য নড়িতে পারে না। সুতরাং সাফলরাম হাতে খড়ির উদ্যোগ দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনক্রোশের মধ্যে পাঠশালা বা গুরুমহাশয় নাই। কে লেখা পড়া শিখাইবে? সাফলরাম বিষণ্ণবদনে বিনীতভাবে যশোদা দেবীর শ্রীপাদপদ্মে এই সম্বাদ সুনিবেদিত হইলেন। যশোদা বলিলেন, "ভাল তুমি কেন আপনিই হাতে খড়ি
দি শিখাও না।" সাফলরাম
এ বলিলেন, "হাঁ তা
অ জ্ঞান শিষ্যসেবক
যজ ই কি রান্না
হইঃ শাদা দেবীর
মনে রা পাতিলেবু
দিয়া "অধঃপেতে
মিন্সে—"এই ব পুত্রপ্রাণা য-
শোদা দেবী বিষণ্ণমনে লনয়নে পাতিলেবু দিয়া পান্তা ভাত খাইতে বসিলেন।

অগত্যা মুচিরাম অন্যান্য বিদ্যা অ সাম
সানুরাগ হইলেন। অন্যান্য বি
মধ্যে—"পরা অপরাচ"—গাছে
জলে ডোবা, এবং সন্দেশ চুরি। বৈ
যজমানদিগের কল্যাণে গুড়ের
সন্দেশের অভাব নাই। নারিকেলসন্দে
এবং অন্যান্য যে সকল জাতীয় সন্দে
শের সঙ্গে ছানার সাক্ষাৎ বা অসাক্ষা
কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই, যাহা সর্ব্বা

মুচিরামের ঘরে থাকিত, সে সকল মুচিরামের বিদ্যাভ্যাসের কারণ হইল। কৈবর্ত্তের ছেলেদের সঙ্গে মুচিরামের প্রত্যহ একটি নূতন কোন্দল হইত—শুনা গিয়াছে কৈবর্ত্তদিগের ঘরেও খাবার চুরি যাইত।

নবম বৎসরে মুচিরামের উপনয়ন হইল। তার পর সাফলরাম এক বৎসর প্রিয়তম পুত্রকে সন্ধ্যা আহ্নিক শিখাইলেন। একবৎসরে মুচিরাম সন্ধ্যা আহ্নিক শিখিয়াছিলেন কি না আমরা জানি না। কেন না প্রমাণাভাব। তার পর মুচিরাম কখন সন্ধ্যা আহ্নিক করেন নাই।

তার পর একদিন সাফলরাম গুড় অকস্মাৎ ওলাউঠারোগে প্রাণত্যাগ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যশোদার আর দিন যায় না। যজমানদিগের পৌরোহিত্য কে করে? কৈবর্ত্তেরা আর একঘর বামন আনিল। যশোদা অন্নকষ্টে—ধান ভানিতে আরম্ভ করিলেন।

যখন মুচিরামের বয়স দশবৎসর, কৈবর্ত্তেরা চাঁদা করিয়া একটা বারোইয়ারি পূজা করিল। যাত্রা দিবার জন্য বারোইয়ারি; কৈবর্ত্তেরা শস্তা দরে হারাণ অধিকারীকে তিনদিনের জন্য বায়না করিয়া আনিয়া, কলাগাছের উপর সরা জ্বালিয়া, তিনরাত্রি যাত্রা শুনিল। মুচিরাম এই প্রথম যাত্রা শুনিল। যাত্রার গান, যাত্রার গল্প অনেক শুনিয়াছিল—কিন্তু একটা আস্ত-যাত্রা, এই প্রথম শুনিল; চূড়া ধড়া ঠেঙ্গা লাঠিসহিত সাক্ষাৎ কৃষ্ণ এই প্রথম দেখিল। আহ্লাদ উছলিয়া উঠিল। নিশ্চিত সম্বাদ রাখি, যে পরদিন মুচিরাম, গালাগালি মারামারি বা চুরি বা মাতাকে প্রহার, এ সকলের কিছুই করে নাই।

মুচিরামের একটা গুণ ছিল, মুচিরাম সুকণ্ঠ। প্রথমদিন যাত্রা শুনিয়া বহুযত্নে একটা গানের মোহাড়াটা শিখিয়াছিল। পরদিন প্রভাত হইতে মাঠে মাঠে সেই গান গাইয়া ফিরিতে লাগিল। দৈবাৎ হারাণ অধিকারী লোটা হাতে, পুষ্করিণীতে হস্তমুখপ্রক্ষালনাদির অনুরোধে যাইতেছিলেন—প্রভাতবায়ুপরিচালিত হইয়া মুচিরামের সুস্বর অধিকারীমহাশয়ের কাণের ভিতর গেল। কাণে যাইতে যাইতে মনের ভিতর গেল—মনের ভিতর গিয়া, কল্পনার সাহায্যে, টাকার সিন্দুকের ভিতরও প্রবেশ করিল। অধিকারীমহাশয়ের নিকট গলার আওয়াজ, টাকার আওয়াজে পরিণত হয়। সে দোষে অধিকারীমহাশয় একা দোষী নহেন—জিজ্ঞাসা করিলে অনেক উকীলমহাশয়েরা ইহার কিছু নিগূঢ় তত্ত্ব বলিয়া দিতে পারিবেন। তাঁহাদের কাছেও

গলার আওয়াজ টাকার আওয়াজে পরিণত হয়। উকীলবাবুদেরই বা দোষ কি—Glorious British Constitution!—হায়! গলাবাজি সার!

অধিকারীমহাশয়—মানুষের সঙ্গে প্রেম করেন না—ব্রিটিষ পার্লিমেণ্টের মত এবঞ্চ কুরঙ্গিনীসদৃশ মনুষ্যকণ্ঠেই মুগ্ধ—অতএব তিনি হাত নাড়িয়া মুচিরামকে ডাকিলেন। মুচিরাম আসিল। তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন,

"তুমি আমার যাত্রার দলে থাকিবে?"

মুচিরাম আহ্লাদে আটখানা। মাকে জিজ্ঞাসার অপেক্ষা রাখিল না—তখনই সঙ্গে যায়। কিন্তু অধিকারী মনে করিল যে, পরের ছেলে না বলিয়া লইয়া যাওয়া কিছু নয়। অতএব মুচিরামকে সঙ্গে করিয়া তাহার মার নিকট গেল।

শুনিয়া যশোদা বড় কাঁদা কাটা আরম্ভ করিল—সবে একটি ছেলে—আর কেহ নাই—কি প্রকারে ছাড়িয়া দিবে? এদিকে আবার অন্ন জুটে না—যদি একটা খাবার উপায় হইতেছে—কেমন করিয়াই বা না বলেন? বিধাতা কি আর এমন সুযোগ করিয়া দিবেন? আমি না দেখিতে পাই তবু ত মুচিরাম ভাল খাইবে, ভাল পরিবে। যশোদা যাত্রাওয়ালার দুঃখ জানিত না। অগত্যা পাঁচটাকা মাসিক বেতন রফা করিয়া যশোদা মুচিরামকে হারাণ অধিকারীর হস্তে সমর্পণ করিল। তার পর আছাড়িয়া পড়িয়া স্বামীর জন্য কাঁদিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মুচিরাম অল্পদিনেই দেখিল যে যাত্রাওয়ালার জীবন সুখের নয়। যাত্রাওয়ালা কেবল কোকিলের মত গান করিয়া ডালে ডালে মুকুলভোজন করিয়া বেড়ায় না। অল্পদিনে মুচিরামের শরীর শীর্ণ হইল। এ গ্রাম ও গ্রাম ছুটাছুটি করিতে করিতে সকল দিন আহার হয় না; রাত্রি জাগিয়া প্রাণ ওষ্ঠাগত; চুলের ভারে মাথায় উকুনে ঘা করিল; গায়ে খড়ি উড়িতে লাগিল; অধিকারীর কাণমলায় কাণমলায় দুই কাণে ঘা হইল। শুধু তাই নয়; অধিকারীমহাশয়ের পা টিপিতে হয়, তাঁকে বাতাস করিতে হয়, তামাক সাজিতে হয়, আরও অনেক রকম দাসত্ব করিতে হয়। অল্প দিনেই মুচিরামের সোনার মেঘ বাষ্পরাশিতে পরিণত হইল।

মুচিরামের আরও দুর্ভাগ্য এই যে, বুদ্ধিটা বড় তীক্ষ্ণ নহে। গীতের তাল যে, পুষ্করিণীতীরস্থ দীর্ঘবৃক্ষে ফলে না, ইহা বুঝিতে তাঁহার বহুকাল গেল। ফলে তালিমের সময়ে তালের কথা পড়িলে, মুচিরাম অন্যমনস্ক হইত—মনে পড়িত, মা কেমন তালের বড়া করে!—মুচিরামের চক্ষু দিয়া এবং রসনা দিয়া জল বহিয়া যাইত।

আবার গান মুখস্থ করা আরও দায়—কিছুতেই মুখস্থ হইত না—কাণমলায় কাণমলায় কাণ রাঙ্গা হইয়া গেল। সুতরাং আসরে গায়িবার সময়ে পিছন হইতে তাঁহাকে বলিয়া দিতে হইত। তাহাতে মধ্যে মধ্যে বড় গোল বাঁধিত—সকল সময়ে ঠিক শুনিতে বা বুঝিতে পারিত না। একদিন পিছন হইতে বলিয়া দিতেছে—

"নীরদকুন্তলা--লোচনচঞ্চলা
দধতি সুন্দররূপং"

মুচিরাম গায়িল—"নীরদ কুন্তলা—" থামিল—আবার পিছন হইতে বলিল, "লোচনচঞ্চলা"—মুচিরাম ভাবিয়া চিন্তিয়া গায়িল "লুচি চিনি ছোলা।" পিছন হইতে বলিয়া দিল "দধতি সুন্দর রূপং"—মুচিরাম না বুঝিয়া গায়িল "দধিতে সন্দেশ রূপং।" সেদিন আর গায়িতে পাইল না।

মুচিরামকে কৃষ্ণ সাজিতে হইত—কিন্তু কৃষ্ণের বক্তব্য সকল তাহাকে পিছন হইতে বলিয়া দিতে হইত—কেবল "আ—বা—আ—বা ধবলী"টি মুখস্থ ছিল। একদিন মানভঞ্জন যাত্রা হইতেছে—পিছন হইতে মুচিরামকে বক্তৃতা শিখাইয়া দিতেছে। কৃষ্ণকে বলিতে হইবে "মানময়ি রাধে! একবার বদন তুলে কথা কও।" মুচিরাম সবটা শুনিতে না পাইয়া কতকদূর বলিল, "মানময়ি রাধে একবার বদন তুলে—" সেই সময়ে বেহালাওয়ালা মৃদঙ্গীর হাতে তামাকের কল্কে দিয়া বলিতেছিল "গুড়ুক খাও—" শুনিয়া মুচিরাম বলিল "রাধে—একবার বদন তুলে—গুড়ুক খাও।" হাসির চোটে যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

মুচিরাম প্রথমে বুঝিতে পারিল না—হাসি কিসের,--যাত্রা ভাঙ্গিল কেন? কিন্তু যখন দেখিল অধিকারী সাজঘরে আসিয়া একগাছা বাঁক সাপটিয়া ধরিয়া, তাহার দিকে ধাবমান হইলেন, তখন মুচিরাম হঠাৎ বুঝিল, যে এই বাঁক তাঁহার পৃষ্ঠদেশে অবতীর্ণ হইবার কিছু গুরুতর সম্ভাবনা—অতএব কথিত পৃষ্ঠদেশ স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া আশু প্রয়োজন। এই ভাবিয়া মুচিরাম অকস্মাৎ নিষ্ক্রান্ত হইয়া নৈশ অন্ধকারে অন্তর্হিত হইল।

অধিকারীমহাশয় বাঁকহস্তে তৎপশ্চাৎ নিষ্ক্রান্ত হইয়া, মুচিরামকে না দেখিতে পাইয়া, তাহার ও তাহার পিতা পিতামহ মাতা ও ভগিনীর নানাবিধ অযশ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মুচিরামও এক বৃক্ষান্তরালে থাকিয়া অস্ফুটস্বরে অধিকারীমহাশয়ের পিতৃমাতৃসম্বন্ধে তদ্রূপ অপবাদ রটনা করিতে লাগিল। অধিকারী মুচিরামের সন্ধান না পাইয়া সাজঘরে গিয়া, বেশত্যাগ করিয়া, দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন। দেখিয়া মুচিরাম বৃক্ষচ্ছায়া ত্যাগ করিয়া, রুদ্ধদ্বারসমীপে দাঁড়াইয়া অধিকারীকে নানাবিধ অবক্তব্য কদর্য্য ভাষায় মনে মনে

সম্বোধন করিতে লাগিল : এবং উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ উত্থিত করিয়া তাঁহাকে কদলী ভোজনের অনুমতি করিল। তৎপরে রুদ্ধকবাটকে, বা কবাটের অন্তরালস্থিত অধিকারীর বদনচন্দ্রকে একটি লাথি দেখাইয়া, মুচিরাম ঠাকুরবাড়ীর মন্দিরের রোয়াকে গিয়া শয়ন করিয়া রহিল।

প্রভাতে উঠিয়া অধিকারীমহাশয় গ্রামান্তরে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শুনিলেন মুচিরাম আইসে নাই—কেহ কেহ বলিল তাহাকে খুঁজিয়া আনিব? অধিকারীমহাশয় গালি দিয়া বলিলেন, "জুট্‌তে হয়, আপনি জুট্‌বে, এখন আমি খুঁজে বেড়াতে পারিনে।" দয়ালুচিত্ত বেহালাওয়ালা বলিল, "ছেলেমানুষ—যদি নাই জুট্‌তে পারে—আমি খুঁজে আনিব।" অধিকারী ধমকাইলেন—মনে মনে ইচ্ছা মুচিরামের হাত হইতে উদ্ধার পান, এবং সেই সঙ্গে তাহার পাওনা টাকাগুলি ফাকি দেন। বেহালাওয়ালা ভাবিল—মুচিরাম কোনরূপে জুটিবে। আর কিছু বলিল না।

যাত্রার দল চলিয়া গেল—মুচিরাম জুটিল না। রাত্রিজাগরণ—দেবালয়বরন্ডে সে অকাতরে নিদ্রা দিতেছিল। উঠিয়া দল চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া, কাঁদিতে আরম্ভ করিল। এমন বুদ্ধি নাই যে অধিকারী কোন পথে গিয়াছে, সন্ধান করিয়া সেই পথে যায়। কেবল কাঁদিতে লাগিল। পূজারিবামন অনুগ্রহ করিয়া বেলা তিনপ্রহরে দুইটি ঠাকুরের প্রসাদ খাইতে দিল। খাইয়া, মুচিরাম কান্নার দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ করিল। যত রাত্রি নিকট হইতে লাগিল, তত ভাবিতে লাগিল—আমি কেন পলাইলাম! আমি কেন দাঁড়াইয়া মার খাইলাম না!

দ্বিজ দর্পনারায়ণ বলে, এবার যখন বাঁক উঠিতে দেখিবে, পিঠ পাতিয়া দিও। তোমার গোষ্ঠীর বাপচৌদ্দপুরুষ, বুড়া সেনরাজার আমল হইতে কেবল পিঠ পাতিয়া দিয়াই আসিতেছে। তুমি পলাইবে কোথায়? এ সুসভ্যজাতের অধিকারীরা মুচিরাম দেখিলে বাঁকপেটাই করিয়া থাকে—মুচিরামেরা পিঠ পাতিয়াই দেয়। কেহ পলায় না—রাখাল ছাড়া কি গোরু থাকিতে পারে হে বাপু? ঘাস জলের প্রয়োজন হইলেই, তোমার যখন রাখাল ভিন্ন উপায় নাই তখন পাঁচনবাড়িকে প্রাতঃপ্রণাম করিয়া গোজন্ম সার্থক কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঈশানবাবু একজন সৎকুলোদ্ভূত কায়স্থ। অতি ক্ষুদ্র লোক—কেন না বেতন এক শত টাকা মাত্র—কোন জেলার ফৌজদারী আপিসের হেড কেরাণী! বাঙ্গালাদেশে মনুষ্যত্ব বেতনের ওজনে নির্ণীত হয়—কে কত বড় বাঁদর তার লেজ মাপিয়া ঠিক করিতে হয়। এমন অধঃ-

পতন আর কখন কোন দেশের হয় নাই। বন্দী, চরণশৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য দেখাইয়া বড়াই করে।

ঈশানবাবু ক্ষুদ্র ব্যক্তি—ল্যাজ খাটো, বানরত্বে খাটো—কিন্তু মনুষ্যত্বে নহে। যে গ্রামে হারাণ অধিকারী এই অপূর্ব্ব মানভঞ্জন যাত্রা করিয়াছিলেন, ঈশান বাবুর সেই গ্রামে বাস। যাত্রাটা যে সময়ে হইয়াছিল, সে সময়ে তিনি ছুটি লইয়া বাড়ীতে ছিলেন। যাত্রার ব্যাপার তিনি কিছু জানিতেন কি না বলিতে পারি না; যাত্রার পরদিন সন্ধ্যাকালে তিনি পথে বেড়াইতেছিলেন, দেখিলেন, একটি ছেলে—শুষ্কশরীর, দীর্ঘকেশ—অনুভবে যাত্রার দলের ছেলে—পথে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে!

ঈশানবাবু ছেলেটির হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কাঁদ্‌ছিস কেন বাবা?" ছেলে কথা কয় না। ঈশানবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তুমি কে?"

ছেলে বলিল, "আমি মুচিরাম।"

ঈশা। তুমি কাদের ছেলে?

মুচি। বামনদের।

ঈশা। কোন্ বামনদের?

মুচি। আমি গুড়েদের ছেলে।

ঈশা। তোমার বাড়ী কোথায়?

মুচি। আমাদের বাড়ী মোনাপাড়া।

ঈশা। সে কোথা?

তা ত মুচিরামের বিদ্যার মধ্যে নহে। যাই হৌক, ঈশানবাবু অল্পসময়ে মুচিরামের দুর্ঘটনা বুঝিয়া লইলেন। "তোমাকে বাড়ী পাঠাইয়া দিব" এই বলিয়া মুচিরামকে আপনার বাড়ী লইয়া গেলেন; মুচিরাম হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল। ঈশানবাবু তাহার আহারাদি ও অবস্থিতির উত্তম ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

কিন্তু মোনাপাড়ার ত কোন্ ঠিকানা হইল না। সুতরাং মুচিরাম ঈশানবাবুর গৃহে বাস করিতে লাগিল। সেখানে আহার পরিচ্ছদের ব্যবস্থা উত্তম, এবং কাণমলার অত্যন্তাভাব, দেখিয়া মুচিরামও বাড়ীর জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইল না।

এদিকে ঈশানবাবুর ছুটী ফুরাইল—সপরিবারে কর্ম্মস্থানে যাইবেন। অগত্যা মুচিরামও সঙ্গে চলিল। কর্ম্মস্থানে গিয়াও ঈশান মোনাপাড়ার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন সন্ধান পাইলেন না। অগত্যা মুচিরাম তাঁহার গলায় পড়িল। মুচিরামও, যেখানে আহারের ব্যবস্থা উত্তম, সেখানে গলায় পড়িতে নারাজ নহে—তবে ঈশানবাবুর একটা ব্যবস্থা মুচিরামের বড় ভাল লাগিল না। ঈশানবাবু বলিলেন, "বাপু, যদি গলায় পড়িলে তবে একটু লেখা পড়া শিখিতে হইবে।" ঈশানবাবু তাহাকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দিলেন।

এদিকে মুচিরামের মা অনেক দিন হইতে ছেলের কোন সম্বাদ না পাইয়া

পাড়ায় পাড়ায় বিস্তর কাঁদাকাটি করিয়া বেড়াইয়া শেষ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিল। আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া রুগ্ন হইল। রুগ্ন হইয়া মরিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এদিকে, যশোদানন্দন শ্রীশ্রীমুচিরাম শর্ম্মা—ঈশানমন্দিরে সুবিরাজমান—সম্পূর্ণরূপে মাতৃবিস্মৃত। যদি কখন মাকে মনে পড়িত তবে সে আহারের সময়—ঈশানবাবুর ঘরের প্রফুল্লমল্লিকাগরিভ সিদ্ধান্ন, দানাদার গব্যঘৃত, সুগন্ধি ঝোলে নিমগ্ন রোহিতমৎস্য, পৃথিবীর ন্যায় নিটোল গোলাকার সদ্যভর্জ্জিত লুচির রাশি—এই সকল পাতে পাইলে মুচিরাম মনে করিতেন, "মা বেটী কি ছাই-ই আমাকে খাওয়াইত!" সে সময়ে মাকে মনে পড়িত—অন্য সময়ে নহে।

মুচিরামের পাঠশালার লেখা পড়া সমাপ্ত হইল—অর্থাৎ গুরুমহাশয় বলিল, সমাপ্ত হইয়াছে। মুচিরামের কোন গুণ ছিল না এমত বলি না; তাহা হইলে এ ইতিহাস লিখিতে আমি প্রবৃত্ত হইতাম না। মুচিরামের কণ্ঠস্বর ভাল ছিল বলিয়াছি—গুণ নম্বর এক। গুণ নম্বর দুই, তাহার হস্তাক্ষর অতি সুন্দর হইল। আর কিছু হইল না। ঈশান বাবু মুচিরামকে ইংরেজি স্কুলে পাঠাইলেন।

মুচিরাম, ধেড়ে ছেলে, স্কুলে ঢুকিয়া বড় বিপদগ্রস্ত হইল। মাষ্টরেরা তামাসা করে, ছোট ছোট ছেলেরা খিল্‌খিল্ করিয়া হাসে। মুচিরাম রাগ করে কিন্তু পড়ে না। সুতরাং মাষ্টরেরা হারাণ অধিকারীর পথে গেলেন। আবার কাণমলায় কাণমলায় মুচিরামের কাণ রাঙ্গা হইয়া উঠিল। প্রথমে কাণমলা, তার পর বেত্রাঘাত মুষ্ট্যাঘাত, চপেটাঘাত, কীলাঘাত, এবং ঘুসাঘাত। ঈশান বাবুর ঘরের তপ্তলুচির জোরে মুচিরাম নির্ব্বিবাদে সব হজম করিল।

এইরূপে মুচিরাম, তপ্তলুচি ও বেত খাইয়া, স্কুলে পাঁচ সাত বৎসর কাটাইল। কিছু হইল না। ঈশানবাবু তাহাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইলেন। ঈশানবাবুর দয়ার শেষ নাই—মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি—মুচিরামের হাতের লেখাও ভাল—ঈশানবাবু মুচিরামের একটি দশ টাকার মুহুরিগিরি করিয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন "ঘুস যাস লইও না বাপু, তা হলে তাড়াইয়া দিব।" মুচিরাম শর্ম্মা প্রথম দিনেই একটা হুকুমের চোরাও নকল দিয়া আটগণ্ডা পয়সা হাত করিলেন, এবং সন্ধ্যার অল্পকাল পরেই, তাহা প্রতিবাসিনী কুলটাবিশেষের পাদপদ্মে উৎসর্গ করিলেন।

এদিকে ঈশানবাবুও প্রাচীন হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি ইহার পরেই পেন্সন লইয়া স্বকর্ম্ম হইতে অবসর হই-

লেন এবং মুচিরামকে পৃথক্ বাসা করিয়া দিয়া, সপরিবারে স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। মুচিরাম ঈশানবাবুকে একটু ভয় করিত—এক্ষণে তাহার পোয়া বারো পড়িয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পোয়া বারো—মুচিরাম জেলা লুঠিতে লাগিল। প্রথমে লোকের কাছে চাহিয়া চিন্তিয়া দুইচারি আনা লইত। তার পর দাঁও শিখিল। ফেলু সেখের ধানগুলি জমীদার জোর করিয়া কাটিয়া লইতে উদ্যত, সাহেব দয়া করিয়া পুলিষকে হুকুম দিলেন, ফেলুর সম্পত্তি রক্ষা করিবে। সাহেব হুকুম দিলেন, কিন্তু পুলিষের নামে পরওয়ানাখানি লেখা আর হয় না। পরওয়ানা লেখা মুচিরামের হাত। পরওয়ানা যাইতে যাইতে ধান থাকে না; ফেলু মুচিরামকে একটাকা, দুই টাকা, তিনটাকা, চারিটাকা, ক্রমে পাঁচটাকা স্বীকার করিল—তৎক্ষণাৎ পরওয়ানা বাহির হইল। তখন মাজিষ্ট্রেটেরা স্বহস্তে জোবানবন্দী লইতেন না—এক এক কোণে বসিয়া এক একজন মুহুরি ফিস্‌ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিত, আর যাহা ইচ্ছা তাহা লিখিত। সাক্ষীরা একরকম বলিত, মুচিরাম আর একরকম জোবানবন্দী লিখিতেন, মোকদ্দমা বুঝিয়া ফি সাক্ষপ্রতি চারিআনা, আটআনা, একটাকা পাইতেন। মোকদ্দমা বুঝিয়া মুচি দাঁও মারিতেন; অধিক টাকা পাইলে সব উল্টা লিখিতেন। এইরূপে নানা প্রকার ফিকির ফন্দীতে মুচিরাম অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন—তিনি একা নহে, সকলেই করিত—তবে মুচি কিছু অধিক নির্লজ্জ—কখন কখন লোকের টেঁক হইতে টাকা কাড়িয়া লইত।

যাই হৌক, মুচি শীঘ্রই বড়মানুষ হইয়া উঠিল—কোন্ মুচি না হয়?—অচিরাৎ সেই অকৃতনাম্নী প্রতিবাসিনী স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা হইল। মদ, গাঁজা, গুলি, চরস, আফিঙ্গ—যাহার নাম করিতে আছে, এবং যাহার নাম করিতে নাই—সকলই মুচিবাবুর গৃহকে অহর্নিশি আলোক ও ধূমময় করিতে লাগিল। মুচিরামেরও চেহারা ফিরিতে লাগিল—গালে মাস লাগিল—হাড় ঢাকিয়া আসিল—বর্ণ জাপান লেদার ছাড়িয়া দ্বিতীয় নাগরায় পৌঁছিল। পরিচ্ছদের বৈচিত্র জন্মিতে লাগিল—শাদা, কালো, নীল, জরদা, রাঙ্গা, গোলাপী প্রভৃতি নানা বর্ণের বস্ত্রে মুচিরাম সর্ব্বদা রঞ্জিত। রাত্রি দিন মাথায় তেড়িকাটা, অধরে তাম্বুলের রাগ—এবং কণ্ঠে নিধুর টপ্পা। সুতরাং মুচিরামের পোয়া বারো।

দোষের মধ্যে সাহেব বড় খিট্‌খিট্ করে। মুচিরাম একে ঘোরতর বোকা, কোন কর্ম্মই ভাল করিয়া করিতে পারিত না, তাহাতে আবার দুর্জ্জয় লোভ—সকল তাতে মুচিরাম গালি খাইত।

সাহেবটাও বড় বদরাগী—অনেক সময়ে মুচিরামকে কাগজ পত্র ছুড়িয়া মারিত। কখন খাইতে খাইতে সাহেব "রিপোর্ট" শুনিতেছে—সে সময়ে মুচিরামকে রুটি বিসকুট ছুড়িয়া মারিত। সাহেবের ভিতরে ভিতরে হৃদয়ে দয়া ছিল।—নচেৎ মুচিরামের চাকরী অধিককাল টিকিত না।

সৌভাগ্যক্রমে সে সাহেব বদলি হইয়া গেল—আর একজন আসিল। ইংলণ্ড হইতে আমাদিগের রক্ষণাবেক্ষণজন্য যে সকল রাজপুরুষ প্রেরিত হয়েন অনেকেই সুবুদ্ধি ও সুপণ্ডিত বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে এক একজন অতি নির্ব্বোধ ব্যক্তি উচ্চবেতন পাইবার জন্য প্রেরিত হইয়া থাকেন। এই সাহেবটি তাহারই একজন।

এই নূতন সাহেবটির নাম Gronger ham—লিখিবার সময়ে লোকে লিখিত গ্রঙ্গারহ্যাম—বলিবার সময়ে বলিত গঙ্গারাম সাহেব। গঙ্গারাম সাহেব মোকদ্দমা করিতে গিয়া, কেবল ডিসমিশ করিতেন। ইহাতে দুইটি সুবিধা ছিল—এক, এক ছত্র রায় লিখিলেই হইত, দ্বিতীয় আপীল নাই। অন্যান্য সকল কর্ম্মের ভার সেরেস্তাদার এবং হেড কেরাণীর উপর ছিল। যতদিন সাহেব ঐ জেলায় ছিলেন, একদিনের জন্য একখানি চিঠি স্বহস্তে মুশাবিদা করেন নাই—হেড কেরাণী সব করিত।

সাহেব প্রথম আসিয়া, মুচিরামের কালোকোলো নধর সুচিক্কণ শরীরটি দেখিয়া, এবং তাহার আভূমিপ্রণত ডবল সেলাম দেখিয়া একেবারে সিদ্ধান্ত করিলেন, যে আপিসের মধ্যে এই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত লোক। সে বিশ্বাস তাঁহার কিছুতেই গেল না। যাইবারও কোন কারণ ছিল না—কেন না কাজ কর্ম্মের তিনি খবর রাখিতেন না। একদিন আপিসের মীর মুন্সী, মিরজা গোলাম সর্ফদর খাঁ সাহেব, দুনিয়াদারি নামাফিক মনে করিয়া ফৌত করিলেন। সাহেব, পরদিনেই মুচিরামকে ডাকিয়া তৎপদে অভিষিক্ত করিলেন। মীর মুন্সীর বেতন কুড়িটাকা—কিন্তু বেতনে কি করে? পদটি রুধিরে পরিপ্লুত। অজরামরবৎপ্রাজ্ঞ মুচিরাম শর্ম্মা রুধিরসঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

দোষ কি? অজরামরবৎ প্রাজ্ঞ বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ। দুইটা একজনে পারে না—দি ওজিনিস্ হইতে দর্পনারায়ণ পূতিতুণ্ড পর্য্যন্ত কেহ পারিল না। মুচিরাম বিদ্যাচিন্তা করিতে সক্ষম নহেন—কোষ্ঠীতে লেখে নাই—অতএব বিষ্ণুশর্ম্মার উপদেশানুসারে মৃত্যুভয়রহিত হইয়া অর্থচিন্তায় প্রবৃত্ত। যদি সেই "হিতোপদেশ"গুলি অধীত হইবার যোগ্য হয়—যদি সে গ্রন্থ এই উনবিংশ শতাব্দীতেও পূজার যোগ্য হয়—তবে মুচিরামও প্রাজ্ঞ। আর এ দেশের সকল সকল মুচিই প্রাজ্ঞ।

বিষ্ণুশর্ম্মা ভারতবর্ষে মাকিয়াবেলি—

চাণক্য ভারতের রোশফুকেল। যাহারা এইরূপ গ্রন্থ বিদ্যালয়ে বালকদিগকে পড়াইবার নিয়ম করিয়াছে, দর্পনারায়ণ তাহাদিগকে পাইলে বেত্রাঘাত করিতে ইচ্ছুক আছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মুচিরাম দুইতিন বৎসর মীর মুন্সীগিরি করিল—তার পর কালেক্টরীর পেস্কারি খালি হইল। পেস্কারিতে বেতন পঞ্চাশ টাকা—আর উপার্জ্জনের ত কথাই নাই। মুচিরাম ভাবিল, কপাল ঠুকিয়া একখানা দরখাস্ত করিব।

তখন কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি হইত। সেখানে সে সময়ে হোম নামা এক সাহেব কালেক্টর ছিলেন। হোমসাহেবের মেজাজ মরজি কিছু বেতর। মুচিরামের আর কোন বুদ্ধি ছিল না—কিন্তু সাহেবের মেজাজ বুঝা বুদ্ধিটা ছিল; প্রায় বানরগোষ্ঠির সে বুদ্ধি থাকে।

দর্পনারায়ণ ভনে কে বানর? যে মেজাজ বুঝে না যাহার মেজাজ বুঝিতে হয়? যে কলা খায়, না যে কদলী প্রলোভন দেখায়?

মুচিরাম একখানি ইংরেজী দরখাস্ত লিখাইয়া লইল—মুচিরামের নিজবিদ্যা দরখাস্ত পর্য্যন্ত কুলায় না। যে দরখাস্ত লিখিল, মুচিরাম তাহাকে বলিয়া দিলেন, "দেখিও যেন ভাল ইংরেজি না হয়। আর যা হোক না হোক, দরখাস্তের ভিতর যেন গোটা কুড়ি "মাই লার্ড" আর "ইওর লার্ডশিপ" থাকে। লিপিকার সেই রকম দরখাস্ত লিখিয়া দিল। তখন, শ্রীমুচিরাম বেশভূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। আপনার চারখানির ঢিলা পায়জামা পরিত্যাগ করিয়া, থানের ধুতি শ্রীঅঙ্গে পরিধান করিলেন; চুড়িদার আস্তীন আল্লাকার চাপকান পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বুকফাঁক বন্ধকওয়ালা ঢিলে আস্তীন লাংক্লাথের চাপকান গ্রহণ করিলেন। লাটুদার পাগড়ি ফেলিয়া দিয়া, স্বহস্তে মাথায় বিড়া জড়াইলেন; এবং চাঁদনির আমদানি নূতন চকচকে জুতা ত্যাগ করিয়া চটিতে চারুচরণদ্বয় মণ্ডন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে গঙ্গারাম সাহেবকে হরিয়েক রকম সেলাম করিয়া, কাঁদো কাঁদো মুখ করিয়া, একখান সুপারিস চিঠি বাহির করিয়া লইয়াছিলেন। এইরূপ চিঠি, দরখাস্ত ও বিহিত সজ্জাসহিত সেই শ্রীমুচিরামচন্দ্র, যথায় হোমসাহেব এজলাষে বসিয়া ছুনিয়া জলুস করিতেছিলেন, তথায় গিয়া দর্শন দিলেন।

উচ্চটঙ্গে, রেল দেওয়া পিঁজরের ভিতর, হোমসাহেব এজলাষ করিতেছেন। চারিদিকে অনেক মাথায় পাগড়ি ও বসিয়াছে—লোকে কথা কহিলেই চাপরাশী বাবাজিউরা দাড়ি ঘুরাইয়া গালি দিতেছেন—সাহেব নখ কামড়াইতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে পার্শ্বস্থ কুকুরটিকে কোলে টানিয়া লইতেছেন। এক ফোঁটা গুড় পড়িলে যেমন সহস্র সহস্র

পিপীলিকা তাহা বেষ্টন করে, খালি চাকরীটির মালিক হোমসাহেবকে তেমনি উমেদওয়ার ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছে। সাহেব উমেদওয়ারদিগের দরখাস্ত শুনিতেছেন। অনেক বড় বড় ইংরেজিনবীশ আসিয়াছেন—সেকেলে কেঁদো কেঁদো স্কলার্শিপ হোল্ডর। সাহেব তাহাদিগকে এক এক কথায় বিদায় করিলেন। "I dare say you are well up in Shakspeare and Milton and Bacon and so forth. Unfortunately we don't want quotations from Shakspeare and Milton and Bacon in the office. So you can go, Baboo." অনেকে শামলা মাথায় দিয়া, চেন ঝুলাইয়া, পরিপাটী বেশ করিয়া আসিয়াছিলেন; সাহেব দৃষ্টিমাত্র তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। "You are very rich I see; I want a poor man who will work for his bread. You can go." শামলা চেনের দল, অভিমন্যুসম্মুখে কুরুসৈন্যের ন্যায় বিমুখ হইতে লাগিল। বাকি রহিল মুচিরাম, এবং তাঁহার সমকক্ষ জনকয়—বানর। সাহেব মুচিরামের দরখাস্ত পড়িলেন—হাসিয়া বলিলেন,

"Why do you call me, my Lord? I am not a Lord."

মুচিরাম যোড়হাতে হিন্দীতে বলিল,

"বান্দা কো মালুম থা কি হুজুর লার্ড ঘরানা হৈঁয়।"

এখন হোমসাহেবের সঙ্গে একটা লার্ড হোমের দূরসম্বন্ধ ছিল; সেই জন্য তাঁহার মনে বংশমর্য্যাদা সর্ব্বদা জাগরূক ছিল। মুচিরামের উত্তর শুনিয়া আবার হাসিয়া বলিলেন,

"হো সকতা; লার্ড ঘরানা হো সকতা; লার্ড ঘরনা হোনে সে হি লার্ড হোতা নেহি।"

সকলেই বুঝিল,যে মুচিরাম কার্য্য সিদ্ধ করিয়াছে। মুচিরাম যোড়হাতে প্রত্যুত্তর করিল,

"বান্দা লোক কে ওয়াস্তে হুজুর লার্ড হৈঁয়।"

সাহেব মুচিরামকে আর দুই চারিটা কথা জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাহাকেই পেস্কারিতে বহাল করিলেন।

Struggle for existence! Survival of the Fittest! মুচির দলই এ পৃথিবীতে চিরজয়ী।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মুচিরাম বাবু—এখন তিনি একটা ভারি রকম বাবু, এখন তাঁহাকে শুধু মুচিরাম বলা যাইতে পারে না—মুচিরাম বাবু পেস্কারি পাইয়া বড় ফাঁফরে পড়িলেন। বিদ্যাবুদ্ধিতে পেস্কারি পর্য্যন্ত কুলায় না—কাজ চলে কি প্রকারে? "ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়"—মুচিরামবাবুর বোঝা বাহিত হইল। ভজগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নামে একজন

তাইদনবীশ সেই কালেক্টরী আপিসে থাকে। ভজগোবিন্দ বারবৎসর তাইদ নবীশ আছে। সে বুদ্ধিমান্, কর্ম্মঠ কালেক্টরীর সকল কর্ম্ম কাজ বারবৎসর ধরিয়া শিখিয়াছে। কিন্তু মুরুব্বি নাই—ভাগ্য নাই—এ পর্য্যন্ত কিছু হয় নাই। তাহার বাসাখরচ চলে না। মুচিরাম তাহাকে অবলম্বন করিলেন। আপনার বাসায় লইয়া গিয়া রাখিলেন। ভজগোবিন্দ মুচিরামের বাসায় থাকে, খায় পরে, গৃহকর্ম্মের সহায়তা করে, রাত্রি কালে বাবুর ঘরে বাহিরে মোসাহেবী করে এবং আপিসের সমস্ত কাজ কর্ম্ম করিয়া দেয়। মুচিরাম তাহাকে টাকাটা সিকেটা দেওয়াইয়া দেন। ভজগোবিন্দের সাহায্যে মুচিরামের কর্ম্ম কাজ মাহেশের রথের মত গড়গড় করিয়া চলিল। হোম সাহেব অনেক প্রশংসা করিতেন। বিশেষ মুচিরাম বিশুদ্ধপ্রণালীতে সেলাম করিত, এবং "মাই লার্ড" এবং "ইয়র আনর" কিছুতেই ছাড়িত না।

মুচিরামবাবুর উপার্জ্জনের আর সীমা রহিল না। হাতে অনেক টাকা জমিয়া গেল। ভজগোবিন্দ বলিল, টাকা ফেলিয়া রাখিবার প্রয়োজন নাই—তালুক মুলুক করুন। মুচিরাম সম্মত হইলেন, কিন্তু যে যে জেলায় কর্ম্ম করে সে জেলায় বিষয় খরিদ নিষেধ। ভজগোবিন্দ বলিল যে বেনামীতে কিনুন। কাহার বেনামীতে? ভজগোবিন্দের ইচ্ছা ভজগোবিন্দের নামেই বিষয় খরিদ হয়, কিন্তু সাহস করিয়া বলিতে পারিল না। এ দিকে মুচিরাম কাহারও বাসায় গল্প শুনিয়া আসিলেন, যে স্ত্রীর অপেক্ষা আত্মীয় কেহ নাই। কথাটায় তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হইল কি না জানি না—কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন যে স্ত্রীর নামে বিষয় করাই বেনামীর শ্রেষ্ঠ। এই এখানকার দেবোত্তর। আগে লোকে বিষয় করিত ঠাকুরের নামে—এখন বিষয় করিতে হয় ঠাকুরুণের নামে। উভয় স্থলেই বিষয়কর্ত্তা "সেবাইৎ" মাত্র—পরম ভক্ত—পাদপদ্মে বিক্রীত। এই রূপ রাধাকান্ত জিউর স্থানে রাধামণি, শ্যামসুন্দরের স্থানে শ্যামাসুন্দরী দেবী মালিক হওয়ায় ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে জানি না—তবে একটা কথা বুঝা যায়। আগে মন্দিরে গেলেই সেবাইৎকে খাইতে হইত চরণতুলসী—এখন খাইতে হয় চরণ—পাপমুখে কি বলিব?

স্ত্রীর বেনামীতে বিষয় করা শ্রেয়ঃ ইহা মুচিরাম বুঝিলেন কিন্তু এই সঙ্কল্পে একটা সামান্য রকম বিঘ্ন উপস্থিত হইল—মুচিরামের স্ত্রী নাই। এপর্য্যন্ত তাঁহার বিবাহ করা হয় নাই—অনুকল্পের অভাব ছিল না। কিন্তু এস্থলে অনুকল্প চলিবে কি না তদ্বিষয়ে পেস্কার মহাশয় কিছু সন্দিহান হইলেন। ভজগোবিন্দের সঙ্গে কিছু বিচার হইল—কিন্তু ভজগোবিন্দ একপ্রকার বুঝাইয়া দিল যে এ স্থলে অনুকল্প চলিবে না। অতএব

মুচিরাম দারগ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কোন কুল পবিত্র করিবেন, তাহার অন্বেষণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে ভজগোবিন্দ জানাইল যে তাঁহার একটি অবিবাহিতা ভগিনী আছে—ভজগোবিন্দের পিতৃকুল উজ্জ্বল করায় ক্ষতি নাই। অতএব মুচিরাম একদিন সন্ধ্যার পর শুভলগ্নে মাথায় টোপর দিয়া, হাতে সূতা বাঁধিয়া, এবং পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া ভদ্রকালী নাম্নী, ভজগোবিন্দের সহোদরাকে সৌভাগ্যশালিনী করিলেন। তাহার পর হইতে ভদ্রকালীর নামে অনেক জমীদারী পত্তনী খরিদ হইতে লাগিল। ভদ্রকালী হঠাৎ জেলার মধ্যে একজন প্রধানা ভূম্যধিকারিণী হইয়া দাঁড়াইলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

ভদ্রকালীর দ্বাদশ বৎসর বয়সে বিবাহ হয়—মুচিরামের এমনই অদৃষ্ট—বিবাহের পর দুই বৎসরের মধ্যেই ভদ্রকালী চৌদ্দ বৎসরের হইল। চৌদ্দবৎসরের হইয়াই ভদ্রকালী ভজগোবিন্দের একটি চাকরির জন্য মুচিরামের উপর দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। সুতরাং মুচিরাম চেষ্টা চরিত্র করিয়া ভজগোবিন্দের একটি মুহুরিগিরি করিয়া দিলেন।

ইহাতে মুচিরাম কিছু বিপন্ন হইলেন। এক্ষণে ভজগোবিন্দের নিজের কাজ হইল—সে মনোযোগ দিয়া নিজের কাজ করে মুচিরামের কাজ করিয়া দিবার তাহার তত অবকাশ থাকে না। ভজগোবিন্দ সুপাত্র—শীঘ্রই হোম সাহেবের প্রিয়পাত্র হইল। মুচিরামের কাজের যে সকল ত্রুটি হইতে লাগিল, হোম সাহেব তাহা দেখিয়াও দেখিতেন না। আভূমিপ্রণত সেলাম এবং "মাই লার্ড" বুলির গুণে সে সকলের প্রতি অন্ধ হইয়া রহিলেন। মুচিরামের প্রতি তাঁহার দয়া অচলা রহিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই সময়ে হোমসাহেব বদলি হইয়া গেলেন, তাহার স্থানে ঋড সাহেব আসিলেন। ঋড অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি। অতি অল্প দিনেই বুঝিলেন—মুচিরাম একটা বৃক্ষভ্রষ্ট বানর—অকর্ম্মা অথচ ভারি রকমের ঘুষখোর। মুচিরামকে আপিস হইতে বহিষ্কৃত করা মনে স্থির করিলেন। কিন্তু ঋড সাহেব যেমন বিচক্ষণ তেমনি দয়াশীল ও ন্যায়বান্। মিছে ছুতাছলে কাহাকে অন্নহীন করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক; কাহাকে একেবারে অন্নহীন করিতে অনিচ্ছুক। মুচিরাম যে বিপুল ভূসম্পত্তি করিয়াছে—ঋড সাহেব তাহা জানিতে পারেন নাই। ঋড সাহেব মুচিরামকে দুইএকবার ইস্তেফা দিতে বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মুচিরাম চোখে জল আনিয়া দুই চারিবার "গরিব খানা বেগর মারা যায়েগা" বলাতে তিনি নিরস্ত হইয়াছিলেন। তার পর, তাহাকে পেসকারির তুল্য বেতনে আবকারির দারোগাই দিতে চাহিয়াছিলেন—অন্যান্য

মফস্বলি চাকরি করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন,—কিন্তু আবার মুচিরাম চোখে জল আনিয়া বলে, যে আমার শরীর ভাল নহে মফস্বলে গেলে মরিয়া যাইব—হুজুরের চরণের নিকট থাকিতে চাই। সুতরাং দয়ালুচিত্ত খড সাহেব নিরস্ত হইলেন। কিন্তু তাহাকে লইয়া আর কাজও চলে না। অগত্যা খড সাহেব মুচিরামকে ডিপুটি কালেক্টর করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিলেন। সেই সময়ে হোম সাহেব বাঙ্গালি আপিসে সেক্রেটরি ছিলেন—রিপোর্ট পৌঁছিবামাত্র মুচিরাম ডিপুটি বাহাদুরিতে নিযুক্ত হইলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

মুচিরামের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। তিনি পেস্কারিতে ঘুষ লইয়া অসংখ্য টাকা রোজগার করেন—আড়াইশত টাকার ডিপুটিগিরিতে তাঁহার কি হইবে। মুচিরাম সিদ্ধান্ত করিলেন—ডিপুটিগিরি অস্বীকার করিবেন। কিন্তু ভজগোবিন্দ বুঝাইলেন—যে অস্বীকার করিলে খড সাহেব নিশ্চয় বুঝিবে যে মুচিরাম ঘুষের লোভে পেস্কারি ছাড়িতেছে না—তাহা হইলে শীঘ্রই তাড়াইয়া দিবে। তখন দুইদিক্ যাইবে। অগত্যা মুচিরাম ডিপুটিগিরি স্বীকার করিলেন।

মুচিরাম ডিপুটি হইয়া প্রথম রুবকারী দস্তখতকালীন পড়িয়া দেখিলেন, লেখা আছে শ্রীযুক্ত বাবু মুচিরাম গুড় রায় বাহাদুর ডিপোটি কালেক্টর। প্রথমটা বড়ই আহ্লাদ হইল—কিন্তু শেষ কিছু লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। যে মুহুরি রুবকারী লিখিয়াছিল তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন "ও হে—'গুড়' টা নাই লিখিলে! শুধু মুচিরাম রায়বাহাদুর লেখায় ক্ষতি কি? কি জান, আমরা গুড় বটে, কিন্তু আমাদের খেতাব রায়। তবে যখন অবস্থা তেমন ছিল না, তখন রায় খেতাব আমরা লিখিতাম না। তা, এখন গুড়েও কাজ নাই—রায়েও কাজ নাই, শুধু মুচিরাম রায়বাহাদুর লিখিলেই হইবে।" মুহুরি ইঙ্গিত বুঝিল, হাকিমের মন সবাই রাখিতে চায়। সে মুহুরি দ্বিতীয় রুবকারীতে লিখিল, "বাবু মুচিরাম রায়, রায়বাহাদুর।" মুচিরাম দেখিয়া কিছু বলিলেন না, দস্তখত করিয়া দিলেন। সেই অবধি মুচিরাম "রায়" চলিতে লাগিল; কেহ লিখিত "মুচিরাম রায়, রায়বাহাদুর," কেহ লিখিত "রায় মুচিরাম রায়বাহাদুর।" মুচিরামের একটা যন্ত্রণা ঘুচিল—গুড় পদবীতে তিনি বড় নারাজ ছিলেন, এখন সে জ্বালা গেল। তবে লোকে অসাক্ষাতে বলিত "গুড়ের পো"—অথবা "গুড়ে ডিপুটি।" আর ইস্কুলের ছেলেরা কবিতা করিয়া শুনাইয়া শুনাইয়া বলিত,

"গুড়ের কল্‌সীতে ডুবিয়ে হাত
বুঝতে নারি স্যর কি সাত?"

কেহ বলিত,

"সরা মালসার খুসি নই।

ও গুড় তোর নাগরী কই?"

মুচিরাম তাহাদের তাড়াইয়া মারিতে গেলেন, তাহারা তাঁহাকে মুখ ভেঙ্গাইয়া, উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ সন্দর্শন করাইয়া, উচ্চৈঃস্বরে কবিতা আওড়াইতে আওড়াইতে পলাইল। লাভের মধ্যে মুচিরাম লম্বা কোঁচা বাঁধিয়া আছাড় খাইলেন—ছেলেদের আনন্দের সীমা থাকিল না। শেষ মুচিরাম স্কুলের ছেলেদের মাসে মাসে কিছু সন্দেশ বরাদ্দ করিয়া দিয়া সে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন। কিন্তু আর একটা নূতন গোল হইল। শীতকালে খেজুরেগুড়ের সন্দেশ উঠিল—ময়রারা তাহার নাম দিল ডিপুটি মণ্ডা।

বাজারে যাহা হউক, সাহেবমহলে মুচিরামের বড় সুখ্যাতি হইল। বৎসর বৎসর রিপোর্ট হইতে লাগিল, এরূপ সুযোগ্য ডিপুটি আর নাই। এরূপ সুখ্যাতির কারণ—

প্রথম। মুচিরাম শুড় মূর্খ,কাজে কাজেই সাহেবদিগের প্রিয়।

দ্বিতীয়। মুচিরাম অতি সামান্য ইংরেজি জানিত; যাহারা ভাল ইংরেজি জানিত,তাহাদিগকে খাটো করিবার জন্য সাহেবেরা বলিতেন মুচিরাম ইংরেজিতে সুশিক্ষিত; অথচ পাণ্ডিত্যাভিমানী নহে। তাঁহারা বলিতেন, মুচিরাম তাঁহার স্বদেশবাসীদিগের দৃষ্টান্তস্থল।

তৃতীয়। মুচিরাম নির্ব্বিরোধী লোক ছিলেন; সাহেবেরা অপমান করিলেও সম্মান বোধ করিতেন। একবার তিনি কমিশানর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সাহেব তখন মেমসাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া গরমমেজাজ ছিলেন, এতেলা হইবা মাত্র বলিলেন, "নেকাল দেও শালা কো!" বাহির হইতে মুচিরাম শুনিতে পাইয়া সেইখান হইতে দুই হাতে সেলাম করিয়া বলিল, "বহুৎ খুব হজুর। হামারা বহিনকো খোদা জিতা রাখে।"

চতুর্থ। তোষামোদে মুচিরাম অদ্বিতীয়। তাহার পরিচয় অনেক পাওয়া গিয়াছে।

পঞ্চম। মুচিরাম ডিপুটির হাতে প্রায় হপ্তম পঞ্চমের কাজ ছিল—অন্য কাজ বড় ছিল না। হপ্তমপঞ্চমের মোকদ্দমায় একে সহজেই বড় বিচার আচারের প্রয়োজন হইত না—তাতে আবার মুচিরাম বিচার আচারের বড় ধার ধারিতেন না—চোখ বুজিয়া ডিক্রী দিতেন—নথির কাগজও বড় পড়িতেন না। সুতরাং সাফাবার দেখিয়া সাহেবেরা ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। জনরব যে মুচিরামের একেবারে হঠাৎ সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে পদবৃদ্ধি হইবে। কতকগুলা ছেকড়া ছোঁড়া শুনিয়া বলিল, "আরও পদবৃদ্ধি? ছটা পা হবে না কি?"

দুর্ভাগ্যক্রমে এই সময়ে চট্টগ্রামের কালেক্টরীতে কিছু গোলযোগ উপস্থিত হইল। গোল মিটাইবার জন্য সেখান-

কার কমিশ্যনর একজন ভারি বিচক্ষণ ডিপুটি কালেক্টর পাইবার প্রার্থনা করিলেন। বোর্ড বলিলেন—বিচক্ষণ ডিপুটি? সে ত মুচিরাম ভিন্ন আর কাহাকে দেখি না—তাহাকেই চট্টগ্রাম পাঠান হোক। গবর্ণমেণ্ট সেই কথা মঞ্জুর করিয়া মুচিরামকে চাটিগাঁ বদলি করিলেন।

সম্বাদ পাইয়া মুচিরাম বলিলেন, এইবার চাকরি ছাড়িতে হইল। তাঁহার শোনা ছিল, চাটিগাঁ গেলেই লোকে জ্বর প্লীহা হইয়া মরিয়া যায়। আরও শোনা ছিল যে চাটিগাঁ যাইতে সমুদ্র পার হইতে হয়—একদিন একরাত্রের পাড়ি। সুতরাং চাটিগাঁ যাওয়া কিপ্রকারে হইতে পারে? বিশেষ ভদ্রকালী—ভদ্রকালী এখন পূর্ণযৌবনা—সে বলিল, "আমি কোন মতেই চাটিগাঁ যাইব না—কি তোমায় যাইতে দিব না। তুমি যদি যাও, তবে আমি বিষ খাইব।" এই বলিয়া ভদ্রকালী একটা বড় খোরা লইয়া তেতুঁল গুলিতে বসিলেন। ভদ্রকালী তেঁতুল ভাল বাসিতেন—মুচিরাম বলিতেন "ওতে ভারি অম্ল হয়—ও বিষ!" তাই ভদ্রকালী তেঁতুল গুলিতে বসিলেন—মুচিরাম হাঁ হাঁ করিয়া নিষেধ করিতে লাগিলেন—ভদ্রকালী তাহা না শুনিয়া "বিষ খাইব" বলিয়া সেই তেঁতুলগোলায় লবণ ও সর্করা সংযোগ পূর্ব্বক আধসের চালের অন্ন মাখিয়া লইলেন। মুচিরাম অশ্রুপূর্ণ লোচনে শপথ করিলেন যে তিনি কখনই চাটিগাঁ যাইবেন না। ভদ্রকালী কিছুতেই শুনিল না—সমুদায় তেঁতুল মাখা ভাতগুলি খাইয়া বিষপান কার্য্য সমাধা করিল। মুচিরাম তৎক্ষণাৎ চাকরিতে ইস্তেফা পাঠাইয়া দিলেন।

স্থূল কথা, মুচিরামের জমীদারীর আয় এত বৃদ্ধি হইয়াছিল, যে ডিপুটি গিরির সামান্য বেতন, তাঁহার ধর্ত্তব্যের মধ্যে ছিল না। সুতরাং সহজে চাকরি ছাড়িয়া দিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

চাকরি ছাড়িয়া দিয়া মুচিরাম, ভদ্রকালীকে বলিলেন, "প্রিয়ে!" (তিনি সকের যাত্রার বাছা বাছা সম্বোধন পদগুলি ব্যবহার করিতেন) "প্রিয়ে! বিষয় যেমন আছে—তেমনি একটা বাড়ী নাই। একটা বাড়ীর মত বাড়ী করিলে হয় না?"

ভদ্র। দাদা বলে এখানে বড় বাড়ী করিলে, লোকে বল্‌বে ঘুষের টাকায় বড় মানুষ হয়েছে।

মুচি। তা, এখানেই বা বাড়ী করায় কাজ কি? এখানে বুকপুরে বড়মানুষি করা যাবে না। চল, আর কোথাও গিয়া বাস করি।

ভদ্রকালী সম্মত হইলেন, কিন্তু নিজ পিত্রালয় যে গ্রামে সেই গ্রামেই বাস করাই বিধেয় বলিয়া পরামর্শ দিলেন।

ফলে ভদ্রকালী আর কোন গ্রামের নাম বড় জানিতেন না।

মুচিরাম বিনীতভাবে ইহাতে কিছু আপত্তি করিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন যত বড় মানুষের বাড়ী কলিকাতায়—তিনিও বড়মানুষ, সুতরাং কলিকাতাই তাঁহার বাসযোগ্য এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। এখন ভদ্রকালীর এক মাতুল, একদা কালীঘাটে পূজা দিতে আসিয়া, এক কালে কলিকাতা বেড়াইয়া গিয়াছিলেন, এবং বাটী গিয়া গল্প করিয়াছিলেন, যে কলিকাতার কুলকামিনীগণ সজ্জিতা হইয়া রাজপথ আলোকিত করে। ভদ্রকালীর সেই অবধি কলিকাতাকে ভূতলস্থ স্বর্গ বলিয়া বোধ ছিল। তাঁহার অনেকগুলি অলঙ্কার হইয়াছে, পরিয়া সর্ব্বজননয়নপথবর্ত্তিনী হইতে পারিলে অলঙ্কারের সার্থকতা হয়—ভদ্রকালী তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় বাস করার প্রস্তাবে সম্মতা হইলেন।

তখন ভজগোবিন্দ ছুটি লইয়া, আগে কলিকাতায় বাড়ী কিনিতে আসিল। বাড়ীর দাম শুনিয়া, মুচিরামের বাবুগিরির সাধ কিছু কমিয়া আসিল—যাহা হউক, টাকার অভাব ছিল না,—অট্টালিকা ক্রীত হইল। যথাকালে মুচিরাম ও ভদ্রকালী কলিকাতায় আসিয়া, উপস্থিত হইয়া নূতন গৃহে বিরাজমান হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ভদ্রকালী কলিকাতায় আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কলিকাতার কুলকামিনী রাজপথ আলোকিত করা দূরে থাকুক, পল্লীগ্রাম অপেক্ষা কঠিনতর কারাগারে নিবদ্ধ। যাহারা রাজপথ কলুষিত করিয়া দাঁড়ায়, তাহাদিগের শ্রেণীভুক্ত হইবার ইচ্ছা ভদ্রকালী রাখেন না—সুতরাং তাঁহার কলিকাতায় আসা বৃথা হইল। বিশেষ দেখিলেন তাঁহার অঙ্গের অলঙ্কার দেখিয়া কলিকাতার স্ত্রীলোক হাসে। ভদ্রকালীর অলঙ্কারের গর্ব্ব ঘুচিয়া গেল।

মুচিরামের কলিকাতায় আসা বৃথা হইল না। তিনি প্রত্যহ গাড়ি করিয়া বাজার যাইতেন, এবং যাহা দেখিতেন তাহাই কিনিতেন। বাবুটি নূতন আমদানি দেখিয়া বিক্রেতৃগণ পাঁচটাকার জিনিসে দেড়শত টাকা হাঁকিত, এবং নিতান্তপক্ষে পঞ্চাশ টাকা না পাইলে ছাড়িত না। হঠাৎ মুচিরামের নাম বাজিয়া গেল—যে বাবুটি মধুচক্রবিশেষ। পাড়ার যত বানর মধু লুটিতে ছুটিল। জুয়াচোর, বদমাশ, মাতাল, লম্পট, নিষ্কর্ম্মা, ভাল ধুতি চাদর জুতা লাঠিতে অঙ্গপরিশোভিত করিয়া, চুল ফিরাইয়া, বাবুকে সম্ভাষণ করিতে আসিল। মুচিরাম তাহাদিগকে কলিকাতার বড় বড় বাবু মনে করিয়া তাহাদিকে বিশেষ

আদর করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহারাও আত্মীয়তা করিয়া তাঁহার বৈঠকখানায় আড্ডা করিল—তামাক পোড়ায়, খবরের কাগজ পড়ে, মদ খায়, তাস পেটে, বাজানা বাজায়, গান করে, পোলাও ধ্বংসায়, এবং বাবুর প্রয়োজনীয় এবং অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কিনিয়া আনে। টাকাটায় আপনারা বার আনা মুনাফা রাখে, বলে দাঁওয়ে সোওয়ে সিকি দামে কিনিয়াছি। উভয়পক্ষের সুখের সীমা রহিল না।

যে গলিতে মুচিরাম বাড়ী লইয়াছিলেন, সেই গলিতে একজন প্রথমশ্রেণীর বাটপাড় বাস করিতেন। তাঁহার নাম রামচন্দ্র দত্ত। রামচন্দ্র বাবু প্রথম শ্রেণীর বাটপাড়—একটু ব্রাণ্ডি বা এক খানা কাটলেটের লোভে কাহারও অনুগত্য করিবার লোক নহেন। তাঁহার ত্রিতল গৃহ, প্রস্তরমুকুর কাষ্ঠ কাচ কার্পেটাদিতে সকুসুম উদ্যানতুল্য রঞ্জিত; তাঁহার দরওয়াজায় অনেকগুলা দ্বারবান্ গালচাল্লা বাঁধিয়া সিদ্ধি ঘোঁটে; আস্তাবলে অনেকগুলি অশ্বের পদধ্বনি শুনা যায়—তিনখানা গাড়ি আছে, সোনাবাঁধা হুকা, হীরাবাঁধা গৃহিণী, হ্যাণ্ডনোটে বাঁধা ইংরেজ খাদক, এবং তাড়াবাঁধা 'কাগজ" —সকলই ছিল। তথাপি তিনি জুয়াচোর,—জুয়াচুরিতেই এ সকল হইয়াছিল। তিনি যখন শুনিলেন, টাকার বোঝা লইয়া একটা গ্রাম্য গর্দ্দভ পাড়ায় আসিয়া চরিয়া বেড়াইতেছে, তখন ভাবিলেন, যে গর্দ্দভের পৃষ্ঠহইতে টাকার বোঝাটি নামাইয়া লইয়া তাহার উপকার করিতে হইবে। আহা! অবোধ পশু! এত ভারি বোঝা বহিবে কিপ্রকারে—বোঝাটি নামাইয়া লইয়া তাহার উপকার করি।

প্রথম প্রয়োজন, মুচিরামের সঙ্গে আলাপ পরিচয়। রামচন্দ্র বাবু বড় লোক—মুচিরামের বাড়ী আগে যাইবেন না। ইঙ্গিত পাইয়া একজন অনুচর মুচিরামের কাণে তুলিয়া দিল, রামচন্দ্র বাবু কলিকাতার অতি প্রধান লোক, আর মুচিরামের প্রতিবাসী—মুচিরামের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য অতি ব্যস্ত। সুতরাং মুচিরাম গিয়া উপস্থিত।

এইরূপে উভয়ে উভয়ের নিকট পরিচিত হইলেন। উভয়ের উভয়ের বাড়ী যাতায়াত হইতে লাগিল। ঘন ঘন যাতায়াতে ক্রমে সৌহার্দ্দ বৃদ্ধি। রামচন্দ্র বাবুর সেই ইচ্ছা। তিনি চতুর, মুচিরাম নির্ব্বোধ; মুচি গ্রাম্য, তিনি নাগরিক। অল্পকালেই মুচিরামমৎস্য ফাঁদে পড়িল—রামচন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুতা করিল। রামচন্দ্র তাঁহার মুরুব্বি হইলেন—মুচিরামের নাগরিক জীবনযাত্রানির্ব্বাহে শিক্ষাগুরু হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

তিনি নাগরিক জীবননির্ব্বাহে মুচিরামের শিক্ষাগুরু—কলিকাতারূপ গোচারণ-

ভূমে তাঁহার রাখাল—কালীঘাট হইতে চিতপুর পর্য্যন্ত,যখন মুচিরাম বলদ সুখের গাড়ি টানিয়া যায়, রামবাবু তখন তাহার গাড়য়ান; সখের ছেকড়ায় এই খোঁড়া টাটুটি জুড়িয়া, রামচন্দ্র পাকা কোচমানের মত মিঠাকড়া চাবুক লাগাইতেন। তাহার হস্তে ক্রমে গ্রাম্য বানর সহুরে বানরে পরিণত হইল। কি গতিকের বানর,তাহা নিম্নোদ্ধৃত পত্রাংশ পড়িলে বুঝা যাইতে পারে। এই সময় তিনি ভজগোবিন্দকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে উদ্ধৃত করা গেল—

"তোমার পুত্রের বিবাহ শুনিয়া আহ্লাদ হইল। টাকার তেমন আনুকূল্য করিতে পারিলাম না—মাপ করিও। দুইখানা গাড়ি কিনিয়াছি—একখানা বেরুষ—একখানা ব্রোনবেরি। একটা আরবের যুড়িতে ২২০০ টাকা পড়িয়াছে। ছবিতে, আয়নাতে, কারপেটে অনেক টাকা পড়িয়া গিয়াছে। কলিকাতার এত খরচ তাহা জানিলে কখন আসিতাম না—সেখানে সাত সিকায়, কাপড় ও মজুরিসমেত আমার একটা চাপকান তৈয়ার হইত—এখানে একটা চাপকানে ৬৫ টাকা পড়িয়াছে। একসেট রূপার বাসনে অনেক টাকা লাগিয়াছে। থাল, বাটি, গেলাস, সে বাসনের কথা বলিতেছি না—এ সেট টেবিলের জন্য। বরকন্যাকে আমার হইয়া আশীর্ব্বাদ করিবে।"

এই হলো বানরামি নম্বর এক। তার পর, মুচিরাম, কলিকাতার যে কেহ একটু খ্যাতিযুক্ত, তাহারই বাড়ীতে, রামচন্দ্র বাবুর পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে আরম্ভ করিলেন। কোন নামজাদা বাবু তাহার বাড়ীতে আসিলে জন্মসার্থক মনে করিতেন। কিসে আসে সেই চেষ্টায় ফিরিতেন। এইরূপ আচরণে, রামবাবুর সাহায্যে, কলিকাতার সকল বর্দ্ধিষ্ণু লোকের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হইল। টাকার মান সর্ব্বত্র; মুচিরামের টাকা আছে; সুতরাং সকলেরই কাছে তাঁহার মান হইল।

তার পর মুচিরাম কলিকাতার ইংরেজ মহল আক্রমণ করিলেন। রামবাবুর পরিচয়ে যত ছোট বড় ইংরেজের বাড়ী যাতায়াত করিলেন। অনেক যায়গাতেই ঝাঁটা লাথি খাইলেন। কোন কোন স্থানে মিষ্ট কথা পাইলেন। অনেক স্থানেই একজন মাতালো জমিদার বলিয়া পরিচিত হইলেন।

তার পর ব্রিটিষ ইণ্ডিয়ান আসোসিয়েশ্যনে ঢুকিলেন। নাম লেখাইয়া বৎসর বৎসর টাকা দিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র বাবুর সঙ্গে প্রতি অধিবেশনে যাইতে আরম্ভ করিলেন। রামবাবু কথিত মহামহিম মহাসভার "একটী বড় কামান।" তিনি যখনই বড় কামান দাগিতে যাইতেন এই ছোট মুচিপিস্তলটি সঙ্গে লইয়া যাইতেন—সুতরাং পিস্তলটি ক্রমে মুখ খুলিয়া পুটপাট করিতে আরম্ভ করিল। মুচিরামও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভায় একজন

বক্তা হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বকিতেন মাথামুণ্ড, কিন্তু ছাপার বিজ্ঞাপনীতে যাহা বাহির হইত, সে আর এক প্রকার। মুচিরাম নিজে তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। যাহারা বুঝে, তাহারা পড়িয়া নিন্দা করিত না। সুতরাং মুচিরাম ক্রমে একজন প্রসিদ্ধ বক্তা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে লাগিলেন। যেখানে লোকে বড়লোক বলিয়া গণ্য হয়, মুচিরাম তাহার কোন যায়গায় যাইতেই ছাড়িত না। বেলবিডীরে গেলে বড় লোক বলিয়া গণ্য হয়, সুতরাং সে বেলবিডীরে যাইত। যাইতে যাইতে সে লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের নিকট সুপরিচিত হইল। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর তাহাকে একজন নম্র, নিরহঙ্কারী, নিরীহ লোক বলিয়া জানিলেন। জমীদারী সভার একজন নায়ক বলিয়া পূর্ব্বেই রামচন্দ্রের নিকট পরিচয় পাইয়া ছিলেন।

সম্প্রতি বাঙ্গাল কৌন্সিলে একটি পদ খালি হইল। একজন জমীদারী সভার অধিনায়ককে তাহাতে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, ইহাই লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর বাহাদুর স্থির করিলেন। বাছনি করিতে মনে মনে ভাবিলেন, "মুচিরামের ন্যায় এ পদের যোগ্য কে? নিরহঙ্কারী নিরীহ—ইংরেজি কহিতে ভাল পারে না—অতএব তাহা হইতে কার্য্যের কোন গোলযোগ উপস্থিত হইবে না। অতএব মুচিরামকে বাহাল করিব।"

অচিরাৎ অনরেবল বাবু মুচিরাম রায় বাঙ্গাল কৌন্সিলে আসন গ্রহণ করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বড় বাড়াবাড়িতে অনরেবল মুচিরাম রায়ের রুধির শুকাইয়া আসিল। ভজগোবিন্দ ফিকিরফন্দিতে অল্প দামে অধিক লাভের বিষয়গুলি কিনিয়া দিয়াছিলেন—তাহার কার্য্যদক্ষতায় ক্রীতসম্পত্তির আয় বাড়িয়াছিল—কিন্তু এখন তাহাতেও অনাটন হইয়া আসিল। দুই একখানি তালুক বাঁধা পড়িল—রামচন্দ্র বাবুর কাছে। রামচন্দ্র বাবুর সঙ্কল্প এত দিনে সিদ্ধ হইয়া আসিতেছিল—এই জন্য তিনি আত্মীয়তা করিয়া মুচিরামকে এতবড় বাবু করিয়া তুলিয়াছিলেন। রামচন্দ্র অর্দ্ধেক মূল্যে তালুকগুলি বাঁধা রাখিলেন—জানেন যে মুচিরাম কখনও শুধরাইতে পারিবে না—অর্দ্ধেক মূল্যে বিষয়গুলি তাঁহার হইবে। আরও তালুক বাঁধা পড়ে এমন গতিক হইয়া আসিল। এই সময়ে ভজগোবিন্দ আসিয়া উপস্থিত হইল। সে শুনিয়াছিল যে গবর্ণর প্রভৃতি বড় বড় সাহেব তাহার ভগিনীপতির হাতধরা—এই সুযোগে একটা বড় চাকরি যোটাইয়া লইতে হইবে—এই ভরসায় ছুটি লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। আসিয়া শুনিলেন মুচিরামের গতিক ভাল নহে। তাহার উদ্ধারের উপায় বলিয়া দিলেন।

বলিলেন, "মহাশয়, আপনি কখন তালুকে যান নাই। গেলেই কিছু পাওয়া যাইবে। তালুকে যান।"

মুচিরাম আনন্দিত হইল, ভাবিল, "তাই ত! এমন সোজা কথাটা আমার মনে আসিল না।" মুচিরাম খুশী হইয়া, ভজগোবিন্দের কথায় স্বীকৃত হইল।

চন্দনপুর নামে তালুক—সেইখানে বাবু গেলেন। প্রজাদিগের অবস্থা বড় ভাল। সে বৎসর নিকটবর্ত্তী স্থান সকলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত—কিন্তু সে মহলে কিছু না। কখন মুচিরাম প্রজাদিগের নিকট মাঙ্গন মাথট লয়েন নাই। মুচিরাম নির্ব্বিরোধী লোক—তাহাদের উপর কোন অত্যাচার করিতেন না। আজ ভজগোবিন্দের পরামর্শে স্বশরীরে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আমার কন্যার বিবাহ উপস্থিত—বড় দায়গ্রস্ত হইয়াছি, কিছু ভিক্ষা দাও।" প্রজারা দয়া করিল—প্রজা সুখে থাকিলে জমীদারকে সকল সময়ে দয়া করিতে প্রস্তুত। জমীদার আসিয়াছে সম্বাদ পাইয়া, পালে পালে প্রজা, টেঁকে টাকা লইয়া মুচিরাম দর্শনে আসিতে আরম্ভ করিল। মুচিরামের চেষ্ট টাকায় পরিপূর্ণ হইতে লাগিল, কিন্তু ইহাতে আর একদিকে, তাঁহার আর একপ্রকার সৌভাগ্যের উদয় হইল।

প্রজারা দলে দলে মুচিরামদর্শনে আসে—কোন দিন পঞ্চাশ, কোন দিন ষাট, কোন দিন আশী, কোন দিন একশত এইরূপ। যাহাদের বাড়ী নিকট তাহারা দর্শন করিয়া ফিরিয়া যায়, যাহাদের বাড়ী দূর, তাহারা দোকান হইতে খাদ্যসামগ্রী কিনিয়া একটা বাগানের ভিতর রাঁধিয়া বাড়িয়া খায়। মহালটি একে খুব বড়—মুচিরামের এত বড় জমীদারী আর নাই—তাহাতে গ্রামগুলির মধ্যে বিল খাল অনেক থাকায়, দুই চারিজন প্রজাকে প্রায় রাঁধিয়া খাইয়া যাইতে হইত। একদিন অনেক দূর হইতে প্রায় একশত প্রজা আসিয়াছে—তাহাদের বাড়ী একটা ভারি জলা পার; নিকাশ প্রকাশে, তাহাদের বেলা গেল; তাহারা বাড়ী ফিরিতে পারিল না। বাগানে রাঁধাবাড়া করিতে লাগিল। রাত্রি থাকিয়া প্রাতে যাত্রা করিবে। তাহারা যখন খাইতে বসিল, সেই সময়ে নিকটস্থ মাঠপার হইয়া, অশ্বযানে, একটি সাহেব যাইতেছিলেন।

সাহেবটির নাম মীন্‌ওয়েল্। তিনি ঐ জেলার প্রধান রাজপুরুষ—মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর। সাহেবটি ভাল লোক—ন্যায়বান্—হিতৈষী, এবং পরিশ্রমী। দোষের মধ্যে বুদ্ধিটা একটু ভোঁতা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সে বৎসর ঐ অঞ্চলে একটা দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল; সাহেব দুর্ভিক্ষ তদারকে বাহির হইয়াছিলেন। নিকটস্থ কোন গ্রামে তাঁহার তাম্বু পড়িয়াছিল—তিনি এখন অশ্বারোহণে তাম্বুতে যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে

দেখিতে পাইলেন, একটা বাগানের ভিতর কতকগুলা লোক ভোজন করিতেছে।

দেখিয়াই সিদ্ধান্ত করিলেন, ইহারা সকলে দুর্ভিক্ষপীড়িত উপবাসী দরিদ্র লোক, কোন বদান্য ব্যক্তি ইহাদের ভোজন করাইতেছে। সবিশেষ তত্ত্ব জানিবার জন্য, নিকটে একজন চাসাকে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন।

এখন সাহেবটি, লোক বড় ভাল হইলেও আত্মগরিমাবর্জ্জিত নহেন। তাঁহার মনে মনে শ্লাঘা ছিল যে, তিনি বাঙ্গালা বড় ভাল জানেন। সুতরাং চাসার সঙ্গে বাঙ্গালায় কথোপকথন আরম্ভ করিলেন।

সাহেব চাসাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"টোমাডিগের গ্‌ড়ামে* ডুর্‌ভাথ্‌থা কেমন আছে?"

চাসা ত জানে না ডুর্‌ভাথ্‌থা কাহাকে বলে। সে ফাঁফরে পড়িল। ডুর্‌ভাথ্‌থা কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম হইবে, ইহা একপ্রকার স্থির হইল। কিন্তু "কেমন আছে?" ইহার উত্তর কি দিবে? যদি বলে যে সে ব্যক্তিকে আমি চিনি না, তাহা হইলে সাহেব হয় ত, এক ঘা চাবুক দিবে, যদি বলে যে ভাল আছে, তাহা হইলে সাহেব হয় ত ডুর্‌ভাথ্‌থাকে ডাকিয়া আনিতে বলিবে; তাহা হইলে কি করিবে? চাসা ভাবিয়া চিন্তিয়া উত্তর করিল, "বেমার আছে।"

"বেমার—Sick?" সাহেব ভাবিতে লাগিলেন, "Well, there may much sickness without their being any scarcity—the fellow doesnot understand perhaps; I am afraid these people don't understand their own language—I say ডুর্‌ভাথ্‌থা কেমন আছে—অটিক আছে কিম্বা অল্প আছে?"

এখন চাসা কিছু ভাব পাইল। স্থির করিল যে এ যখন সাহেব, তবে অবশ্য হাকিম (সে দেশে নীলকর নাই) হাকিম যখন জিজ্ঞাসা করিতেছে যে ডুর্‌ভাথ্‌থা অধিক আছে কি অল্প আছে—তখন ডুর্‌ভাথ্‌থা একটা টেক্সের নাম না হইয়া যায় না। ভাবিল কই আমরা ত ডুর্‌ভাথ্‌থার টেক্স দিই না; কিন্তু যদি বলি যে আমাদের গ্রামে সে টেক্স নাই—তবে বেটা এখনই টেক্স বসাইয়া যাইবে। অতএব মিছা কথা বলাই ভাল। সাহেব পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"টোমাডের গ্‌ড়ামে ডুর্‌ভাথ্‌থা অধিক কিম্বা অল্প আছে?"

চাসা উত্তর করিল,

"হুজুর আমাদের গাঁয়ে ভারি ডুর্‌ভাথ্‌থা আছে।"

সাহেব ভাবিলেন, "Humph! I

* গ্রামে।　　† দুর্ভিক্ষ।

thought as much—" পরে বাগানে যে সকল লোক খাইতেছিল, তৎপ্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

" কে বোজন করিল ?" (উদ্দেশ্য " করাইল")

চাসা। প্রজারা ভোজন কোচ্ছে।

সাহেব, চটিয়া, " টাহা আমি জানে—they eat, that I see—but who pays ?—টাকা কাহাড় ?"

এখন সে চাসা জানে যে যত টাকা আসিতেছে, সকলই জমীদারের সিন্ধুকে যাইতেছে; সে নিজেও কিছু দিয়া আসিয়াছিল—অতএব এবার বিনা বিলম্বে উত্তর করিল,

" টাকা জমীদারের"

সাহেব। Ah ! there it is ; they do their duty—জমীদারের নাম কি?"

চাসা। মুচিরাম রায়।

সাহেব। কট ডিবস বোজন কড়িয়াছে ?

চাসা। তা ধর্ম্মাবতার প্রজারা রোজ রোজ আসে, খাওয়া দাওয়া করে।

সাহেব। এগ্‌ড়ামের নাম কি ?

চাসা। চন্নপুর।

সাহেব নোটবুক বাহির করিয়া তাহাতে পেন্সিলে লিখিলেন,

For Famine Report.

"Babu Muchiram Ray, Zemindar of Chinnapur—feeds every day alarge number of his ryots."

সাহেব তখন ঘোড়ার চাবুক মারিয়া টাপে চলিলেন। চাসা আসিয়া গ্রামে রটাইল, একটা সাহেব টাকায় আট আনা হিসাবে টেক্স বসাইতে আসিয়াছিল, চাসামহাশয়ের বুদ্ধিকৌশলে বিমুখ হইয়াছে।

এদিকে মীন্‌ওয়েল্‌ সাহেব যথাকালে ফেমিন্‌ রিপোর্ট লিখিলেন। একটি প্যারাগ্রাফ শুধু মুচিরামরায়সম্বন্ধে। তাহাতে প্রতিপন্ন হইল, যে মুচিরাম জমীদারদিগের আদর্শস্থল। এই দুঃসময়ে অন্নদান করিয়া সকল প্রজাগুলির প্রাণরক্ষা করিয়াছে।

রিপোর্ট কমিশ্যনরীতে গেল। কমিশ্যনরের হস্ত হইতে কিছু উজ্জ্বলতর বর্ণে রঞ্জিত হইয়া—কমিশ্যনর সাহেব লেখক ভাল—গবর্ণমেণ্টে গেল। গবর্ণমেণ্টের এই বিবেচনা—যে যার প্রজা সেই যদি দুর্ভিক্ষের সময়ে তাহাদের আহার যোগায়, তাহা হইলেই "দুর্ভিক্ষ প্রশ্নের" উত্তম মীমাংসা হয়। অতএব মুচিরামের ন্যায় বদান্য জমীদারদিগকে সম্মানিত ও উৎসাহিত করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। তজ্জন্য বাঙ্গাল গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ করিলেন যে, বাবু মুচিরাম রায়মহাশয়কে—পাঠক একবার হরি হরি বল—রাজা-বাহাদুর উপাধি দেওয়া যায়।

ইণ্ডিয়ান গবর্ণমেণ্ট বলিলেন তথাস্তু। গেজেট হইল, রাজা মুচিরাম রায়বাহাদুর। তোমরা সবাই আর একবার হরি বল।

অভিজ্ঞান-শকুন্তল।

৪। দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা।

যে পুরুষ এবং যে রমণীর ইতিহাস লইয়া অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটক, যাহাদের অদৃষ্টপট অভিজ্ঞানশকুন্তলরচয়িতা কর্তৃক চিত্রিত হইয়াছে, তাহাদিগকে পৃথক্‌ভাবে দেখা হইয়াছে। সে পুরুষ পুরুষচরিত্রের আদর্শস্বরূপ এবং সে রমণী রমণীকুলের উচ্চপ্রতিমা তাহা দেখা হইয়াছে। দুইটি ভিন্ন জগতের ভিন্ন প্রকৃতি ভিন্নভাবে পর্য্যালোচনা করিয়াছি। কিন্তু যে শক্তির গুণে সেই দুই ভিন্ন জগৎ ভিন্নতাসত্ত্বেও এক হইয়া গেল, ভিন্ন পথ ছাড়িয়া একপথে চলিতে লাগিল, সে শক্তির প্রকৃতি এবং পরিমাণ এখনও দেখা হয় নাই। সে শক্তির নাম প্রেম। এখন অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রেমতত্ত্ব বুঝিয়া দেখিতে হইতেছে। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, অভিজ্ঞানশকুন্তলের পরীক্ষা—অভিজ্ঞানশকুন্তলের নায়কের মনের এক অংশেরদ্বারা অপর অংশের পরীক্ষা। সে মনের এক অংশ দেখিয়াছি; এখন অপর অংশ দেখিতে হইবে। সে মনের সমস্ত দেখা হইয়াছে, কেবল রিপুময়তা দেখা হয় নাই। এখন সেই রিপুময়তার প্রকৃতি এবং পরিমাণ দেখাইব।

আশ্রমপ্রবেশকালে দুষ্মন্তের দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হওয়াতে তিনি ভাবিলেন—

শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ
ফলমিহাস্য।
অথবা ভবিতব্যানাম্ দ্বারাণি ভবন্তি
সর্ব্বত্র॥

ইহার অর্থ এই:—এই আশ্রমপদ শান্তিময়। এমন শান্তিময়স্থানে আমার বাহু স্পন্দিত হইল, ইহার ফল কি হইতে পারে, এখানে ত স্ত্রীলাভের সম্ভাবনা নাই। অথবা এমন হইতে পারে যে, ভবিতব্যের বলে সকলস্থানেই স্ত্রীলাভ সম্ভব। দুষ্মন্ত ধার্ম্মিক; হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার অগাধ ভক্তি। শাস্ত্র স্মরণ করিয়া তিনি স্ত্রীলাভের কথা মনে করিয়া বিস্মিত হইলেন। কিন্তু এ বিস্ময়ের কারণ কি? এ বিস্ময়ের কারণ—'শান্তমিদমাশ্রমপদং।' অর্থাৎ, স্থানটি শান্তিময় তপস্যাশ্রম বলিয়া তাঁহার বিস্ময়। সংসারাশ্রমবাসী সংসারধর্ম্মনিরত ব্যক্তিদিগের বাসস্থান হইলে তাঁহার এ বিস্ময় হইত না। এ সকলই সম্ভব। কিন্তু এ বিস্ময়ের আরও একটু অর্থ আছে। তাহা "ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবন্তি সর্ব্বত্র" এই কয়টি কথায় প্রকাশ। এ কথার অর্থ এই—স্ত্রীলাভ হইলে দুষ্মন্ত সুখী বই অসুখী হন না; স্ত্রী সত্ত্বেও দুষ্মন্ত পুনরায় স্ত্রীলাভ করিতে পারিলে আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করেন। শুধু

হিন্দুধর্ম্মে আস্থাবান্ বলিয়া যে তিনি এইরূপ ভাবিলেন তা নয়। কিছু বেশী স্ত্রীপ্রিয় না হইলে তিনি বোধ হয় এইরূপ ভাবিতেন :—“এ কি! আমার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তবে কেন আমার দক্ষিণবাহু স্পন্দিত হয়? ইহার কি আর কোন অর্থ থাকিতে পারে? জানি না দেবতাদিগের কি অভিপ্রায়।” কিন্তু তিনি এরূপ ভাবিলেন না। কেবল তপস্যাশ্রম বলিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন, বিবাহিত বলিয়া বিস্মিত হইলেন না। তিনি কিছু বেশী স্ত্রীপ্রিয়।

তার পর আশ্রমে প্রবেশ করিয়া শকুন্তলা এবং তাঁহার সখীদ্বয়কে দেখিবা মাত্র তাঁহার মনে যে ভাবের উদয় হইল, তাহাও তাঁহার স্ত্রীপ্রিয়তার এবং রূপানুরাগের ফল। সে ভাব এই—

“শুদ্ধান্তদুর্ল্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো
যদি জনস্য।
দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বন-
লতাভিঃ॥

যদি সামান্য আশ্রমবাসিনীগণের শারীরিক সৌন্দর্য্য রাজান্তঃপুরবাসিনীগণের মধ্যে দুর্লভ হইল, তবে যে দেখিতেছি উদ্যানলতা বনলতার কাছে পরাজিতা।” অলোকসামান্যরূপরাশি দেখিলে লোকে চমৎকৃত হয়, মুগ্ধ হয়, মন্ত্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হয়, হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হয়, মুখে বাঙ্‌নিষ্পত্তি হয় না, অথবা উচ্ছ্বাসময় স্তুতিবাক্য নির্গত হয়। দুষ্মন্তের এ সকল কিছুই হইল না। তিনি তাপসবালাদিগের রূপরাশি দেখিয়া আপনার রূপসীদিগের নিন্দা করিলেন। আমরা এইরূপ বুঝি যে, যে পুরুষ বা যে রমণী অন্য স্ত্রী অথবা অন্য পুরুষ দেখিয়া আপনার পত্নীর অথবা আপনার পতির নিন্দা করে, তাহার লালসা অতিশয় বলবতী। বকুলতলায় সুন্দরকে দেখিয়া যে সকল কুলকামিনীরা আপন আপন পতির নিন্দা করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে কেহ কখন ভাল বলে নাই এবং ভাল মনে করে নাই। যাহাদের ভোগলালসা একান্ত বলবতী, তাহারাই উপভোগ্য বস্তুর তুলনা করিতে ভালবাসে। দুষ্মন্তের ভোগলালসা যে বড়ই প্রবল এবং সে জন্য তিনি যে একটিমাত্র ভোগ্যবস্তুতে পরিতুষ্ট নন, তাহা অভিজ্ঞানশকুন্তলে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। আশ্রম হইতে ফিরিয়া আসিয়া দুর্ব্বাসার শাপপ্রভাবে শকুন্তলাকে ভুলিয়া গিয়া দুষ্মন্ত একদিন মাধব্যের সহিত বসিয়া আছেন এমন সময় এই গীতিধ্বনি শ্রবণ করিলেন—

অহিণবমহুলোলুবো তুমং
তহ পরিচুম্বিঅ চূঅমঞ্জরিং।
কমলবসইমেত্তণিব্বুদো
মহুঅর বিস্মরিদো সি ণং কহং॥

হে মধুকর! তুমি মধুর লোভে লালায়িত হইয়া চূতমঞ্জরীকে সেই ভাবে চুম্বন করিলে, এখন কেবল কমলের

সহবাসে নির্বৃত হইয়া বল দেখি কেমন কোরে সেটিকে একেবারে ভুলিলে?

মাধব্য জিজ্ঞাসা করিলেন, এ গানটির অর্থ কি? দুষ্মন্ত বলিলেন—

সকৃত্কৃত প্রণয়োঽয়ং জনঃ।
তদস্যা দেবীং বসুমতীমন্তরেণ মহ-
দুপালম্ভনং গতোঽস্মি।
সখে মাধব্য মদ্বচনাদুচ্যতাং হংসপদিকা
নিপুণমুপালব্ধোঽস্মীতি।

স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে দুষ্মন্ত উপভোগসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ চঞ্চলচিত্ত। তিনি একটি ভোগ্যবস্তু লইয়া থাকিতে পারেন না। তিনি নূতন ভোগ্যবস্তুর পক্ষপাতী। এই নিমিত্তই মহাকবি তাঁহাকে অগাঢ়প্রণয়ী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। শকুন্তলার চিত্রদর্শনকালে বসুমতীর ভয়ে তাঁহাকে সেই চিত্র লুকাইতে দেখিয়া সানুমতী ভাবিতেছেন—

অণ্ণ সংকন্তহিঅও বি পঢ়মসংভাবণং
অবেক্খদি।
সিঢ়িল সোহদো দানিং এসো।

ইনি অন্যের প্রেমে তদ্গতচিত্ত হইয়াও পূর্ব্বপ্রণয়ের সম্মান রাখিতেছেন। এক্ষণে বসুমতীর প্রতি ইহাঁর প্রণয় শিথিল হইয়াছে।

শকুন্তলাকে প্রথম দেখিয়া গিয়া দুষ্মন্ত মাধব্যের কাছে তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিলে পর মাধব্য পরিহাস করিয়া বলিল, যে যখন আপনার অন্তঃপুর স্ত্রীরত্নে পরিপূর্ণ, তখন এই বালিকার প্রতি আপনার অনুরাগ কেমন?—না, যে ব্যক্তির মিষ্ট খর্জ্জুর খাইয়া অরুচি হইয়াছে, তাহার তেঁতুলের প্রতি অনুরাগ যেমন। তাহাতে দুষ্মন্ত উত্তর করিলেন যে তুমি যদি তাহাকে দেখিতে তাহা হইলে এমন কথা বলিতে না। কিন্তু আমাদিগকে বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না যে মাধব্যের পরিহাস বড় পরিহাস নয় এবং সে পরিহাসের অর্থও যা, দুষ্মন্তের প্রতিবাদের অর্থও তাই।

ফলতঃ দুষ্মন্তের রূপতৃষ্ণা এবং ভোগলালসা অতিশয় বলবতী। সে ভোগলালসার আধিক্য দেখিলে তাঁহাকে নিন্দা করিতে ইচ্ছা হয়। তিনি শকুন্তলাকে পরিণীতা ভার্য্যা বলিয়া চিনিতে পারিতেছেন না। তাঁহাকে গ্রহণ করিলে অধর্ম্ম হইবে বুঝিতে পারিতেছেন। তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধপীড়িত হইয়াছেন বলিয়া ঋষিকুমারদিগের অপমান করিতেছেন। তথাপি সেই শকুন্তলার অবগুণ্ঠনমুক্তরূপরাশি দেখিয়া মনে মনে ভাবিতেছেন—

ইদমুপনতমেবং রূপমক্লিষ্টকান্তি
প্রথম পরিগৃহীতং স্যান্নবেতি ব্যবস্যন্।
ভ্রমর ইব বিভাতে কুন্দমন্তস্তুষারং
ন চ খলু পরিভোক্তুং নৈব শক্নোমি
হাতুম্॥

এই অক্ষত রূপরাশি আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। আমি কি ইহাকে পূর্ব্বে বরণ করিয়াছি? কই মনে ত হয় না। ভ্রমর যেমন হিমাচ্ছন্ন কুন্দপুষ্পটি ভয়ে ভোগ করিতেও পারে না, আবার

ছাড়িতেও পারে না, তেমনি আমিও ফাঁপরে পড়িলাম।

আমরা প্রথম প্রস্তাবে বলিয়াছি যে দুষ্মন্তের অসাধারণ চিত্তসংযমশক্তি না থাকিলে তিনি কণ্বের পবিত্র তপস্যাশ্রম কলঙ্কিত করিয়া ফেলিতেন। এখন বোধ হয় কথাটি অত্যুক্তি বলিয়া কাহারও সংশয় থাকিবে না। রূপবতী রমণী দেখিলে দুষ্মন্ত লালসায় অধীর হইয়া পড়েন। কেবল উন্নতশিক্ষা, উন্নত ধর্ম্মজ্ঞান এবং অসাধারণ চিত্তসংযমশক্তি তাঁহাকে ব্যভিচার হইতে নিবৃত্ত করে।

শকুন্তলা রূপবতী; শকুন্তলা রূপবতীর মধ্যে রূপবতী। তাহাতে আবার তিনি যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র দুষ্মন্তের মনে এক নূতন ভাবের সঞ্চার হইল। সে ভাব প্রথমে অস্ফুট। "দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈ-রুদ্যানলতা বনলতাভিঃ," এই তুলনায় সেই ভাবের প্রথম অস্ফুট স্ফূর্ত্তি। এ রকম তুলনা নূতন প্রেমের পূর্ব্বলক্ষণ। যাহার সুন্দরী রমণী আছে সে যদি কোন নূতন রমণী দেখিয়া উভয়ের তুলনা করিয়া নূতন রমণীকে প্রাধান্য দেয়, তাহা হইলে সেই তুলনাকে নূতন প্রেমের পূর্ব্বলক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হয়। যেখানে নূতন বস্তুর তুলনায় পুরাতন বস্তু নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়, সেইখানেই নূতন বস্তুতে স্পৃহা জন্মিয়া থাকে। কিন্তু এ তুলনায় স্পৃহাসূচক কিছুই নাই। এ তুলনা কেবল স্পৃহার পূর্ব্বগামী মানসিক অবস্থাব্যঞ্জক। তার পর দুষ্মন্ত শকুন্তলাসম্বন্ধে যাহা ভাবিলেন, তাঁহাও স্পৃহাসূচক নয় কিন্তু তাহাতে স্পৃহার আভাস আছে। তিনি ভাবিলেন—

কথমিয়ং সা কণ্বদুহিতা।
অসাধুদর্শী খলু তত্রভবান্ কাশ্যপঃ য
ইমামাশ্রমধর্ম্মে নিযুঙ্‌ক্তে।
ইদং কিলাব্যাজ মনোহরং বপুস্তপঃ-
ক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি।
ধ্রুবং স নীলোৎপল পত্র ধারয়া
শমীলতাংচ্ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি॥

ইহার মর্ম্ম এই যে এমন কোমলাঙ্গীকে কঠিন আশ্রমধর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া কণ্ব অবিবেচনার কার্য্য করিয়াছেন। * কোমল নীলোৎপল পত্রের দ্বারা কঠিন শমীবৃক্ষ ছেদন করা যেমন অসম্ভব, এই কোমলাঙ্গীর দ্বারা সেই কঠিন আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালিত হওয়াও তেমনি অসম্ভব।

তপস্যাশ্রমে তপস্বিকন্যাকে দেখিয়া দুষ্মন্তের ন্যায় চিত্তসংযমক্ষম ধর্ম্মবীরের মনে একেবারে বলবতী স্পৃহার উদ্রেক হওয়া অসম্ভব। কিন্তু দুষ্মন্ত স্ত্রীপ্রিয়। 'দূরীকৃতাঃ খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ' এই তুলনাতেই তাঁহার স্ত্রীপ্রিয়তা প্রকাশ। তবে যখন তিনি শকুন্তলাকে তপশ্চর্য্যার অযোগ্যা বলিয়া ভাবিলেন, এবং কণ্বকে নিন্দা করিলেন, তখন তাঁহার নিন্দাবাদের মূলে কিঞ্চিৎ আত্মদৃষ্টি নিহিত আছে। মানুষ যখন দুর্লভ অথবা এক অবস্থাপন্ন বস্তুকে

সুলভ অথবা অন্য অবস্থাপন্ন করিতে চায় তখন প্রায়ই দেখা যায় যে সেই ইচ্ছার মূলে সেই বস্তুপ্রাপ্তির স্পৃহা নিহিত আছে। যাহার কোন দূরস্থিত বস্তু পাইবার স্পৃহা হয়, সেই বলিয়া থাকে যে এই বস্তুটী নিকটে থাকিলে ভাল হয় এবং ইহার নিকটে থাকাই উচিত। যাহার কোন উদ্যানস্থিত পুষ্প লইবার ইচ্ছা হয়, সেই বলিয়া থাকে যে বড় মানুষের বাগান সাধারণের ক্রীড়াস্থল হওয়া উচিত। যাহার কোন অন্তঃপুরস্থিতা সুন্দরী বিধবা রমণীকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা হয় সে সেই রমণীর আত্মীয়দিগের কাছে স্ত্রীস্বাধীনতার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতে যত্নবান্ হয় এবং 'জেনানা সিস্‌টেমের' নিন্দা করিয়া থাকে। দুষ্মন্তের নিন্দাবাদের অর্থও সেই রকম। তাঁহার মনে এখন স্পৃহার উদ্রেক হইয়াছে। তার পর তিনি যাহা শুনিলেন, তাহাতে বুঝিলেন যে কণ্বের অভিপ্রায় যাহাই হউক, শকুন্তলা এবং তাঁহার সখীদ্বয়ের মানসিক ভাব ঠিক তপস্বিকন্যার মতন নয়। তিনি এই কথোপকথন শুনিলেন—

শকু। সহি অনসূএ অদিপিণদ্ধেণ বক্কলেণ পিঅংবদাএ ণিঅন্তিদম্হি সিঢ়িলেহি দাব ণং।

অন। তহ।

প্রিয়। এথ পওোহরবিথারইত্তঅং অত্তণো জোব্বণং উবালহ।

শকুন্তলা বলিলেন—প্রিয়ম্বদা আমার বুকের বস্কল অতিশয় আঁটিয়া বাঁধিয়াছে, অতএব, অনসূয়ে, তুমি এটা একটু আল্গা করিয়া দেও। প্রিয়ম্বদা উত্তর করিলেন—তোমার নিজের যৌবনের জোরে তোমার পয়োধর বিস্তৃত হইয়াছে, তা আমাকে দোষ দিলে কি হবে?

দুষ্মন্তের মন যাহা চায় এ ত তাই। তপস্বিকন্যারা আশ্রমধর্ম্মপ্রতিপালনে নিযুক্ত; কিন্তু আশ্রমধর্ম্ম ভিন্ন অন্য বিষয়ও তাঁহাদের মনে স্থান পাইয়া থাকে। তাঁহারা যৌবনের মর্ম্ম বুঝিয়াছেন এবং যৌবনের বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। এ সব দেখিয়া শুনিয়া স্পৃহাবান্ দুষ্মন্তের বিঘ্নাশঙ্কা কমিবার কথা। বস্তুতঃ সে আশঙ্কা কমিয়া স্পৃহা এবং স্পৃহাজনিত অভিনিবেশ বাড়িয়া উঠিল। তিনি শকুন্তলার শারীরিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তপরে শকুন্তলাকে কেশরবৃক্ষমূলে কিঞ্চিৎ হেলিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া প্রিয়ম্বদা বলিলেন যে, ঠিক বোধ হইতেছে যেন এই কেশরবৃক্ষটীর একটি লতার সহিত পরিণয় হইয়াছে। তপস্বিকন্যাদিগের মানসিক অবস্থা আরও প্রকাশ পাইল। দুষ্মন্তের বিঘ্নাশঙ্কা আরও কমিয়া গেল; তাঁহার স্পৃহাবিচলিত মন আরও বিচলিত হইল; তিনি সেই বর্দ্ধিতস্পৃহার বলে শকুন্তলার ওষ্ঠ, বাহু, প্রভৃতি এক একটি অঙ্গের সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিলেন—

অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ।

কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু
সন্নদ্ধম্ ॥

অনুরাগ যত বৃদ্ধি হয়, লোকে অনুরাগের বস্তু ততই তন্ন তন্ন করিয়া দেখে। লোকে যখন কোন বস্তুর প্রতিঅংশে সৌন্দর্য্য দেখে, তখন বুঝিতে হয় যে তাহাদের মন সেই বস্তুর প্রতি অনুরাগে পরিপূর্ণ হইয়াছে। দুষ্মন্তের মনও এখন শকুন্তলার প্রতি প্রবল অনুরাগপূর্ণ। শকুন্তলার প্রতি অঙ্গে সৌন্দর্য্য দেখিতেছেন, এমন সময় অনসূয়ার মুখে শুনিলেন যে শকুন্তলা নিজে বৃক্ষের সহিত লতার বিবাহ দিয়া থাকেন—কোন বৃক্ষের পত্নী করিয়া দেন, কোন লতার পতি করিয়া দেন।

হলা শউন্তলে ইঅং সঅংবরবহূ সহআরস্স তুএ কিদনামহেআ বনজোসিনী ত্তি নোমালিআ ণং বিস্সুমরিদাসি।

শকুন্তলা উত্তর করিলেন ঃ—

তদা অত্তাণং বি বিস্সুমরিস্সং। (লতামুপেত্যাবলোক্য চ) হলা রমণীএ ক্খু কালে ইমস্স লদাপাঅবমিহুণস্স বইঅরো সংবুত্তো। ণবকুসুমজোব্বণা বনজোসিনী বদ্ধপল্লবদাএ উবভোঅক্খমো সহআরো।

সখি, রমণীয় সময়েই এই লতা ও পাদপের মিলন হইয়াছে। দেখ, বনজ্যোৎস্না অঙ্গে নবকুসুমের যৌবন আর এই সহকার তরু নবপল্লবধারণ করিয়া সম্ভোগসুখের কেমন উপযুক্ত হইয়াছে।

এতক্ষণ দুষ্মন্ত প্রিয়ম্বদার মুখেই অনেক কথা শুনিয়াছিলেন। শুনিয়া শকুন্তলার মনের ভাবও অবশ্য বুঝিতেছিলেন। কিন্তু এখন স্বয়ং শকুন্তলার মুখে অনেক কথা শুনিলেন এবং শকুন্তলা কি করিতে ভালবাসেন তাহাও জানিলেন। জানিলেন যে শকুন্তলা বৃক্ষ এবং লতার মধ্যে বিবাহ দিতে ভালবাসেন এবং দেখিলেন যে তিনি নবমল্লিকা এবং সহকারের মিলন দেখিয়া তাহাদিগকে স্ত্রীপুরুষ ভাবিয়া পরমহর্ষোৎফুল্ল। আবার দুষ্ট প্রিয়ম্বদা তখনি অনসূয়াকে বুঝাইয়া দিল, যে শকুন্তলার নিজের উপযুক্ত পতিলাভের ইচ্ছা হইয়াছে বলিয়া পতিপ্রাপ্তা বনজ্যোৎস্নার প্রতি নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া আছে। এবং শকুন্তলা সেই কথা শুনিয়া প্রিয়ম্বদাকে বলিলেন—তোমার নিজের বুঝি সেই ইচ্ছা হইয়াছে। শকুন্তলার মানসিক অবস্থার বিষয় জানিতে আর কিছু বাকি রহিল না। তাঁহার মন এখন মিলনকল্পনাপূর্ণ; তাঁহার ভাবনা এখন মিলনের; তাঁহার জীবন এখন স্বপ্নময় এবং সে স্বপ্ন নবপ্রস্ফুটিত যৌবনের অপরিস্ফুট সঙ্গীতে সঙ্গীতময়। সেই সঙ্গীতধ্বনি দুষ্মন্তের কর্ণে বাজিল। তাঁহার লালসা মিলনকামনায় পরিণত হইল। শকুন্তলাকে ব্রাহ্মণকন্যা মনে করিয়া তিনি তখনি বিবাহসম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন। কিন্তু শকুন্তলার মন জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রধান আশঙ্কা এখন ঘুচিয়া গিয়াছে। তাঁহার মন এখন উৎসাহপূর্ণ। তিনি শকুন্তলার জাতি

নির্ণয় করিবেন বলিয়া স্থিরসঙ্কল্প হইলেন। লালসার বস্তুকে ঈপ্সিত অবস্থাপন্ন বুঝিতে পারিলে লোকে তাহা অধিকার করিবার জন্য সাহস এবং ব্যগ্রতাসহকারে উপায় চিন্তা করিয়া থাকে। দুষ্মন্ত এতক্ষণে শকুন্তলার সহিত অধিকারের ভাব সংযোগ করিলেন। তার পর শকুন্তলাকে ভ্রমরতাড়না হইতে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত দুষ্মন্ত বৃক্ষান্তরাল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাপসবালাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সহসা কোন প্রভাবশালী পুরুষবরকে দেখিলে ক্ষুদ্রবালিকার মনে যে চকিতের ভাব হইয়া থাকে, তাহা শমিত হইবার পরেই শকুন্তলা মনোবিকার অনুভব করিলেন :—

কিং ণু কৃখু ইমং পেকৃখিঅ তপোবণ বিরোহিণো বিআরস্স গমনীঅ ক্ষি সংবুত্তা।

ইহাকে দেখিয়া আমার তপোবনবিরোধী মনোবিকার জন্মিল কেন?

ক্ষুদ্র হরিণী একেবারে ব্যাধশরাহত। প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া শকুন্তলার মনের ভাব বুঝিলেন। শকুন্তলা তাঁহাদের কাছে এবং দুষ্মন্তের কাছে লুকোচুরি আরম্ভ করিলেন। প্রিয়ম্বদা কি অনসূয়া দুষ্মন্তসম্বন্ধে তাঁহার মনের মতন কথা বলিলেই তিনি রাগ করিতে লাগিলেন। তিনি সতৃষ্ণভাবে কিন্তু যেন চোরের ন্যায় ভয়ে ভয়ে দুষ্মন্তকে দেখিতেছেন, কিন্তু দুষ্মন্ত তাঁহার পানে চাহিয়া দেখিলেই তিনি চক্ষু ফিরাইয়া লইতেছেন। শকুন্তলাসম্বন্ধে দুষ্মন্তের এখন যেরূপ মনের ভাব, তাহাতে তাঁহার কেবল ইহাই জানা আবশ্যক যে শকুন্তলার সহিত তাঁহার বিবাহ হইতে পারে কি না। তিনি শুনিলেন যে শকুন্তলা ক্ষত্রিয়কন্যা। এবং প্রিয়ম্বদা তাঁহাকে আরো বলিয়া দিল যে কণ্ব শকুন্তলাকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিতে অভিলাষী। কথাটি শকুন্তলার খুব মনের মতন হইল। কিন্তু তিনি রাগ করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। প্রিয়ম্বদা তাঁহাকে আর দুইটি গাছে জল দিবার অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়া দিল। দুষ্মন্ত তাঁহার শ্রমকাতরতায় কাতরতা প্রকাশ করিয়া তাঁহার ঋণের বিনিময়ে নিজের অঙ্গুরীটি প্রিয়ম্বদাকে দিলেন। প্রেমের স্নেহময় মূর্ত্তি প্রকটিত হইল। অঙ্গুরীটি পাইয়া প্রিয়ম্বদা শকুন্তলাকে ঋণমুক্ত করিয়া চলিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু শকুন্তলার এখন চলিয়া যাইবার সাধ্য নাই। তিনি রাগ করিয়া প্রিয়ম্বদাকে বলিলেন—

কা তুমং বিসজ্জিদব্বস্স রুন্ধিদব্বস্স বা।

আমাকে তাড়াইয়া দিবারই বা তুমি কে আর ধরিয়া রাখিবারই বা তুমি কে?

প্রথম প্রেমসঞ্চারের সময় রমণী অধিকতর লজ্জাশীলতাহেতু এইরূপ লুকোচুরিই করিয়া থাকে। রমণী লীর

মনের কথা বলিতে পারে না। রমণীর অস্তিত্ব হৃদয়গত। যে যত হৃদয়াধীন, বাহ্য অভিব্যক্তি তাহার তত কষ্টকর। সে কষ্ট রমণীমণ্ডলে লজ্জারূপধারণ করিয়া লুকোচুরি প্রভৃতি রমণীর কুটিলতায় অভিব্যক্ত হয়। যেখানে রমণী পুরুষের সহিত বেশী মিশামিশি করে, সেখানে রমণীর বাহ্য অভিব্যক্তি কতকটা অভ্যস্ত হইয়া পড়ে। সেই জন্য রমণীর প্রেমের ইতিহাস, অথবা বলিতে গেলে রমণীর সমস্ত ইতিহাস, ইউরোপে এক রকম, এসিয়ায় কিছু ভিন্ন রকম। শকুন্তলা হিন্দুরমণী। সুতরাং তাঁহার প্রেমসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে লুকোচুরির ব্যাপার কিছু বেশী। এ লজ্জাশীলতা এবং লুকোচুরির আরো একটু তাৎপর্য্য আছে। যে দেশের ভাবে এবং শিক্ষায় শরীর আত্মার তুলনায় অতি অপবিত্র, সে দেশে শারীরিকসম্ভোগসূচক প্রসঙ্গমাত্রই কিছু লজ্জা উৎপাদন করিয়া থাকে। এবং সেই নিমিত্তই সে দেশে প্রেমের সহিত লুকোচুরির কিছু ঘনিষ্ট-সম্বন্ধ। ইউরোপের ভাব এবং শিক্ষা এ রকমের নয় এবং সেই জন্য ইউরোপীয় কাব্যের নায়িকাগণ প্রেমপ্রসঙ্গে এক রকম প্রগল্‌ভা বলিলেই হয়। কিন্তু ভারতের এই ভাব এবং এই শিক্ষা। এবং শকুন্তলা ভারতরমণী এবং ব্রহ্মসেবানিরত তাপসবালা। সেই জনাই দুষ্মন্তের নিকট হইতে গমনকালে তাঁহার পায় কাঁটা ফুটিল এবং তাঁহার বস্ত্র গাছের ডালে আট্‌কাইয়া গেল। তখন দুষ্মন্তও যেমন তাঁহাতে মজিয়াছেন তিনিও তেমনি দুষ্মন্তে মজিয়াছেন। তবে তিনি এক রকমে মজিয়াছেন, দুষ্মন্ত আর এক রকমে মজিয়াছেন। তিনি দুষ্মন্তকে দেখিবামাত্রই মজিয়াছেন, দুষ্মন্ত তাঁহাকে দেখিবামাত্র মজেন নাই। দুষ্মন্তের প্রেমসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের কার্য্য হইয়াছে; সুতরাং সে প্রেম একটু একটু করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইনি যে দেখিতে পাই তপস্বিকন্যা, ইনি বোধ হয় ব্রাহ্মণকন্যা—দুষ্মন্ত মধ্যে মধ্যে এই সকল বিঘ্নকল্পনা করিয়াছেন। বোধ হয় কোন কল্পিত বিঘ্ন প্রকৃত বিঘ্ন বলিয়া জানিতে পারিলে দুষ্মন্ত শকুন্তলার মোহ ঝাড়িয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইতেন। কিন্তু দুষ্মন্তকে দেখিয়া শকুন্তলা সে রকম কোন বিঘ্নকল্পনা করিলেন না। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার মন একেবারেই বিচলিত হইয়া উঠিল, তাঁহার জ্ঞানের কার্য্য কিছুই হইল না। বোধ হয় সে প্রেমের কোন বিঘ্ন ঘটিলে সেই প্রেমানলেই তিনি ভস্মীভূতা হইতেন। রমণী হৃদয়-প্রধান বলিয়াই দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার প্রেমসঞ্চারের এই ভিন্ন প্রণালী।

দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার প্রেমসঞ্চার হইয়াছে। তাঁহারা পরস্পরে এমনি মুগ্ধ, যে কাহারও কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে আর ইচ্ছা হয় না। কিন্তু ছাড়িয়া থাকিতে হইল। দুষ্মন্ত আশ্রম হইতে

চলিয়া গেলেন; শকুন্তলাও আশ্রম-কুটীরে প্রবেশ করিলেন। এই বিচ্ছেদের পর যে পর্য্যন্ত না উভয়ের মিলন হইল, সে পর্য্যন্ত দুইজনের ইতিহাস কতকটা একরকম কতকটা ভিন্নরকম। উভয়েই পরস্পরের চিন্তা করিতে লাগিলেন। কি দিবা, কি রাত্রি সকল সময়েই সেই চিন্তা। চিন্তা করিয়া করিয়া উভয়েই শীর্ণ, দুর্ব্বল, আহার-নিদ্রাবর্জ্জিত।

ক্ষামক্ষামকপোল মাননমুরঃ কাঠিন্য-
মুক্তস্তনং
মধ্যং ক্লান্ততরঃ প্রকামবিনতাবংসৌ ছবিঃ
পাণ্ডুরা।
শোচ্যা চ প্রিয়দর্শনা চ মদনক্লিষ্টেয়-
মালক্ষ্যতে
পত্রাণামিব শোষণেন মরুতা স্পৃষ্টা লতা
মাধবী॥

ভাবিয়া ভাবিয়া শকুন্তলার ত এই দশা হইয়াছে। দুষ্মন্তেরও তাই ঘটিয়াছে। প্রিয়ম্বদা অনসূয়াকে বলিতেছেন:—

ণং সো রাএসী ইমস্সিং সিণিদ্ধ দিট্‌ঠিএ সূইদাহিলাসো ইমাইং দিঅসাইং পজ্জাঅরকিসো লক্‌খীঅদি।

এবং দুষ্মন্ত নিজে এই কথা বলেন:—

ইদমশিশিরৈরন্তস্তাপাদ্বিবর্ণ মণীকৃতং
নিশি নিশি ভুজন্যস্তাপাঙ্গপ্রসারিভিরশ্রুভিঃ।
অনভিলুলিতজ্যাঘাতাঙ্কং মুহুর্মণিবন্ধনাৎ
কণকবলয়ং স্রস্তং স্রস্তং ময়া প্রতিসার্য্যতে॥

এ কি রকম চিন্তা? দুষ্মন্তের সম্বন্ধে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ, শকুন্তলার সম্বন্ধে তত সহজ নয়। কারণ দুষ্মন্তের সম্বন্ধে এ চিন্তার বাহ্যস্ফূর্ত্তি আছে, শকুন্তলার সম্বন্ধে বাহ্যস্ফূর্ত্তি নাই। দুষ্মন্ত আশ্রম হইতে চলিয়া গিয়াই নিজসখা মাধব্যের কাছে সকল কথা বলিতে লাগিলেন, কিন্তু শকুন্তলা নিজসখীদ্বয়ের কাছে কোন কথা বলিলেন না। দুষ্মন্ত শকুন্তলার রূপের কথা মনে করিতে লাগিলেন; তাঁহাকে দেখিয়া শকুন্তলা কি করিয়াছিলেন তাহা ভাবিতে লাগিলেন; আবার কি রকম করিয়া শকুন্তলার সহিত দেখা হইবে তাহা বিবেচনা করিতে লাগিলেন। শকুন্তলা তাঁহাকে দেখিয়া কি করিয়াছিলেন, সেই পর্য্যালোচনাই দুষ্মন্তের মনে প্রবল। সে পর্য্যালোচনার প্রকৃতি এই:—

কামং প্রিয়া ন সুলভা মনস্ত তদ্ভাব-
দর্শনায়াসি।
অকৃতার্থেঽপি মনসিজে রতিমুভয় প্রার্থনা
কুরুতে॥
(স্মিতং কৃত্বা) এবমাত্মাভিপ্রায়সম্ভাবিতেষ্ট-
জনচিত্তবৃত্তিঃ প্রার্থয়িতা বিড়ম্ব্যতে।
স্নিগ্ধং বীক্ষিত মন্যতোঽপি নয়নে যৎ-
প্রেরয়ন্ত্যা তয়া
যাতং যচ্চ নিতম্বয়োর্গুরুতয়া মন্দং
বিলাসাদিব।
মাগা ইত্যুপরুদ্ধয়া যদপি সা সাসূয়মুক্তা
সখী
সর্ব্বং তৎ কিল মৎপরায়ণমহো কামী
স্বতাং পশ্যতি॥

মনে করিলেই প্রিয়াকে পাইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু আমার মন তা বুঝে না। সে সদা তাঁহারই অনুরাগ-দর্শনে উৎসুক। এখনও মনোরথ পূর্ণ হয় নাই বটে, কিন্তু পরস্পর পরস্পরের অনুরাগ দর্শন করিয়া একপ্রকার আনন্দে উন্মত্ত। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) হুঃ এই-রূপে প্রণয়ী ব্যক্তি প্রতারিত হয়। সে ভাবে তাহার আপনার মনে যে যে ভাবের উদয় হইতেছে তাহার প্রিয়-জনের মনেও অবিকল সেই সকল ভাবের উদয় হইতেছে। তিনি অন্য দিকে যদৃচ্ছায় নয়ননিক্ষেপ করিয়াছেন, আমি ভাবিয়াছি সেটী আমাকে দেখি-য়াই। তিনি গুরু নিতম্বের ভরে মন্থর-ভাবে গমন করিয়াছেন, আমি মনে করিয়াছি আমাকে দেখিয়াই তাঁহার গতি বিলাসে অলস হইয়া পড়িতেছে। প্রিয়ম্বদা তাঁহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া আটকাইলে তিনি সখীর প্রতি কোপ প্রকাশ করিলেন, সেটীও আমার মনে হইল যে আমারই জন্যে। কামী ব্যক্তি আপনার ভাবে ভোর হইয়া সকলি আপনার বলিয়া দেখে।

এ পর্য্যালোচনার অর্থ—সন্দেহ। প্রে-মোন্মত্ত ব্যক্তি প্রেমের লক্ষণ বুঝিয়াও বুঝে না, নিশ্চিন্ত হইয়াও সন্দিহান হয়, আশ্বস্ত হইয়াও প্রতারিত মনে করে। শকুন্তলাকে জর্জ্জরিতাবস্থায় দেখিয়া দুষ্মন্ত একবার সন্দেহ করিয়া পরক্ষণেই নিশ্চয় বুঝিলেন যে মনোবিকারই এ অবস্থার কারণঃ—

বলবদস্বস্থশরীরা শকুন্তলা দৃশ্যতে। তৎ কিময়মাতপদোষঃ স্যাৎ উত যথা মে মনসি বর্ত্ততে। অথবা কৃতং সন্দেহেন

স্তনন্যস্তোশীরং শিথিলিতমৃণালৈকবলয়ং
প্রিয়ায়াঃ সাবাধং কিমপি কমনীয়ং বপু-
রিদম্।
সমস্তাপঃ কামং মনসিজনিদাঘপ্রসরয়ো-
র্নতু গ্রীষ্মস্যৈবং সুভগমপরাদ্ধং যুবতিষু॥

কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই যখন প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া শকুন্তলাকে তাঁহার পীড়ার কারণ প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিলেন, তখন শকুন্তলার উত্তর প্রতীক্ষায় দুষ্মন্ত ভয়াকুলিত হইয়া পড়িলেন, চিত্তস্থৈর্য্য রক্ষা করিতে পারিলেন না।

পৃষ্টা জনেন সমদুঃখসুখেন বালা
নেয়ং ন বক্ষ্যতি মনোগতমাধিহেতুম্।
দৃষ্টো বিবৃত্য বহুশোঽপ্যনয়া সতৃষ্ণ
মত্রান্তরে শ্রবণকাতরতাং গতোঽস্মি॥

যাহারা চিরদিন ইঁহার দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী সেই সখীরা জিজ্ঞাসা করিতে-ছেন, ইনি এখন আর মনস্তাপের কারণটী লুকাইতে পারিবেন না। ইনি তৎকালে বারংবার সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাতে আমার প্রতি প্রণয় প্রকাশ করিলেও এই সময়টা (ইনি কি বলেন তাহা শুনিবার জন্য) আমার মন অস্থির হইয়া উঠিতেছে।

শুধু প্রেম কেন, সকল বিষয়েই মানুষ যাহার বেশী অভিলাষী হয় তৎসম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইয়া ও সন্দেহসংক্ষুব্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু শকুন্তলার বোধ হয় এ রকম সন্দেহ হয় নাই। এ রকম সন্দেহ

যুক্তিপ্রয়োগের ফল। রমণী হৃদয়সর্ব্বস্ব। সে হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিলে রমণী হৃদয়ের বস্তু পাইবার জন্যই ব্যাকুল হন, পাওয়া সম্ভব কি না তাহা বিবেচনা করেন না। যদি সে বস্তু পান, ভালই; নচেৎ চিরদুঃখিনী হইয়া থাকেন, অথবা শুকাইয়া শুকাইয়া মরিয়া যান।* প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়ার অনুরোধে মনের কথা প্রকাশ করিয়া শকুন্তলা সখীদ্বয়কে বলিলেন:—

তং জই বো অণুমদং তহ বট্টহ জহ তস্স রাএসিণো অণুকম্পণিজ্জা হোমি। অণ্ণহা অবস্সং সিঞ্চহ মে তিলোদঅং।

অতএব তোমাদের যদি মত হয় ত যাতে সেই রাজর্ষি আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করেন তাহার উপায় কর, নতুবা আমার জীবনের আশা পরিত্যাগ কর।

তবে শকুন্তলার একটি সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে তিনি দুষ্মন্তের যোগ্যা কি না। প্রিয়ম্বদা যখন তাঁহাকে পত্র লিখিতে বলিলেন, তখন তিনি বলিলেন:—

চিন্তেমি অহং। অবহীরণভীরুঅং উণ বেবই মে হিঅঅং।

আমি ভাবিতেছি। কিন্তু পাছে তিনি অবজ্ঞা করেন এই ভয়ে আমার হৃদয় কাঁপিতেছে।

কিন্তু এ সন্দেহ প্রকৃত যুক্তিমূলক সন্দেহ নয়। এ সন্দেহের নাম ভয়। যাহার অন্যের ইচ্ছার উপর জীবন এবং মৃত্যু নির্ভর করে, তাহার সেই ইচ্ছা জানিবার সময় এইরূপ ভয় হইয়া থাকে।

প্রেমসঞ্চারের পর মিলন না হওয়া পর্য্যন্ত যে অবস্থা আমরা বর্ণনা করিতেছি তাহার আর একটী লক্ষণ যন্ত্রণা। এ যন্ত্রণার দুইটী কারণ—সন্দেহ এবং আসঙ্গলিপ্সা। তন্মধ্যে আসঙ্গলিপ্সাই প্রবল কারণ। এই কারণ দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা উভয়েই বর্ত্তমান। উভয়েই জর্জ্জরিত দেহ। উভয়েই উত্তপ্তশোণিত। উভয়েই জ্বলিয়া যাইতেছেন। কিন্তু এ জ্বালায় দুষ্মন্ত অধীর, অস্থির; শকুন্তলা প্রায় চেতনাশূন্য, বিকলাঙ্গ, উত্থানশক্তি রহিত। দুষ্মন্ত ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়াইতেছেন এবং প্রতিনিশ্বাসে প্রজ্বলিত চুল্লীর ন্যায় অগ্নি উদ্গীরণ করিতেছেন:—

(নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে) সেই তাপসতনয়া যে পরাধীনা ইহা আমি বিলক্ষণ জানি, এবং তপস্যার কিরূপ উগ্রপ্রভাব তাহাও বিলক্ষণ জানি, তথায় আপন ইচ্ছায় কিছুই করিবার শক্তি নাই। তথাপি সেই দুর্লভ বস্তু হইতে হৃদয়কে কিছুতেই ফিরাইতে পারিতেছি না।

---

* বঙ্কিমবাবুর শৈবলিনী রমণী বলিয়া উন্মাদগ্রস্তা। সেও এই কথার একটি বিকাশমাত্র। তাঁহার কুন্দনন্দিনীও এ কথার একটি প্রমাণ। কিন্তু যে সকল বঙ্গীয় কবি এবং উপন্যাসলেখক অসিদ্ধমনোরথ নায়িকাকে যোগিনী সাজাইয়া শ্মশানে মশানে পুষ্করে হরিদ্বারে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ান, তাঁহারা স্ত্রীপ্রকৃতি বড় একটা বুঝেন বলিয়া বোধ হয় না।

(মদনপীড়া প্রকাশ করিয়া) হে ভগবন্ কুসুমায়ুধ! আপনি এবং চন্দ্র, আপনারা উভয়ে নিজ কোমল ও বিশ্বস্তমূর্ত্তিতে প্রলোভিত করিয়া প্রণয়পীড়িত ব্যক্তিগণকে প্রতারিত করিয়া থাকেন। আপনার শর সুকোমল কুসুমে রচিত এবং চন্দ্রের রশ্মি শীতল সুধাময়, কিন্তু আমার নিকটে ত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতেছি। কারণ চন্দ্র হিমগর্ভ রশ্মিদ্বারা অগ্নিবর্ষণ করিতেছেন আর আপনিও কুসুমশরকে বজ্রের ন্যায় কঠিন করিয়াছেন। তপস্বিগণ যজ্ঞকার্য্যের অবসানে আমাকে গমনে অনুজ্ঞা দিয়াছেন, এক্ষণে কোন্ স্থানে গিয়া শ্রান্তি দূর করি। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) একমাত্র সেই প্রিয়তমার দর্শন ভিন্ন আর শান্তি কোথায়? এই দারুণ রৌদ্রের সময় শকুন্তলা সখীজনের সহিত প্রায়ই মালিনীতীরস্থিত নিকুঞ্জদেশে অবস্থান করিয়া থাকেন, অতএব সেই স্থানেই গমন করি। (গমন করিয়া স্পর্শসুখ অনুভব করত) আহা! এই স্থানটী শীতলবায়ুর সঞ্চারে কি মধুর! আমার অঙ্গ সকল না কি অনঙ্গবহ্নিতে জ্বলিতেছে, তাই এই পদ্মসৌরভপূর্ণ মালিনীনদীর শীতল বাতাসটুকু বারংবার গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিতে ইচ্ছা হইতেছে। বোধ হয় শকুন্তলা এই বেতসলতাবেষ্টিত লতামণ্ডপে অবস্থান করিতেছেন, কেন না, ইহার এই সিকতাময় দ্বারদেশে নূতন পদচিহ্ন সকল পতিত রহিয়াছে, আর এই পদচিহ্ন সকলের পূর্ব্বভাগ উচ্চ রহিয়াছে আর পশ্চাদ্ভাগ জঘনভরে বালুকায় বসিয়া গিয়াছে। অতএব লতান্তরালে থাকিয়া দেখি। (সেইরূপ করিয়া আনন্দে) আঃ! আমার চক্ষু জুড়াইল।*

যাহার অন্তঃপুর সুন্দরী রমণীতে পরিপূর্ণ তাহার এরূপ অবস্থা দেখিলে কে না বলিবে যে তাহার রিপু যথার্থই দুর্দ্দমনীয়, আসঙ্গলিপ্সা কিছুতেই মিটিবার নয়। এ অতি ভয়ানক অবস্থা। এ রকম অবস্থায় মানুষ হিতাহিতবিবেচনাশূন্য হইয়া পড়ে এবং ঘোর-অনিষ্টসাধনে সক্ষম হয়। কিন্তু এ অবস্থার, এ যন্ত্রণার একটি বিশেষ লক্ষণ আছে। এ যন্ত্রণায় বাহ্যজ্ঞান অতিশয় তীব্র। যে চন্দ্ররশ্মি অন্য সময়ে 'খবরে' আসে না, যে শীতল বায়ু অন্য সময়ে গায়ে লাগে না এ যন্ত্রণায় সে চন্দ্ররশ্মি, সে শীতলবায়ু তীব্রভাবে অনুভূত হয়। এ যন্ত্রণায় বাহ্যজগৎ ভয়ানক প্রভাবশালী। কিন্তু শকুন্তলার যন্ত্রণা এ রকমের নয়। শকুন্তলা মুমূর্ষুর ন্যায় শয্যাশায়িনী। দুষ্মন্তকে দেখিয়া অবধি তিনি যেন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার এক পা নড়িবার শক্তি নাই। কিন্তু যদিও তাঁহার বাহ্যিক দৃশ্য মুমূর্ষুর ন্যায় তাঁহার অন্তর বিষম জ্বালায় জ্বলিয়া যাইতেছে। সে জ্বালা এত প্রবল যে

*স্থানাভাবে ইহার মূল দেওয়া হইলনা।

তজ্জন্য তিনি একরকম বাহ্যানুভূতি-রহিত। সে জ্বালায় তিনি পদ্মপত্র-সঞ্চালিত বায়ু অনুভব করিতে পারেন নাই। সে জ্বালায় বাহ্যজগৎ তাঁহার কাছে অস্তিত্বহীন। সে জ্বালায় একটি কথাও তাঁহার ওষ্ঠস্খলিত হয় নাই। দুই জনের যাতনার দুই রকম আকৃতি। একজন যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়ায় এবং বাক্যে এবং নিশ্বাসে অগ্নি উদ্গীরণ করে। আর একজন যাতনায় মুমূর্ষুর ন্যায় শিথিলদেহ এবং মৃতের ন্যায় নিস্তব্ধ। দুই জনেই যেন আগ্নেয় গিরি। কিন্তু একটী গিরির গর্ভস্থ অগ্নি সতেজে শিখর ভেদ করিয়া উৎক্ষিপ্ত হইতেছে এবং দূরে অদূরে বিক্ষিপ্ত হইতেছে; আর একটি গিরির গর্ভস্থ অগ্নি শিখর ভেদ করিতে না পারিয়া সেই গর্ভকেই বর্দ্ধিতবিক্রমে দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। এখানেও দেখিতেছি যে পুরুষ এবং রমণীর মধ্যে প্রভেদ এই যে পুরুষের অভিব্যক্তি আছে, রমণীর অভিব্যক্তি নাই। এই মূলীভূত বৈপরীত্য কালিদাস যেমন আঁকিয়া দেখাইয়াছেন, আর কোন কবি তেমন দেখান নাই।

তার পর মিলন। প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়ার সম্মুখে দুষ্মন্ত বলিলেন ঃ—

পরিগ্রহবহুত্বেঽপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে।
সমুদ্রবসনা চোর্ব্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম্‌॥

যদিও আমি বহুপত্নী গ্রহণ করিয়াছি কিন্তু এখন হইতে দুইটী বস্তু আমার হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইল—একটী আমার আসমুদ্র সাম্রাজ্য আর একটী তোমাদের সখী শকুন্তলা।

সম্মান প্রকৃত প্রেমের একটী প্রধান উপাদান। দুষ্মন্তের প্রেমের সেই উপাদান এখন ব্যক্ত হইল। দেখিয়া প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়া সরিয়া গেলেন। তখন রিপুমত্ত দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শকুন্তলা উঠিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। দুষ্মন্ত বলপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। তখন শকুন্তলা বলিয়া উঠিলেন ঃ—

পোরব রক্‌খ অবিণঅং মঅণসংতত্তা বি ণহু অত্তণো পহবামি।

পৌরব! শিষ্টাচার ভঙ্গ করিও না। আমি লালসাবতী সত্য, কিন্তু আমার নিজের উপর আমার কোন ক্ষমতা নাই।

এই কথা শুনিয়া দুষ্মন্ত তাঁহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহের ইতিহাস বলিয়া এইটী বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে গুরুজনের অনুমতি ব্যতিরেকেও তিনি আত্মসমর্পণে সক্ষম। শকুন্তলা বুঝিলেন না। তখন দুষ্মন্ত তাঁহাকে বলিলেন যে আমি তোমাকে এখন ছাড়িব না; ছাড়িব কখন, না—

অপরিক্ষত কোমলস্য যাবৎ
কুসুমস্যেব নবস্য ষট্‌পদেন।
অধরস্য পিপাসতা ময়া তে
সদয়ং সুন্দরি গৃহ্যতে রসোঽস্য॥

যখন তোমার কোমল অক্ষত অধরের

মধুপান করিয়া আমার খরতর পিপাসা নিবৃত্ত হইবে। এই বলিয়া তিনি অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু শকুন্তলা তাঁহারই ন্যায় ভোগতৃষ্ণাতুরা হইয়াও তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। লজ্জাশীলার লজ্জাশীলতা এখনও প্রবল; জ্ঞানহীনার জ্ঞান এ সময়েও পরিষ্কার। কিন্তু সংযতচিত্ত দুষ্মন্ত একেবারে বিহ্বলমতি; জ্ঞানপ্রধান দুষ্মন্ত সম্পূর্ণ জ্ঞানহীন। যখন বাহ্যজগৎ ভুলিলে বিষম অনিষ্ট ঘটে তখন রমণী বাহ্যজগৎ ভুলে না, পুরুষ ভুলে। অবশেষে দুষ্মন্তের যাহা ইচ্ছা তাহাই হইল। রিপু জয়ী হইল। ন্যায়পরায়ণ সংযতচিত্ত ধর্ম্মবীরের পদস্খলন হইল। সে পদস্খলনের কারণ সেই ধর্ম্মবীরের প্রবল রিপু। দুষ্মন্ত বুঝিতেন যে গান্ধর্ব্ব বিবাহ যুক্তিসঙ্গত নয়; দুষ্মন্ত বুঝিতেন যে শকুন্তলার আত্মসমর্পণক্ষমতা নাই। শকুন্তলাকে প্রথম দেখিয়া গিয়া দুষ্মন্ত মাধব্যের কাছে তাঁহার অতুল রূপের বর্ণনা করিলে পর মাধব্য তাঁহাকে বলিলেন যে আপনি যত শীঘ্র পারেন সে রূপবতীকে দখল করিবার চেষ্টা করুন, বিলম্ব করিলে হয় ত সে কোন চিক্কণমস্তক ঋষির হাতে পড়িবে। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন:—

পরবতী খলু তত্রভবতী।

ন চ সন্নিহিতোঽত্র গুরুজনঃ।

তিনি পরাধীনা এবং তাঁহার গুরুজন গৃহে নাই।

এখন শকুন্তলা স্বয়ং সেই কথাই বলিতেছেন। কিন্তু এখন তিনি সে কথা না শুনিয়া শকুন্তলাকে বুঝাইতেছেন যে তিনি আত্মসমর্পণে সক্ষম, তাঁহার গুরুজনের সম্মতি লইবার আবশ্যকতা নাই। এ রহস্যের অর্থ—দুর্দ্দমনীয় রিপু। শকুন্তলাকে কাছে পাইয়া দুষ্মন্ত তাঁহার উন্নত নীতি, উন্নত বুদ্ধি, উন্নত বিচারশক্তি, অসাধারণ চিত্তসংযমক্ষমতা সকলই হারাইলেন। প্রখর রবি মেঘাচ্ছন্ন হইল।

দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছে। এখন তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি কি রকম ভাব তাহা দেখিতে হইতেছে। আমরা দেখিয়াছি যে দুষ্মন্ত কিছু বেশী রিপুপরবশ। তিনি ভোগলালসা চরিতার্থ করিয়া কণ্বের আশ্রম হইতে নিজ রাজধানীতে গমন করিয়াছেন। কিন্তু ভোগলালসা চরিতার্থ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার শকুন্তলা-প্রেমের উচ্ছেদ হয় নাই। শকুন্তলা তাঁহার হৃদয় দৃঢ়রূপে অধিকার করিয়াছেন—সে হৃদয়ে শকুন্তলা-প্রেম জীবন থাকিতে উচ্ছিন্ন হইবার নয়। অঙ্গুরীয় পুনর্দর্শন করিয়া দুষ্মন্ত যে ভয়ানক যন্ত্রণাভোগ করেন তাহাই তাঁহার শকুন্তলা-প্রেমের গাঢ়ত্বের পরিচয়। কিন্তু মহাকবি সে পরিচয় অপেক্ষা একটি সহস্রগুণে আশ্চর্য্য পরি-

চয় দিয়াছেন। দুর্ব্বাসার শাপে দুষ্মন্ত শকুন্তলাস্মৃতি হারাইয়াছেন। হারাইয়া একদিন মাধব্যের সহিত বসিয়া আছেন। এমন সময় একটি মনোহর গীতিধ্বনি শ্রবণ করিলেন। করিয়া তাঁহার মন এক অলৌকিকভাবে গলিয়া গেল। সেভাব এই :—

কিং নু খলু গীতমাকর্ণ্য ইষ্টজন বিরহাদৃতেঽপি বলবদুৎকণ্ঠিতোঽস্মি। অথবা
রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকী ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি॥

কই আমার ত কোন ইষ্টবস্তুর সহিত বিচ্ছেদ ঘটে নাই, তবে এই গীতশ্রবণ করিয়া আমার প্রাণ এত আকুল হইল কেন? অথবা কোন রম্য বস্তু দেখিলে বা কোন মধুর শব্দ শুনিলে সুখের অবস্থায়ও যে মানুষের মন আকুল হইয়া উঠে, সে বোধ হয় তখন পূর্ব্বজন্মের কোন সুদৃঢ় প্রণয়ের বস্তুকে অজ্ঞাতভাবে স্মরণ করে।

কি কোমল, কি গম্ভীর, কি পবিত্রভাব! এ ভাবের গাঢ়তা বিবেচনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়! যে বন্ধুত্ব জন্মান্তরপরিগ্রহেও স্মৃতিপথে থাকে সে বন্ধুত্ব কত পবিত্র, কত গাঢ়, কত মিষ্ট। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ভুলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু শকুন্তলার অস্ফুট স্মৃতি আজিও তাঁহার মনকে এই অলৌকিকভাবে পরিপূরিত করিতেছে। দুর্ব্বাসার শাপে দুষ্মন্তচিত্ত আজ শকুন্তলাসম্বন্ধে মহাপ্রলয়গ্রস্ত। কিন্তু সেই মহাপ্রলয়কেও ভেদ করিয়া সেই প্রেম ফুটিয়া উঠিতেছে। মহাপ্রলয়েও সে রকম প্রেমের লয় নাই। দুষ্মন্তের শকুন্তলা-প্রেম যথার্থই গাঢ়তম, পবিত্রতম, কোমলতম। কেনই বা সে প্রেম সে রকম না হইবে? শকুন্তলা শুধু তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্যের দ্বারা দুষ্মন্তকে পরাজয় করেন নাই। তাঁহার মানসিক সৌন্দর্য্যের দ্বারাও তিনি সেই পুরুষপ্রধানকে পরাজয় করিয়াছেন। দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা যে কয়দিন দম্পতিভাবে কণ্বের আশ্রমে ছিলেন, তাঁহাদের সে কয়দিনের জীবনপ্রণালীর বিষয় মহাকবি কিছু বলেন নাই। সে বিষয়টি তিনি পাঠকের দৃষ্টি হইতে যবনিকাচ্ছাদিত রাখিয়াছেন। একটিবারমাত্র একটি মুহূর্ত্তের জন্য সেই যবনিকার একটি পার্শ্ব সরাইয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তমধ্যে সেই সঙ্কীর্ণ দ্বার দিয়া মহাকবি এক আশ্চর্য্য নৈতিক বিপ্লব দেখাইয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে পুরুষপ্রধান, বীরপ্রধান দুষ্মন্ত শকুন্তলার কাছে বসিয়া শকুন্তলাময় হইয়াছেন, পুরুষের পৌরুষভাব হারাইয়া রমণীর রমণীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। পৌরবসভায় শকুন্তলা বলিতেছেন :—

ণং একস্সিং দিঅহে ণোমলিআ মণ্ডবে নলিনীপত্তভাঅণগঅং উদঅং তুহ হথে সন্নিহিদং আসি তক্খণং সো মে পুত্ত

ক্বিদক্খো দীহাপঙ্গো ণাম মিঅপোদক্খো উবচ্ছিদো। তুএ অস্মং দাব পটিমং পিঅউ ত্তি অনুঅম্পিনা উবচ্ছন্দিদো উঅ-এণ। ণ উণ দে অপরিচআদো হত্থ-ব্ভাসং উবগদো। পচ্ছা তস্মিং এব্ব মএ গহিদে সলিলে তেণ কিদ পণক্খো। তদা তুমং ইত্থং পহসিদো সি সব্বো সগন্ধেসু বিস্মসদি দুবে বি এত্থ আরণ্ণক্খো ত্তি।

একদিন আমরা উভয়ে নবমল্লিকা-মণ্ডপে বসিয়াছিলাম, আপনার হস্তে পদ্মপত্রের ঠোঙায় জল ছিল, তৎকালে আমার কৃত্রিম পুত্র দীর্ঘাপাঙ্গনামে সেই হরিণশিশু আসিয়া উপস্থিত হইল। এই তবে অগ্রে জলপান করুক ইহা বলিয়া আপনি স্নেহভরে তাহাকে নি-কটে ডাকিলেন, কিন্তু সে অচেনা বলিয়া আপনার নিকটে আসিল না। অনন্তর সেই জল আমি গ্রহণ করিলে সে আ-সিয়া পান করিল। আপনি তাহাতে উপহাস করিয়া বলিলেন, সকলেই স্বজনে বিশ্বাস করে, তোমরা দুজনেই জঙ্গলা কি না।

যে দুষ্মন্ত বীরবিক্রমে শাণিতশর হস্তে হরিণ তাড়না করিতে করিতে আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এখন সেই দুষ্মন্ত সেই আশ্রমে বসিয়া একটি বালিকার সহিত বালিকার ন্যায় হরিণের শুশ্রূষা করিতেছেন! কঠিনহৃদয় পুরুষপ্রধান কোমলহৃদয় বালিকা হইয়া পড়িয়াছেন! ক্ষুদ্র বালিকার হৃদয় সসাগরা পৃথিবীর রাজাকে পরাজয় করিয়াছে! এই নৈতিক পরাজয়ের গুণেই দুষ্মন্তের শকুন্তলা-প্রেম এত কোমল, এত গাঢ়, এত পবিত্র, এত স্বর্গীয়ভাবপূর্ণ। সে প্রেম এত বড় বিপ্লব ঘটাইয়াছে বলিয়াই মহাপ্রলয় ভেদ করিয়া ফুটিয়া উঠিতে পারিল। এবং সেই নিমিত্তই হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ দুষ্মন্ত হিন্দুপতির পদগৌরব বুঝিয়াও কশ্যপা-শ্রমে শকুন্তলার কাছে নতশিরে নতজানু হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার প্রেম এক আশ্চর্য্য পদার্থ। সে প্রেমের তুলনা নাই, পরিমাণ নাই, সীমা নাই। সে প্রেম একটি আশ্চর্য্য শক্তি। সেই শ-ক্তির গুণেই কোমলতাময়ী শকুন্তলা কণ্বের আশ্রম হইতে হস্তিনাপুর হাঁটিয়া গিয়াছিলেন। সে প্রেম একটি মন্ত্র। সেই মন্ত্রে আহত হইয়া শকুন্তলা দুর্ব্বা-সার ভয়ঙ্কর শাপ শুনিতে পান নাই। সে প্রেমের একটি প্রধান উপাদান বি-শ্বাস। দুষ্মন্ত তাঁহাকে গন্ধর্ব্ববিধানে বিবাহ করিয়া একটি অবধারিত সময়ের মধ্যে তাঁহাকে হস্তিনাপুরে লইয়া যাই-বেন বলিয়া চলিয়া গেলেন। গিয়া দুর্ব্বাসার শাপপ্রভাবে তাঁহাকে ভুলিয়া রহিলেন। এদিকে অবধারিত সময় অতীত হইয়া গেল। অনসূয়া দুষ্মন্তের উপর চটিয়া উঠিয়া তাঁহাকে গালি দিতে আরম্ভ করিলেন :—

পড়িবুদ্ধা বি কিং করিস্সং। ণ সে উইদেসু বি নিঅকরণিজ্জ হত্থপাআ পসা-রন্তি। কামো দানিং সাকামো হোদু

জেন অসচ্চসন্ধে জণে সুমহিঅম্মা পদং কারিদা।

কিন্তু শকুন্তলার রাগ হইল না। তিনি পতিকে সন্দেহ করিলেন না, গালি দিলেন না। তিনি মুগ্ধহৃদয়ে, সন্দেহশূন্যমনে পুনরায় পতিদর্শনপ্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। আশ্রম হইতে বিদায় গ্রহণকালে চক্রবাকের জন্য চক্রবাকীকে সকাতরে চীৎকার করিতে দেখিয়া তিনি অনসূয়াকে বলিলেন ঃ—

হলা পেক্খ নলিনীপত্তন্তরিদং বি সহঅরং অদেক্খন্তী আদুরা চক্কবাই আরড়দি দুক্করং অহং করেমি।

সখি, দেখ, চক্রবাক্ নলিনীপত্রের অন্তরালে আছে। চক্রবাকী তাহাকে দেখিতে না পাইয়া সকাতরে চীৎকার করিতেছে। কিন্তু আমি এতাবৎকাল আর্য্যপুত্রকে না দেখিয়া আছি। আমি দুষ্কর কার্য্য করিতেছি।

এ কথায় রাগ বা সন্দেহের চিহ্নমাত্র নাই। এ স্নেহের কথা, আদরের কথা, হৃদয়ের মিষ্টতার কথা। অবিশ্বাসীর সম্বন্ধে রমণী এমন কথা কয় না। আবার তখনই তাঁহার সখীদ্বয় তাঁহাকে বলিয়া দিলেন যে যদি দুষ্মন্ত তোমাকে চিনিতে না পারেন, তাহা হইলে তুমি তাঁহারই নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়টি দেখাইও। কথাটি শুনিবামাত্র শকুন্তলা একটিবার মাত্র যেন শিহরিয়া উঠিয়া পরক্ষণেই সব ভুলিয়া গেলেন। ভুলিয়া গিয়া পথিমধ্যে সেই অঙ্গুরীয়টিই হারাইয়া ফেলিলেন! প্রেমময়ী সরলাবালা পৃথিবীকে সরলহৃদয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিমা দেখাইলেন। সে হৃদয়ে প্রেমের বস্তসম্বন্ধে সন্দেহ স্থান পায় না। অগাধ প্রেম বিশ্বাসমূলক। যেখানে অগাধপ্রেম সেইখানেই এই রকম সরলতা। শকুন্তলার প্রেম এত অগাধ, এত বিশ্বাসমূলক, এত সরলতাময় না হইলে, তিনি সখীদ্বয়ের উপদেশ শুনিয়া অগ্রে অঙ্গুরীয়টি বস্ত্রাঞ্চলে আঁটিয়া বাঁধিতেন এবং মধ্যে মধ্যে খুঁজিয়া দেখিতেন সেটি যথাস্থানে আছে কি না। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। বোধ হয় কোন কোন বিজ্ঞ পাঠিকা বলিবেন যে শকুন্তলা বড় বোকা মেয়ে। আমরা বলি যে এমন সুমিষ্ট বোকা মেয়ে জগতের আর কোন কবির কল্পনায় উদ্ভূত হয় নাই। শকুন্তলা অগাধপ্রেমে মুগ্ধ থাকিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও পতিকে অবিশ্বাস করেন নাই এবং পতির নিকটে অন্যায়াচরণ আশঙ্কা করেন নাই। সরলাবালার প্রথম আশঙ্কা পতির কথা শুনিয়া জন্মিয়াছিল। গৌতমী এবং শার্ঙ্গরব যখন দুষ্মন্তকে শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতে বলিলেন তখন দুষ্মন্ত বলিলেন ঃ—

কিং চাত্রভবতী ময়া পরিণীতপূর্ব্বা।

ইহাকে কি আমি পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছি?

এবং তখনই শকুন্তলা ভাবিলেন ঃ—

হিঅঅ, সংপদং দে আসঙ্কা।*

* Monier Williams এ কথার এই অর্থ করিয়াছেন ঃ—O my heart, thy

এখন আমার হৃদয়ের একটি আশঙ্কার কারণ জন্মিল।

শকুন্তলার প্রেমের আর একটি প্রধান উপাদান সম্ভ্রম। শকুন্তলা যাঁহাকে পতিরূপে গ্রহণ করিয়া হৃদয় সমর্পণ করিয়াছেন তাঁহাকে সেই হৃদয়ের পূজ্য দেবতা বলিয়া সম্ভ্রম করেন। দুঃখভাগিনীর জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখপূর্ণ সময়ে এই পতি-সম্ভ্রম তাঁহাকে এক অনির্ব্বচনীয় শোভায় শোভিত এবং মহিমায় মহিমান্বিত করিয়াছিল। পতি-কর্ত্তৃক কুলটা বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়া শকুন্তলা পতিহীনার ন্যায় মলিনবেশে ভগ্নহৃদয়ে দীর্ঘকাল কঠোর ধর্ম্মাচরণে অতিবাহিত করিয়াছেন। সহসা সেই পতির সাক্ষাৎলাভ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই তাঁহার হৃদয় আনন্দোৎফুল্ল হইল। কিন্তু দুষ্মন্ত অনুতাপে শীর্ণ এবং বিবর্ণ হইয়াছেন বলিয়া তখনও তিনি পতিকে পতি বলিয়া ভাল চিনিতে পারেন নাই। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই দুষ্মন্তের কথা শুনিয়া তাঁহার সন্দেহ ঘুচিয়া গেল। তখন তিনি কি করিলেন? 'জেদু অজ্জউত্তো,' আর্য্যপুত্রের জয় হউক, অস্ফুটস্বরে এই কথা বলিবার পর বাষ্পাকুললোচনার কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল, তিনি নিস্তব্ধ হইলেন। শকুন্তলার দীর্ঘকালস্থায়ী দুঃখ এখন মুহূর্ত্তসম্বদ্ধ হইয়াছে। যে দুঃখ অনেক বৎসর ধরিয়া ভোগ করিয়াছেন, সেই দুঃখ এখন তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তকালের মধ্যে ভোগ করিতে হইল। যেন সুদীর্ঘ স্রোতস্বতী সহসা একমুষ্টিপরিমিত স্থলে গুটাইয়া পড়িয়া বিপরীত তেজে উৎসাকারে উঠিতে লাগিল। এ রকম মুহূর্ত্ত একটি ভয়ানক পরীক্ষা। সে পরীক্ষায় রমণী প্রায়ই ভাঙ্গিয়া পড়েন। তিনি হয় মূর্চ্ছাপন্ন হন, না হয় পতির গলা জড়াইয়া ধরিয়া মূর্চ্ছা নিবারণ করেন। ইউরোপীয় সাহিত্যে এ কথার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায় কিন্তু সে পরীক্ষায় শকুন্তলার সে রকম কিছুই হইল না। তিনি আশ্চর্য্য গাম্ভীর্য্যসহকারে অটলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এ গাম্ভীর্য্যের মূল পতি-সম্ভ্রম। যেখানে সম্ভ্রমের আধিক্য সেইখানেই অসীম শক্তি, অসীম গাম্ভীর্য্য—সেখানেই দুর্ব্বলতা দেখাইতে লজ্জা হয়, মন আপনিই দৃঢ় এবং মহিমাপূর্ণ হইয়া উঠে। সে শক্তি, সে গাম্ভীর্য্য, সে মহিমা অতীব মনোহর। যখন দেহ এবং মন ভাঙ্গিয়া পড়িবার কথা তখন যে অটল এবং গম্ভীর হইয়া থাকে সে জগতের একটি প্রধান সৌন্দর্য্য এবং আরাধ্য বস্তু। শকুন্তলা হিন্দু-পত্নী বলিয়াই এত অটল, এত গম্ভীর, কেন না হিন্দুপত্নীই পতিকে শ্রেষ্ঠতম

worst misgivings are confirmed. যেন শকুন্তলা পূর্ব্বাবধি এই রকম আশঙ্কা করিতেছিলেন! কিন্তু তাহা হইলে শকুন্তলার চরিত্র, শকুন্তলার হৃদয় কলঙ্কিত করা হয়। বোধ হয় পণ্ডিতবর সে চরিত্র এবং সে হৃদয় বুঝিতে পারেন নাই।

বলিয়া পরম সম্ভ্রমের সহিত ভালবাসেন। হিন্দুপত্নীর হিন্দুপত্নীত্ব কেহ যেন ঘুচায় না! হিন্দুপত্নীকে ইউরোপীয় পত্নীর ন্যায় সাম্যবাদিনী করিলে তাঁহার হিন্দুপত্নীত্ব ঘুচিয়া যাইবে। কিন্তু সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, শুভাদৃষ্টবশত জগতের শুশ্রূষা যে ভাগ্যবতীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম তাহার পক্ষে পুরুষজাতির সম্বন্ধে সাম্যভাব অপেক্ষা সম্ভ্রমের ভাব বেশী উপযোগী এবং উপকারী।

শকুন্তলার হৃদয় এক আশ্চর্য্য পদার্থ। সে হৃদয়ের ভালবাসা অগাধ, বিশ্বাস অগাধ, স্নেহ অগাধ, সম্ভ্রমকারিতা অপরিমেয় কোমলতা অনির্ব্বচনীয়, সরলতা চমৎকারিণী। সে হৃদয়ের কাছে পুরুষপ্রধান দুষ্মন্ত চিরকালের জন্য পরাজিত। সে হৃদয়ের মৃদুমধুর নিশ্বাসে দুর্দ্দমনীয় রিপুপরবশ দুষ্মন্তহৃদয় এক আশ্চর্য্য নৈতিকবিপ্লবে চিরসংস্কৃত। সে হৃদয় জগতের একটি আবশ্যকীয় মহোপকারী নৈতিক শক্তি। পুরুষজাতির সংস্কার এবং উন্নতির নিমিত্ত সে হৃদয়ের সৃষ্টি।

রত্নতত্ত্ব।

আমরা বঙ্গদর্শনে যে "রত্নরহস্য" নামক প্রস্তাব লিখিতে আরম্ভ করি, এ প্রস্তাব তাহারই অবয়বমাত্র। পূর্ব্বপ্রকাশিত প্রস্তাবে মুক্তাসম্বন্ধীয় কতিপয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া মুক্তার জাতিনির্ণয় প্রভৃতি প্রকাশ করা হইয়াছিল, সম্প্রতি তাহার দোষ, গুণ, বর্ণ ও মূল্যাদি নিরূপণবিষয়ক কতিপয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া উপস্থিত প্রবন্ধ লিখিত হইল। পুরাতনকালের তত্ত্ববিৎ লোকেরা কিরূপে মুক্তাপরীক্ষা করিতেন, তাহা বিবৃত করা যাইতেছে।

মৎস্যপুরাণের মতে মুক্তাফলের গুণ প্রধানতঃ ৮ আটটী এবং দোষও প্রধান কল্পে ১০টী। তন্মধ্যে ৪টী মহাদোষ এবং ৬টি মধ্যম দোষ, অগ্রে ইহার যথাক্রমে গুণ সকল বর্ণনা করা যাইতেছে পশ্চাৎ দোষের বিষয় বর্ণিত হইবেক।

গুণ যথা।

"সুতারঞ্চ ১ সুবৃত্তঞ্চ ২ স্বচ্ছঞ্চ ৩ নির্ম্মলত্বথা ৪।
ঘনং ৫ স্নিগ্ধঞ্চ ৬ সচ্ছায়ং ৭ তথা-
স্ফুটিত ৮ মেব চ।
অষ্টৌ গুণাঃ সমাখ্যাতা মৌক্তিকানাং
মহেশ্বরঃ।

মৎস্যপুরাণ।

রত্নতত্ত্ববিৎপণ্ডিতেরা মুক্তাফলের যে ৮টি মহাগুণ নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার প্রত্যেকের নাম এই—সুতার (১) সুবৃত্ত

(২) স্বচ্ছ (৩) নির্ম্মল (৪) ঘন (৫) স্নিগ্ধ (৬) সচ্ছায় (৭) ও অস্ফুটিত (৮)।

"সুতার" নামক গুণ কাহাকে বলে তাহা উক্ত হইতেছে যথা—

তারকাদ্যুতিসংকাশং "সুতার" মিতি গদ্যতে।"

গগনমণ্ডলস্থ তারকার ন্যায় দ্যুতি-বিশিষ্ট হইলে, মুক্তার সে গুণটির নাম "সুতার।" এই সুতার-মুক্তা অতি দুর্লভ।

সুবৃত্তগুণ কি তাহাও উক্ত হইয়াছে, যথা—

"সর্ব্বতো বর্ত্তুলং যচ্চ সুবৃত্তং তন্নি-গদ্যতে।"

যাহা সকল দিকে সমান সুগোল তাহা "সুবৃত্ত।"*

স্বচ্ছ গুণ যথা—স্বচ্ছং দোষবিনির্ম্মুক্তং।" ৪ প্রকার মহাদোষ ও ছয় প্রকার মধ্যম দোষ না থাকিলে, তাহা "স্বচ্ছ" বলিয়া ব্যবহৃত হয়।

নির্ম্মল গুণ যথা—"নির্ম্মলং মলবর্জ্জিতং।" মলরহিত হইলেই সে নির্ম্মল ইহা সকলেই বিদিত আছেন।

ঘনগুণ যথা—"গুরুত্বং তুলনে যস্য তদ্ঘনং মৌক্তিকং বরম্।" যাহা ওজনে ভারি তাহা ঘন। এই ঘন মুক্তা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

স্নিগ্ধগুণ যথা—"স্নেহেনৈব বিলিপ্তং যত্তৎস্নিগ্ধমিতি গদ্যতে।" যাহা স্নেহ (ঘৃত তৈলাদি) ম্রক্ষিতের ন্যায় দেখায়, তাহা স্নিগ্ধ গুণ বলিয়া খ্যাত।

সচ্ছায়গুণ যথা—"ছায়াসমন্বিতং যচ্চ সচ্ছায়ং তন্নিগদ্যতে।" যে মুক্তার কোন না কোন ছায়া (কান্তি) বর্ত্তমান থাকে, তাহা সচ্ছায় মুক্তা নামে কথিত হয়। (মুক্তাফলের ছায়া কি? তাহা ছায়া-পরীক্ষাস্থলে প্রকাশ পাইবে।)

অস্ফুটিতগুণ—"ব্রণরেখাবিহীনং যত্তৎ-স্যাদস্ফুটিতং শুভম্।"

যে মুক্তার ব্রণ অর্থাৎ কোন প্রকার ছিদ্রাকার চিহ্ন নাই বা কোন প্রকার রেখা নাই, সেই (বেদাগ) মুক্তা অস্ফুটিত বলিয়া গণ্য এবং তাহা অতীব শুভদায়ক। বস্তুতঃ বেদাগ মুক্তাই মূল্যবান্।

মুক্তাসম্বন্ধীয় নির্দ্দিষ্ট ৮টি গুণের কথা বলা হইল। বস্তুতঃ এতদ্ভিন্ন অন্য কয়েকটি লক্ষণ আছে, যাহা থাকিলে রত্নতত্ত্বপরীক্ষকেরা তাদৃশ মুক্তাকে মহারত্ন বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন, সেই কয়েকটি মহাগুণ এই—

"ভ্রাজিষ্ণু কমলং কান্তং মনোজ্ঞং স্ফুর-তীব চ।
স্রবতীব চ স্বস্থানি তন্মহারত্ন সংজ্ঞিতম্।"

অপিচ,

"শ্বেতকাচসমাকারং শুভ্রাংশুশত-যোজিতম্।"
শশিরাজপ্রতিচ্ছায়ং মৌক্তিকং দেব-ভূষণম্।"

* মুক্তাফলের গঠন নানাপ্রকার (নিম্বফল, চিপিটক, ধান্য, প্রভৃতি) হইয়া থাকে, তন্মধ্যে সুবৃত্ত গুণের মুক্তা অতি মূল্যবান্।

ভ্রাজিষ্ণু—দীপ্তিবিশিষ্ট। কোমল—লাবণ্যযুক্ত। কান্তং—ইচ্ছোদ্রেককারী গুণবিশিষ্ট। মনোজ্ঞ—মনোহর। যদি এই সকল গুণ থাকে, আর স্ফূরণ হয় অর্থাৎ যদি আলোক বহির্গত হওয়ার ন্যায় এবং তেজ গলিয়া পড়ার ন্যায় দেখায়, তবে তাদৃশ মুক্তা মহারত্ন নামে ব্যবহৃত হয়। এবং যে মুক্তা স্বচ্ছ ও সুশুভ্র কাচের সদৃশ আকারবিশিষ্ট ও চন্দ্ররশ্মিতুল্য ছায়াযুক্ত হয়, সে মুক্তা দেবভূষণ অর্থাৎ দুর্লভ। ফলতঃ গ্রন্থান্তরে মূল্যবান্ উত্তম মুক্তার সাধারণ লক্ষণ এইরূপে নির্ণীত হইয়াছে। যথা—

প্রমাণবদ্গৌরবরশ্মিযুক্তং
সিতং সুবৃত্তং সমসূক্ষ্মরন্ধ্রং।
অক্রেতুরপ্যাবহতি প্রমোদং।
যন্মৌক্তিকং তদ্গুণবৎ প্রদিষ্টং।”

‘প্রমাণবৎ’ অর্থাৎ দেখিতে বড়। ‘গৌরব, অর্থাৎ ওজনে ভারি। রশ্মি অর্থাৎ তেজোময় লাবণ্য। যদি এই কয়েকটি গুণ থাকে, আর বর্ণ শুভ্র, গঠনে সুগোল, ছিদ্রে সমান ও সূক্ষ্মতা থাকে, দেখিলে অক্রেতারও আমোদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেই মুক্তার গুণ আছে বলা যায়।

প্রাচীন রত্নশাস্ত্রে এইরূপ মুক্তাসম্বন্ধীয় বহুতর গুণের বিচার করা হইয়াছে, বৃথা প্রস্তাববৃদ্ধির ভয়ে তাহার উল্লেখ করা হইল না। মুক্তাসম্বন্ধীয় যে সকল দোষের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে গরুড়পুরাণোক্ত কয়েকটি প্রবল প্রবল দোষের বিষয় বর্ণনা করা যাইতেছে।

মুক্তাসম্বন্ধে যে সমস্ত দোষ আছে, তন্মধ্যে ৪টি মহাদোষ, ৬টি মধ্যম দোষ, এবং এতদ্ভিন্ন দুই একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষও আছে। যথা—

“চত্বারঃ স্যু র্মহাদোষাঃ ষন্মধ্যাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
এবং দশ সমাখ্যাতা স্তেষাং বক্ষ্যামি লক্ষণম্।”
“শুক্তি১লগ্নশ্চ মৎস্যা২ক্ষো জঠর৩শ্চাতিরক্ত৪কম্।
ত্রিবৃত্ত৫ঞ্চ চিপীটঞ্চ৬ ত্র্যস্রং৭ কৃশক৮মেব চ॥
কৃশ৯পার্শ্বমবৃত্তঞ্চ১০ মৌক্তিকং দোষবস্তবেৎ॥”

মুক্তাসম্বন্ধে চারিটি মহাদোষ এবং ছয়টি মধ্যমদোষ। সর্ব্বসমেত দশটি দোষ রত্নপরীক্ষকগণ কর্ত্তৃক আখ্যাত হইয়াছে। এই দশটি দোষের নাম ও লক্ষণ ক্রমে বলা যাইতেছে।

শুক্তিলগ্ন, মৎস্যাক্ষ, জঠর ও অতিরক্ত; এই চারিটি মহাদোষ বলিয়া গণ্য। ত্রিবৃত্ত, চিপীট, ত্র্যস্র, কৃশ, কৃশপার্শ্ব ও অবৃত্ত, এই ছয়প্রকার দোষ মধ্যম বলিয়া খ্যাত। প্রথমোক্ত শুক্তিলগ্ন প্রভৃতির লক্ষণাদি কিরূপ? তাহা উল্লিখিত কল্পদ্রুমধৃত গরুড়পুরাণের প্রমাণেই নির্দ্দিষ্ট আছে যথা—

১ শুক্তিলগ্ন—“যত্রৈকদেশে সংলগ্ন শুক্তিখণ্ডো বিভাব্যতে

শুক্তিলগ্নঃ সমাখ্যাতঃ সদোষঃ
কুষ্ঠকারকঃ।”

যে মুক্তার কোন এক প্রদেশে ভগ্ন শুক্তিখণ্ড (ঝিনুকের শক্ত) সংশ্লিষ্ট থাকে, তাহা “শুক্তিলগ্ন” নামে খ্যাত এবং তাহা কুষ্ঠরোগের আকর্ষক।

২ মৎস্যাক্ষ।—“মীনলোচনসঙ্কাশো দৃ-
শ্যতে মৌক্তিকেতু যঃ।
মৎস্যাক্ষঃ স তু দোষঃ
স্যাৎ পুত্রনাশকরো ধ্রুবম্।”

কোন কোন মুক্তার কোন কোন প্রদেশে মৎস্যের চক্ষুর ন্যায় একপ্রকার চিহ্ন দেখা যায়। ঐরূপ দৃশ্যটিকে মৎস্যাক্ষ বলে। এই মৎস্যাক্ষ মুক্তা ধারণ করিলে ধারকের পুত্রনাশ হইয়া থাকে।

৩ জঠর।—“দীপ্তিহীনং গতচ্ছায়ং জঠ-
রং তদ্বিদুর্বুধাঃ।
তস্মিন্ সন্ধারিতে মৃত্যুর্জায়তে নাত্র-
সংশয়ঃ।”

যাহার দীপ্তি ও ছায়াবিহীন, তাহার নাম “জঠর।” এই জঠর জাতীয় মুক্তা ধারণ করিলে মৃত্যুপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

৪ অতিরক্ত।—“মৌক্তিকং বিদ্রুমচ্ছায়
মতিরক্তং বিদুর্বুধাঃ।
দারিদ্রজনকং যস্মাৎ তস্মাত্তৎ-
পরিবর্জ্জয়েৎ॥”

কোন কোন স্থানের মুক্তায় প্রবালের ন্যায় রক্তাভা জন্মিয়া থাকে, সেই সকল মুক্তা রত্নশাস্ত্রে “অতিরক্ত” নামে নির্দ্দিষ্ট হয়। তাহা ধারণ করিলে দরিদ্রতা জন্মে বলিয়া এই শ্রেণীর মুক্তা বর্জ্জন করিবেক।

৫ ত্রিবৃত্ত।—“উপর্য্যুপরি তিষ্ঠন্তি ব-
লয়ো যত্র মৌক্তিকে।
ত্রিবৃত্তং নাম তৎপ্রোক্তং
সৌভাগ্যক্ষয়কারকম্।”

যে মুক্তায় উপর্য্যুপরি বলি অর্থাৎ স্তরের ন্যায় রেখা থাকে তাহার নাম “ত্রিবৃত্ত।” এই ত্রিবৃত্ত মুক্তাধারণে সৌভাগ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৬ চিপীট।—“অবৃত্তং মৌক্তিকং যচ্চ
চিপীটং যন্নিগদ্যতে।
মৌক্তিকং ধ্রিয়তে যেন
তস্যাকীর্ত্তির্ভবেৎ সদা।”

যাহা “চিপীট” বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা অবৃত্ত মধ্যে গণ্য (অর্থাৎ সুগোল নহে) যে মনুষ্য এই “অবৃত্ত” মুক্তা-ধারণ করে, সে সর্ব্বদাই অযশোভাগী হয়।

৭ ত্র্যস্র।—“ত্রিকোণং ত্র্যস্রমাখ্যাতং
সৌভাগ্যক্ষয়কারকম্।”

ত্রিকোণাকারে যে মুক্তার গঠন নিষ্পন্ন হয়, তাহা “ত্র্যস্র” নামে খ্যাত। ত্র্যস্র মুক্তা সৌভাগ্যের হানিকর।

৮ কৃশ।—“দীর্ঘং যত্তৎ কৃশং প্রোক্তং
প্রজ্ঞাবিধ্বংসকারকম্।”

দীর্ঘাকার মুক্তা “কৃশ” সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়। এই মুক্তা বুদ্ধিনাশক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

৯ কৃশপার্শ্ব।—নির্ভয় মেকতো যচ্চ কৃশ-
পার্শ্বং তদুচ্যতে।”

যাহার কোন এক প্রদেশ ভগ্ন বা ভগ্ন প্রায় অথবা নির্ভগ্ন অর্থাৎ বক্র বা বন্ধুর, তাহাকে "কৃশপার্শ্ব" বলা যায়। এই কৃশপার্শ্ব মুক্তাও নিন্দনীয়।

১০ অবৃত্ত।—অবৃত্তঃ পিড়কোপেতঃ সর্ব্ব সম্পত্তি হারকম্।"

† পিড়কাযুক্ত মুক্তাফল "অবৃত্ত" নামে ব্যবহৃত হয়। এই অবৃত্তমুক্তা ধারণ করিলে সকল সম্পত্তি নষ্ট হয়।

অতঃপর বক্তব্য এই যে, মুক্তাসম্বন্ধে গুণ ও দোষ যাহা পুরাতন রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নির্ব্বাচন করিয়া গিয়াছেন, তাহার সমুদয় সঙ্কলন করা দুঃসাধ্য ও নিষ্প্রয়োজন। এ বিষয়ে অবশ্য জ্ঞাতব্য স্থূল স্থূল বিষয়গুলি সংক্ষেপে ব্যক্ত করা [হইল। পূর্ব্বে যে মধ্যে মধ্যে মুক্তা-সম্বন্ধীয় ছায়া ও কান্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহার অভিপ্রায় পরে বিশদরূপে ব্যক্ত করা যাইবে। ফলতঃ কান্তি ও ছায়ার প্রভেদ এই যে, মুক্তার লাবণ্যবিশেষের নাম কান্তি আর বর্ণবিশেষের নাম] ছায়া। "ভরতরসপ্রকরণ" নামক গ্রন্থে মুক্তাফলের কান্তির সহিত উপমা দিয়া "লাবণ্য কাহাকে বলে?" তাহা বুঝান হইয়াছে। মুক্তাতে যে একপ্রকার টল্‌টলে চিক্কণভাব দৃষ্ট হয়, তাহাই স্ত্রীশরীরের লাবণ্য।

ক্রমশঃ।

শ্রীরামদাস সেন।

পশ্চিমদেশে বাঙ্গালার জ্বর।

শুনা যায়, বাঙ্গালার প্লীহাজ্বর ইদানীং দিল্লী, লাহোর পর্য্যন্ত জয় করিয়াছে। বাঙ্গালির পক্ষে ইহা স্পর্দ্ধার বিষয় বটে। ওলাউঠার জন্ম বাঙ্গালায়, এক্ষণে সেই ওলাউঠা পৃথিবী রসাতল দিতেছে। আবার বাঙ্গালার জ্বর বাঙ্গালার আল অতিক্রম করিয়াছে, এখন বাঙ্গালার নাম সর্ব্বত্র সর্ব্বকণ্ঠে উচ্চারিত হইবে।

কুলবধূর ন্যায় বাঙ্গালার জ্বর চিরকাল বাঙ্গালায় বদ্ধ ছিল, কখন ঘরের বাহির হয় নাই, কখন এদিক ওদিক নজর করে নাই; এক্ষণে আবার এ নূতন প্রবৃত্তি তাহার কেন হইল বলা যায় না। বাঙ্গালির ছেলেরা ভারতবর্ষের সাবেক সীমা কেন উল্লঙ্ঘন করিতে আরম্ভ করিয়াছে তাহা বুঝা যায়, কিন্তু জ্বর কেন আপন ঘরের বাহির হইল তাহা বুঝা যায় না।

বাঙ্গালার জ্বর পশ্চিমদেশে কেন গেল এই লইয়া এখানে সেখানে আন্দোলন হইতেছে; অনুসন্ধানে ইহা নিশ্চিত

† ফুসকুড়ির ন্যায় চিহ্নকে পিড়কা বলে।

হইয়াছে যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে নির্ম্মিত হওয়ার পর পশ্চিমাঞ্চলে এই জ্বর গিয়াছে। কাজেই সকল তর্ক মন্দীভূত হইয়া শেষ দুইটি অকাট্য কারণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, একটি এই যে বাঙ্গালার জ্বর রেলের গাড়ি চড়িয়া পশ্চিমে গিয়াছে। অপর হেতু, এই যে রেলওয়েরদ্বারা পয়ঃপ্রণালী রুদ্ধ হওয়ায় পশ্চিমে জ্বর আরম্ভ হইয়াছে।

উভয় হেতুই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। গাড়ির সুবিধা হইয়াছে, অতএব বাঙ্গালার জ্বর যে তীর্থযাত্রা করিতে যাইবে তাহা সম্পূর্ণ সম্ভব। আবার রেলওয়েদ্বারা পয়ঃপ্রণালী যে রুদ্ধ হইয়াছে, তাহাও নিশ্চয়। বিশেষতঃ, সকলেই বলে যে, কেবল রেলয়ের নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহেই এই জ্বর প্রবেশ করিয়াছে, দূরগ্রাম সমুদয় পূর্ব্ববৎ সচ্ছন্দে আছে।

কিন্তু যাঁহারা বলেন যে, গাড়ী চড়ে জ্বর পশ্চিমে গিয়াছে; তাহারা সামান্য লোক হউক তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অধিক, অতএব বহুতর ব্যক্তির সঙ্গ ছাড়িয়া অনকতক লোকের অনুসরণ করিতে পারা যায় না। আমরাও কাজেই বহুচেষ্টা করিয়া সেই বহুজনদলভুক্ত হইয়াছি।

আমরা একবার রেলওয়ে উঠিয়া হুগলী হইতে বর্দ্ধমানে যাইতেছিলাম, দুই এক ক্রোশ গেলে একটি ঝিল্লী অর্থাৎ ঝিঁঝিঁপোকা মাঠ হইতে উড়িতে উড়িতে আমাদের গাড়ীতে প্রবেশ করিল, এবং গাড়ীর ভিতর উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। গাড়ী বায়ুবেগে ছুটিতেছে, কিন্তু তথাপি ঝিল্লী আপন বেগ বাড়াইল না; মাঠে যেরূপ নবাবি চালে ঘুরিয়া, ফিরিয়া, উঠিয়া, নামিয়া উড়িতেছিল, সেইরূপ উড়িতে লাগিল এবং ক্রমে আমাদের সঙ্গে প্রায় দশ ক্রোশ পথ গেল। ট্রেণের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে যে দুই একটি নীলকণ্ঠ বা কাক উড়িতেছিল, তাহারা দুই মিনিটের মধ্যে পশ্চাতে পড়িতে লাগিল; কিন্তু ঝিল্লী দশক্রোশ পথ ক্রীড়া করিতে করিতে গেল। মাঠে উড়িলে ঝিল্লী শতহস্তও ট্রেণের সঙ্গে যাইতে পারিত না; কিন্তু গাড়ীর ভিতর উড়িতেছিল বলিয়া দশক্রোশ গেল। ইহাতে এই উপলব্ধি হইতে পারে যে, ঝিল্লী যে বায়ুতে উড়িতেছিল, সে বায়ু গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিল, মাঠের বায়ুর ন্যায় গাড়ীর পশ্চাতে পড়িতেছিল না। যদি এ কথা সত্য হয় যে, গাড়ীর ভিতরের বায়ু গাড়ীতেই থাকিয়া যায়, তাহা হইলে বাঙ্গালার বায়ু প্রত্যহ বহুপরিমাণে পশ্চিমে চালান যাইতেছে স্বীকার করিতে হইবে। নিত্য ত অল্প গাড়ী যায় না! বাঙ্গালার বিষ এক্ষণে কাজেই পশ্চিমে অনায়াসলভ্য হইয়াছে। এই জন্য রেলওয়ের ধারেই বাঙ্গালার জ্বর প্লীহা, দেখা যায়, অন্যত্র একেবারে নাই।

বঙ্গদর্শন।

সপ্তমবৎসর।

৭৯ সংখ্যা।

নূতন খাজানার আইন সম্বন্ধে কলিকাতা রিবিউএর মত।

রেণ্টকমিশনের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। প্রায় বৎসরাবধি ধরিয়া এই রিপোর্ট প্রস্তুত হইয়াছে। যেমন বড় ঝড় বৃষ্টির আগে সব নিথর হইয়া যায়, জল থমথমে মারিয়া যায়, গাছপালার পাতা পর্য্যন্ত নড়ে না, রিপোর্ট বাহির হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালার রাজনৈতিকক্ষেত্র সেই রূপই ছিল। যেমন নিস্তব্ধ বিস্তীর্ণ হ্রদে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে চারিদিক্ আলোড়িত হইয়া উঠে, নিস্তব্ধ সংবাদ-পত্রসমূহমধ্যে ২১শে জুলাইয়ের রিপোর্ট পড়িয়াও ঠিক তাহাই হইয়াছে। রিপোর্ট বিল ও কাগজপত্র লইয়া স্পেশাল গেজেটখানির পত্রসংখ্যা ৫০৪। সকলের পড়িবার অবসর হয় নাই, হইবার কথাও নাই অথচ সকলেই আপন আপন মত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। কেহ বলিলেন, হাজার রিপোর্ট কর, আর বিলই কর, রায়তের সঙ্গে স্থায়ী বন্দোবস্ত না করিলে কিছু হইবে না। কেহ বলিলেন, বাপু যা ছিল বেশ ছিল, আবার কেন ঘুমন্ত বাঘ জাগান হয়। কেহ বলিলেন, জমীদারের সর্ব্বনাশ হইল, কেহ বলিলেন, প্রজার শোষণ করাই রাজার উদ্দেশ্য। এই সমস্ত গোলযোগের মধ্যে কলিকাতা রিবিউ উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন ঃ—

The permanant settlement is a great accomplished fact in Bengal, and can already claim an antiquity of nearly a century; it has only just recovered from the position of unstable equilibrium into which it was—we still cling to the belief—unintentionally thrown by the Act X of 1859. The elaborate draft Bill in two parts is designed to upset it, it does not

purpose this and that minor alteration in the multiform system of rights which has grown under the shadow of the permanant settlement, but it deliberately aims a decisive blow at its fundamental condition;

'—But that two handed engine
at the door
Stands ready to smite, once and
smite no more.'

অর্থাৎ দশসালা বন্দোবস্তে যে সব স্বত্ব জমীদারকে দেওয়া হইয়াছিল, ৫৯ সালের ১০ আইনেই তাহার প্রায় সবই লোপ হইয়াছে, যাও কিছু ছিল এইবার তাহাও গেল। আইন সাঁকারির করাত হইয়া দাঁড়াইল আগু হইলেও কাটিবে পিছু হইলেও কাটিবে।

এই সম্বন্ধে কলিকাতা রিবিউএর প্রবন্ধ ৫২ পৃষ্ঠা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রধান ছাত্রের লেখা। যেমন কলমের জোর, তেমনি লেখার বাঁধনি, তেমনি সূক্ষ্ম দৃষ্টি। কিন্তু হইলে কি হয় লেখা দেখিলেই বোধ হয় কোন উকীলের বক্তৃতা; কেবল মক্কেলের দিকেই টান। লেখার সবই ভাল কেবল গৌতম আর আরিষ্টটালের পিণ্ডদান ও আদ্যশ্রাদ্ধ। আজি কালি যদি গৌতম ঋষি সূত্র নির্ম্মাণ করিতেন তাঁহাকে Fallacy chapterএর হেত্বাভাস ছল জাতিনিগ্রহস্থানের উদাহরণের জন্য আর কোথাও যাইতে হইত না। এক আশুবাবুর প্রবন্ধমধ্যেই সব পাইতেন।

প্রবন্ধটী ইংরেজিতে লিখিত; কিন্তু ইংরেজি যেই পড়িয়াছে সেই হাসিয়াছে বাস্তবিক ইংরেজিতে তাহার খণ্ডন অনাবশ্যক। এইজন্য বাঙ্গালায়ই তাহার খণ্ডন করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি।

যুক্তিখণ্ডনের পূর্ব্বে একটি কথা বলা আবশ্যক। প্রবন্ধলেখক State Literature এর উপর বড় চটা, তাঁহার মতে আইন পাশ হইবার পূর্ব্বে যে সকল মিনিট, রিপোর্ট, ও অন্যান্য লেখালেখি চলে সে সকল ত্যাগ করাই লোকের কর্ত্তব্য। তিনি চান যে, লোকে আইনে যা আছে তাহারই অনুযায়ী হইয়া কার্য্য করুক। কিন্তু আইনের অর্থবিষয়ে সন্দেহ হইলে যেখানে ব্যাখ্যা বুদ্ধিবলাপেক্ষার উপর নির্ভর করিতে হইবে, সেখানেও মিনিট রিপোর্ট ইত্যাদির পাঠের প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমাদের মতে ঐ রিপোর্ট আদি অমূল্য, উহারা আইনের অর্থবৈশদ্য পক্ষে যেরূপ সাহায্য করে এত আর কিছুতেই করে না। লেখক ষ্টেট লিটরেচরের উপর চটা অথচ আত্মস্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনিও Pemberton Leigh সাহেবের মত উদ্ধার করিতে কসুর করেন নাই। (৩৫৯ পৃঃ)

তিনি বলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কণ্ট্রাক্ট বই ত নয়। যেমন নোট কণ্ট্রাক্ট তেমনি উক্ত বন্দোবস্তও কণ্ট্রাক্ট। চুক্তি অতি জটিল এজন্য অনেকে উহার অনেক

প্রকার অর্থ করিয়া থাকে। তথাপি উহা চুক্তি ভিন্ন আর কিছু নহে। এই চুক্তিতে বর্ত্তমান জমীদারদল যে লাভ-প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহারা তাহার পূর্ণ মূল্য দিয়াছেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আমাদের মতে উহা চুক্তি নহে উহা আইন; ব্যবস্থাপক সমাজদ্বারা বিধিবদ্ধ; উহা হইতে অনেক চুক্তি উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু উহা নিজে চুক্তি নহে। যদি চুক্তি হয় কে কে সে চুক্তি করিল? গবর্ণমেণ্ট আর জমীদার। প্রজা এ চুক্তির মধ্যে কেহ নহে। যাহার দ্রব্য তাহার মত না লইয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া সামান্য কর্ম্মচারীকে ভূস্বামী বলিয়া প্রকাশ করিবার গবর্ণমেণ্ট কে?

পারমানেণ্ট সেটলমেণ্ট যদি চুক্তি হয় তবে উহা চোরের চুক্তি আইনমতে উহার কোন মূল্য নাই। যদি আশুবাবুর কথামত উহা চুক্তি,সিদ্ধ চুক্তিই হয়, তবে উহা দ্বারা কি প্রজাদের ভূস্বত্ব বাজেয়াপ্ত করা হয় নাই। উহা কি যথেচ্ছাচার প্রণালীর চূড়ান্ত নিদর্শন নহে? তাহা হইলে এক কলমের ঘায় ৩ কোটী প্রজার সমস্ত জমীস্থ স্বত্ব কাড়িয়া লইয়া জন কতক ধনী লোককে ভূমিতে নির্ব্যূঢ় স্বত্ববান বলিয়া স্বীকার করা,ঘোর মূর্খতার কর্ম্ম হইয়াছে। এমন পারমানেণ্ট সেটলমেণ্ট যত শীঘ্র উঠিয়া যায় ততই ভাল।

আরও এক কথা, যদি এই বন্দোবস্ত চুক্তিই হয়—যদি উহা আশুবাবু যাহা বলিয়াছেন তাই হয়,—যদি সমস্ত ইতিহাসের মুণ্ডপাত করিয়া সমস্ত যুক্তির শ্রাদ্ধ করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চুক্তিই হয় তথাপি জমীদারেরা চুক্তিভঙ্গ অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। ১৭৯৩ অব্দের প্রথম রেগুলেশনের সপ্তম ধারায় লিখিত আছে—

To discharge the revenues at the stipulated periods without delay or evasion and to conduct themselves with good faith and moderation towards their dependant Talukdars and Ryots, are duties at all times required from the proprietors of land and a strict observance of those duties is now more than ever incumbent upon them in return for the benifits which they will themselves derive from the ordes now issued.

যদি দশশালা বন্দোবস্ত চুক্তিই হয় তবে প্রজাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করাও সে চুক্তির এক করার। কিন্তু জমীদারেরা কি এই করারমত কাজ করিয়াছেন? তাঁহারা কি প্রজাদিগের প্রতি সত্য সত্যই good faith and moderation দেখাইয়াছেন। দশশালা বন্দোবস্ত ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চিরস্থায়ী হইয়াছে। আজিও একশত বৎসর পূর্ণ হয় নাই; ইহারই মধ্যে খোদকস্ত রায়তের নাম লোপ হইয়াছে। শরগণা

নিরীথ,—যাহার অধিক থাজনা আদায় করা চিরদিন আইনবিরুদ্ধ,—প্রথাবিরুদ্ধ এবং যুক্তিবিরুদ্ধ,—জমীদারেরা উঠাইয়া দিয়াছেন। সর্ব্বত্র আইনসঙ্গত হউক আর নাই হউক, খাজনার বৃদ্ধি লইয়া টানাটানি করিয়াছেন। তাঁহাদের জ্বালায় কত প্রজা দেশত্যাগ করিয়াছে। কত স্থানে গৃহদাহ গ্রামদাহ করিয়া তাঁহারা প্রজাকে উৎখাত করিয়াছেন। স্থানে স্থানে তাহাদের প্রতি এতই অত্যাচার করা হইয়াছে যে, বঙ্গদেশীয় নির্জীব, নিরীহ প্রজাগণও আর সহ্য করিতে না পারিয়া বিদ্রোহী হইয়াছে। এই কি তাঁহাদের good faith and modera-tion? কর্ণোয়ালিস তাঁহাদিগকে যে করারে দশশালা বন্দোবস্ত রূপ চুক্তি দিয়াছেন সে করার কি ভঙ্গ হয় নাই? একপক্ষ হইতে করার ভঙ্গ হইলে সে চুক্তি কি বাতিল ও নামঞ্জুর হয় না? অতএব শুদ্ধ এই এক করারভঙ্গ অপ-রাধ বশতঃ দশশালা বন্দোবস্ত কি উঠাইয়া দেওয়া উচিত নয়?

কিন্তু বাস্তবিক দশশালা বন্দোবস্ত চুক্তি নহে—উহা ব্যবস্থাপকসমাজ হইতে বিধিবদ্ধ আইন। নচেৎ দুইপক্ষ চুক্তি করিয়া তৃতীয় পক্ষের স্বত্ব লোপ করা দস্যুর চুক্তি ভিন্ন আর কিছু নহে। প্রকৃত ভূস্বামীকে ত্যাগ করিয়া আর একজনকে ভূস্বামী বলিয়া স্বীকার করা চুক্তির কর্ম্ম নয়। আইন ভিন্ন উহা আর কেহ করিতে পারে না। এবং দশসালা বন্দোবস্তের আইনে তাহাও করে নাই।

✓আমাদের ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রজাই ভূমির মালিক। আমা-দের যে মণ্ডল ও পাটোয়ারী প্রথা প্রচলিত আছে তাহাতে প্রজার স্বত্বই সাব্যস্ত করিয়া দিতেছে। জমীর দরুণ খাজানা (rent) আমাদের দেশে ছিল না। মনুতে তাহার উল্লেখ নাই। সংস্কৃত কোন পুস্তকে খাজানা দিবার উল্লেখ নাই। কাহার কত করে রাজস্ব দিতে হইবে,সেই সম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন "ধান্যা-নামষ্টমোভাগঃ ষষ্ঠ দ্বাদশ এব বা," অর্থাৎ ধান্যের ষষ্ঠ অংশ অথবা অষ্টম অথবা দ্বাদশ অংশ রাজাকে করস্বরূপ দিতে হইবে। রাজার জমী কর আর নাই কর তোমাকে রাজস্ব দিতে হইবে। এইজন্য ঋষিরা বনে কুড়াইয়া যে অকৃষ্টপচা ধান্য সংগ্রহ করিতেন, তাহারও ষষ্ঠাংশ রা-জাকে দিতেন। প্রজারা সকলই রাজাকে কিছু না কিছু দিত, কেহই রেয়াত পাইত না। কামার কুমার ছুতার প্রভৃতি সকলেই রাজস্ব দিত অথচ হয় ত তাহারা কেহই জমি করিত না। এইরূপ করের নাম বরং রাজস্ব revenue হইতে পারে কিন্তু উহা খাজানা নহে। সময়ে সময়ে বৃটীষ গবর্ণমেণ্ট যেমন নানা প্রকার টেক্স বসান সেইরূপ আমাদের দেশে চিরস্থায়ী টেক্স ছিল জমির খাজনা স্বতন্ত্র ছিল না। সেই টেক্স বা রাজস্ব কখন কখন রাজারা বৃদ্ধি করিতেন।

সময়ে সময়ে তাঁহারা কর রেয়াতও করিতেন। প্রজা ক্ষীণ এবং রাজা অত্যাচারী হইলে দুর্ব্বহকরভার তাহারা কষ্টে স্থষ্টে বহন করিত কিন্তু ফাঁক পাইলে তাহারা বিদ্রোহ করিতেও ছাড়িত না। এই রূপে ক্রমে মুসলমানদিগের অধিকার কালে প্রজার টেক্স ছাড়িয়া ভূমির টেক্স হয়,সেই টেক্স কিছু কিছু করিয়া বাড়িয়া, আকবরের সময় এক তৃতীয়াংশে দাঁড়ায়। ইহার নাম আসল জমা। ক্রমে মুসলমানেরা নানা কারণবশতঃ আরও কিছু কিছু আদায় করিত, তাহার নাম আবওয়াব। বৃটীষ গবর্ণমেণ্টও দেওয়ানী পাইয়া অবধি বরাবর ঐরূপ আবওয়াব আদায় করিয়া আসিয়াছিলেন। ১৭৯৩ অব্দের প্রথম আইন দ্বারা যখন জমীর স্বত্ব চিরকালের জন্য জমীদারকে দেওয়া হয় তখন এই আবওয়াব ইত্যাদি সমস্ত আসল জমাভুক্ত হইয়া যায়। এবং তাহার পর আবওয়াব ইত্যাদি আদায় করা এককালীন বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। (১৭৯৩ শালের অষ্টম আইনের ৫৪ ও ৫৫ ধারা) অর্থাৎ প্রজার নিকটহইতে কোন বাবে আর অধিক কর লইব না, স্বীকার করাইয়া এবং সেই অবর্দ্ধনীয় কর নির্দ্দিষ্ট করিবার ভার জমীদারের উপর দিয়া গবর্ণমেণ্ট জমীদারকে চিরদিনের মত ভূস্বামী বলিয়া স্বীকার করিলেন। অতএব দশশালা বন্দোবস্ত বলিলে উহা শুদ্ধ জমীদারের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বুঝায় না উহাতে প্রজার সহিতও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বুঝায়। এ কথা আমরা যে আজি বলিতেছি এরূপ নহে আমাদের পূর্ব্বেও অনেকে বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আশুবাবু State Literature উপর বড় চটা। এইজন্য তাহা ছাড়িয়া আইনের কথা ধরিয়া দশশালা বন্দোবস্তের ঐ অর্থ দেখাইতে চেষ্টা করিব।

এই সময়ে আমাদের একটি কথা কেবল বলিতে হইবে। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যদি প্রজার সঙ্গেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইল তবে জমীদারকে ভূস্বামী করিবার লাভ কি? প্রজার খাজানা যদি বৃদ্ধি করিতে না পারিলেন তবে জমীদার ভূস্বামী হইলেন আর না হইলেন তাহাতে ক্ষতিই বা কি, বৃদ্ধিই বা কি? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে লর্ড কর্ণোওয়ালিস্ বাঙ্গালার জমীদারেরা যে কি ধাতুর লোক তাহা ভাল করিয়া বুঝেন নাই। জমীদারেরা যে আশী বৎসরের মধ্যে চিরপ্রচলিত পরগণানিরিখ উঠাইয়া দিতে পারিবেন তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। খাজানা ও করসম্বন্ধে যে সব নূতন নূতন মত উনবিংশ শতাব্দীতে বাহির হইয়াছে তাহা তাঁহার সময়ে হয় নাই। তিনি শোর সাহেবের আপত্তির উত্তরে বলিয়াছিলেন জমীদারের উপস্বত্ব বৃদ্ধির দুইটী মাত্র উপায় থাকিবে। পতিত ভূমির পুনরুদ্ধার এবং উৎকৃষ্টতর শস্য উৎপাদনে প্রজাদিগকে প্রবর্ত্তন করা। জমীদার, যে খাজনা বৃদ্ধির জন্য উৎপীড়ন করিয়া আপনার লাভবৃদ্ধি

করিবে এবং প্রজার সর্ব্বনাশ করিবে ইহা তাঁহার একেবারে অভিপ্রায় ছিল না। কার্য্যেও তিনি, তাহার কোন পথ রাখিয়া যান নাই। তৎপ্রণীত অষ্টম আইনের ধারাগুলি উদ্ধৃত করা উচিত কিন্তু স্থানাভাবপ্রযুক্ত কেবল দুইটী ধারা উদ্ধৃত করা গেল।

54. The impositons upon the Raiyats, under the denomination of abwab, mathout, and other appellations, from their number and uncertainty having become intricate to adjust, and a source of oppression to the Raiyats, all proprietors of land and dependent Talukdars shall revise the same in concert with the Raiyats, and consolidate the whole with the assal into one specific sum.

In large Zemindaries or estates the propriators are to commence this simplification of the rents of their Raiyats in the Parganas where the impositions are most numerous, and to proceed in it gradually till completed; but so that it be effected for the whole of their lands by the end of the Bengal year 1198 in the Bengal districts, and of the Fasli and Wilayate year 1198 in the Bihar and Orissa districts, these being the periods fixed for the delivery of pattas, as hereafter specified.

55. No actual proprietor of land or dependent Talukdar or farmer of land, of whatever description, shall impose any new abwab or mathaut upon the Raiyats, under any pretence whatever.

Every exaction of this nature shall be punished by a penalty equal to three times the amount imposed; and if at any future period, it be discovered that new abwab or mathaut have been imposed the persons imposing the same shall be liable to this'penalty for the entire period of such impositions.

আশুবাবুও অনেক ধারা উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু উপরোক্ত যে ৫৪ ও ৫৫ ধারার উপর সমস্ত নির্ভর করে, সেই দুইটি না দিয়া তাহার কেবল marginal note দুইটি তুলিয়া দিয়া ঠিক উল্টা বুঝাইয়াছেন। আমরা ঐ ধারার ব্যাখ্যাস্থলে তাহা প্রদর্শন করিব।

যে সব নিয়মাবলীতে জমীদার বাধ্য হইবেন, তাহার প্রথম এই। আমলনামা ভিন্ন কেহ প্রজা বা তালুকদারের

নিকট খাজানা আদায় করিতে যাইতে পারিবেন না।

২য়। আবওয়াব ইত্যাদি আসল জমা ভুক্ত হইয়া যাইবে।

৩য়। ১১৯৮ বঙ্গাব্দের মধ্যে সর্ব্বত্র আবওয়াব আদি জমাভুক্ত হইয়া যাইবে। কোন্ প্রজাকে কত জমা দিতে হইবে, তাহা স্থির এবং নির্ণীত করিতে হইবে।

৪র্থ। ইহার পর কেহ আর নূতন আবওয়াব লইতে পারিবে না। যদি কেহ লয়, তাহাকে ৩ গুণ জরিমানা দিতে হইবে। যদি ভবিষ্যতে প্রমাণ হয় যে, কোন জমীদার বরাবর আবওয়াব লইয়া আসিতেছেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বরাবর যত আবওয়াব আদায় করিয়াছেন, সমস্ত জরিমানা দিতে হইবে।

৫ম। জমীদার ও প্রজার প্রায়ই খাজানামাত্র লইয়া সম্বন্ধ থাকিবে। প্রজা যে কোন প্রকার শস্য ইচ্ছা উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু যেখানে এরূপ প্রথা আছে, যে অন্য প্রকার শস্য উৎপাদন করিলে অধিক রাজস্ব দিতে হয়, সেখানে সেই প্রথাই বলবৎ থাকিবে।

৬ষ্ঠ। প্রজাদের রাজস্ব কি নিয়মে লইতে হইবে, তাহার পাকা বন্দোবস্ত করিবার পাট্টা দিতে হইবে। ঐ পাট্টায় প্রজাকে কত খাজানা দিতে হইবে, তাহা ঠিক করিয়া লেখা থাকিবে।

৭ম। পাট্টায় যেখানে হার ধরিয়া রাজস্ব দিতে হয়, সেখানে হার এবং যেখানে শস্যে রাজস্ব দিতে হয়, সেখানে শস্যদানের নিয়মের পাকা বন্দোবস্ত থাকিবে।

৮ম। জমীদারেরা পাট্টার উক্ত নিয়মানুযায়ী ফরম প্রস্তুত করিয়া কালেক্টরের অনুমতি লইয়া দেওয়ানী আদালতে রেজেষ্টরী করিবেন।

৯ম। জমা নির্ণীত এবং স্থিরীকৃত হইয়া গেলে জমীদার যদি প্রজাকে সেই জমীর পাট্টা না দেয়, তাহা হইলে রায়তের পাট্টা লইতে মোকদ্দমা করিবার সমস্ত ব্যয় জমীদারকে দিতে হইবে।

১০ম। রায়ত কিম্বা পেটাও ইজারদারদিগের সহিত এই বন্দোবস্তের পূর্ব্বে যে বন্দোবস্ত ছিল, তাহা যদি এই সকল নিয়মের বিরুদ্ধ না হয়, তাহা হইলে উহা বন্দোবস্তের মেয়াদের শেষ পর্য্যন্ত বলবৎ থাকিবে। জুয়াচুরি করিয়া বন্দোবস্ত করিলে, সে বন্দোবস্ত বলবৎ হইবে না।

১১শ। কোন জমীদার নিম্নলিখিত কারণ ব্যতীত খোদকস্ত রায়তের পাট্টা রদ করিতে পারিবে না। যে সকল কারণবশতঃ পাট্টা না মঞ্জুর হইবে তাহা এই। জুয়াচুরি করিয়া পাট্টা লইলে, পরগণা নিরিখ হইতে তিনবৎসরের মধ্যে রাজস্ব কম হইলে, জুয়াচুরি করিয়া রাজস্ব রেয়াত পাইলে, কিম্বা পরগণার জরীপ হইলে।

১২শ। ১১৯৮ শালের মধ্যে জমী-

দারেরা সকল প্রজাকে পাট্টা দিবেন। ১১৯৮ শাল অতীত হইয়া গেলে, প্রজার সহিত পূর্ব্বোক্ত নিয়মের বিরুদ্ধ কোন প্রকার বন্দোবস্ত, আইনানুমোদিত হইবে না। যে সকল জমীদার আবওয়াব ইত্যাদি জমাভুক্ত করিয়া প্রজাকে পাট্টা না দিবেন, তাঁহারা রাজস্বের জন্য নালিশ করিলে সে নালিশ না মঞ্জুর হইবে।

✓এই সমস্ত ধারার অর্থ এই যে, গবর্ণমেণ্ট যেমন জমীদারের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন, জমীদারও প্রজার সহিত তদ্রূপ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবেন। যে জমা স্থির হইবে তাহার উপর আর এক পয়সা লইতে পারিবেন না।

বন্দোবস্তের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট জমীদারের কাগজপত্র দেখিয়া,মোট আদায়ের ৯ ভাগ নিজে লইলেন এবং একভাগ জমীদারের জন্য রাখিয়া দিলেন, কিন্তু প্রজার বেলা প্রজা কত দিতে পারিবে এবং তাহার উৎপন্ন কত কিছুই না দেখিয়া আবওয়াব ইত্যাদিতে সে যাহা যথার্থ দিত, তাহাই তাহার ন্যায্য দেয় বলিয়া স্থির করিয়া দিলেন। প্রজার প্রতি কোনরূপ উৎপীড়ন যাহাতে না হয়, লর্ড কর্ণোয়ালিশ তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কর্ণোয়ালিশের সমস্ত আইনগুলির মধ্যে প্রজার উপর রাজস্ববৃদ্ধির নামও নাই। বরং পূর্ব্বে আবওয়াব প্রভৃতি নানা কারণে প্রজার নিকট যে অধিক রাজস্ব আদায় করা হইত, তাহা চিরকালের জন্য উঠাইয়া দেওয়া হইল। প্রজার খাজানা চিরকালের জন্য বাঁধিয়া দেওয়া হইল আইনে কেবল ইহাই দৃষ্টি হয়।

নিয়মমত রাজস্ব দিলে প্রজার যোত উচ্ছেদ করা আমাদের দেশে কখন ছিল না, কর্ণোয়ালিশের আইনেও যোত উচ্ছেদের কোন বিধান নাই। যে কৃষক একবার কৃষিকার্য্যের জন্য* ভূমি লইল,✓ সে যতদিন রাজস্ব দিবে,ততদিন সে ভূমি তাহারই থাকিবে এই আমাদের দেশে চিরন্তন প্রথা। যোত ছাড়াইয়া দেওয়া ও রাজস্ব বৃদ্ধি করা, এ দেশীয় লোকের অরুচিকর, তবে প্রজা দুর্ব্বল ও জমীদার সবল এ জন্য প্রজারা জমীদারকে খুসী করিবার জন্য নজর প্রভৃতি সময়ে সময়ে দিত, কিন্তু রাজস্বের উপর একপয়সা বৃদ্ধি করিতে তাহারা কখন চায় না, এবং এখনও অর্থাৎ দশ আইন পাস

* মৌরসী; মকররী, মেয়াদী প্রভৃতি পাট্টা বাস্তু, উদ্বাস্তু, বাগাতপ্রভৃতি স্থলেই চলিত, কৃষিকার্য্যের জন্য ভূমি লইলে ঐরূপ পাট্টা চলিত নহে, কৃষকেরা প্রায় পাট্টা লয় না, ১৭৯৩, ১৮৫৯, ১৮৬৮ শালে পাট্টা লইবার এত সুবিধা করিয়া দিলেও অতি অল্প লোকেই পাট্টা লইয়াছে। কৃষকরায়ত একটু পুরাণ হইলেই তাহারা কদীমী রায়ত কহিত। তাহাদের স্বত্ব প্রায় মৌরুসীর ন্যায়।

হইবার পরও অনেক জায়গায় জমীদার চারিপয়সা রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে চাহিলে প্রজারা জমীদারকে দশটাকা নজর দিবে, জমীদারের আমলাকে দশটাকা ঘুস দিবে, তথাপি সে চারিটী পয়সা বৃদ্ধি দিতে চাহিবে না ; কর্ণোয়ালিশের আইনে যখন ঐ নজরাদি আইনবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, যখন আবার ১১৯৮ শালের মধ্যে আবওয়াব আদি অন্তর্ভুক্ত করিয়া রাজস্বের মোট স্থির করিয়া সেই রাজস্বে পাট্টা দিবার কথা রহিল, না দিলে রাজস্বের নালিশ চলিবে না এমত বন্দোবস্ত রহিল, তখন সে পাকা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নয় ত কি ?

প্রজাদিগের রক্ষার জন্ম বিশেষ বিধান করা আবশ্যক বলিয়া লোকে যখন কর্ণোয়ালিশকে পীড়াপীড়ি করিয়াছিল, তখন তিনি তাহার উত্তর দিয়াছিলেন যে, শত শত বৎসর হইতে প্রচলিত স্থানীয় হার এবং পরগণানিরিখ কেহই উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। এই চিরন্তনপ্রথা প্রজাদিগের পরিত্রাণ করিবে। কিন্তু বাঙ্গালি জমীদার যে কতদূর স্বার্থপর, নৃশংস এবং স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহারা কত গর্হিত, ন্যায়বিরুদ্ধ ও জঘন্য কার্য্য করিতে পারেন তাহা উদারচেতা লর্ড কর্ণোয়ালিশ কিছুই জানিতেন না। জানিলে তিনি আর রাজস্বনির্ণয় এবং পাট্টাদান কার্য্যের ভার ঐ জমীদারদের হস্তে সমর্পণ করিতেন না; সেটা নিজেই করিয়া দিতেন। জমীদারদের হাতে দেওয়ার ফল হইয়াছে এই যে, ঐ সকল রেকর্ড রক্ষিত হয় নাই, যাহাও বা হইয়াছে, তাহাতে প্রজার সর্ব্বনাশ বই আর কিছুই হয় নাই। ক্যাম্বেল সাহেব তাঁহার কব্‌ডেন ক্লবের প্রবন্ধে এই রেকর্ড না রাখাই গবর্ণমেণ্টের প্রধান ভুল ও বঙ্গীয় প্রজার প্রধান অনর্থ স্থির করিয়াছেন।

আমাদের দেশে রায়তেরা জানিত, জমী করিব খাজানা দিব। খাজানা বাড়ান, যোত ছাড়ান এ সকল তাহাদের পক্ষে নূতন ; এবং যখন, দশশালা বন্দোবস্তে উহার কথা নাই, তখন উহা রায়তের পক্ষেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। ক্যাম্বেল সাহেব লিখিয়াছেন, "There are in them (regulations) expressions which would seem to imply that no more is to be taken from any class of ryots, old or new, than the customary rates in the neighbourhood."

লর্ড কর্ণোয়ালিশ জমীদারী ফেরাবীর তলা পর্য্যন্ত বুঝুন আর নাই বুঝুন, তিনি জমীদারদের তত বিশ্বাস করিতেন না, এবং গবর্ণমেণ্টের রাজস্বটা ঠিক ঠিক আদায় হইয়া যায় সেই দিকেই তাঁহার অধিক নজর ছিল বলিয়া তিনি তাঁহাদের উপর কতকটা নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই জন্য তিনি প্রজার রক্ষার্থ পূর্ব্বোক্ত ধারাসকল প্রণয়ন করিয়াও একটি ক্ষমতা দিয়

হস্তে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেটি এই—

It being the duty of the ruling power to protect all classes of people and more particularly those who from their situation are most helpless, the Governor General in Council will whenever he may deem it proper enact such regulations as he may think necessary for the protection and welfare of dependent Talukdars, Ryots and other cultivators of the soil, and no Zemindar independent Talukdar or actual proprietors of land shall be entitled on this account to make any objection to the discharge of the fixed assessment which they have respectably agreed to pay.

এই ধারার প্রকৃত অর্থ এই যে রায়তদের রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট ভবিষ্যতে আইন করিবেন, জমীদার সেইজন্য অবধারিত খাজানা দিতে পারি না বলিয়া আপত্তি করিতে পারিবেন না। কিন্তু আশু বাবু বলেন উহার অর্থ অন্যরূপ। তাহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত তিনি ১৭৯৩ শালের দ্বিতীয় রেগুলেশনের মুখবন্ধ হইতে একটি বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন। এবং সেটি বড় বড় অক্ষরে ছাপাইয়াছেন। সেটি এই—

No power will then exist in the country by which the rights vested in the landholders by the regulations can be infringed or the value of the landed property affected.

অর্থ এইরূপ করা হইয়াছে যে যদি জমীদারের স্বত্বে হস্তক্ষেপ করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাই এ দেশের মধ্যে কাহারও না রহিল তবে গবর্ণরজেনেরল ইন্ কৌন্সিল উক্ত স্বত্বে কিরূপে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন? অর্থাৎ প্রজার রক্ষার জন্য গবর্ণর জেনেরলেরও আইন করার ক্ষমতা নাই। অর্থাৎ ৯৩ শালের প্রথম আইনের অষ্টম ধারার অন্যরূপ অর্থ।

কিন্তু আশুবাবু প্রবন্ধের শেষ অংশ লিখিবার সময় গোড়া ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কলিকাতা রিবিউ ৩৮৮ পৃষ্ঠা। "None but a fool or madman will deny the power of the legislature to redistribute property in land and indeed private property of every other description." কিন্তু তিনি আবার নিজেই বলিয়াছেন, যে দেশের মধ্যে জমীদারের স্বত্বে হস্তক্ষেপ করিতে পারে এমন ক্ষমতা কাহারও থাকিবে না। এইরূপে তিনি আপনার পদেই আপনি কুঠার মারিয়াছেন। তিনি দ্বিতীয় রেগুলেশনের উপরোক্ত যে পদটী উদ্ধার করিয়াছেন তাহা "চক্ষুরোগেসমুৎপন্নে কর্ণৌছিত্বা কটিং দহেৎ।" এই অশ্ব চিকিৎসার বচনটি মনুষ্যচিকিৎ-

ন্যায় ব্যবহৃত করিলে যেরূপ ফল হয় তদ্রূপ ফলপ্রসব করিয়াছে। আমরা স্থান অভাব প্রযুক্ত দ্বিতীয় রেগুলেশনের মুখবন্ধটী তুলিয়া দিতে পারিলাম না। দিতে পারিলে পাঠকগণ দেখিতেন যে ঐ রেগুলেশন দ্বারা কেবল মাল আদালত উঠিয়া যায় ও তাহার কার্য্য দেওয়ানী আদালতে সমর্পণ করা হয়। তাহার মধ্যে প্রজার স্বাপক্ষ আইন করিবার ক্ষমতা কাহারও রহিল না এমন কোন কথাই নাই, থাকিবারও সম্ভাবনা নাই।

আশুবাবুর উদ্ধৃত পদের কেবল উপর এবং শেষ অংশ পড়িলেই উহার অর্থ বোধ হইবে—এই জন্য আমরা তাহা উদ্ধার করিয়া দিলাম, আমরা এ বিষয়ে আর অধিক কথা কহিব না। উদ্ধৃত অংশটুকু এই—

The collectors of the revenue must not only be divested of the power of deciding upon their own acts but rendered amenable for them to the courts of judcature and collect the public dues subject to a personal prosecution for every exaction exceeding the amount which they are authorized to demand on behalf of the public and for every diviation from the regulations prescribed for the collection of it; no power will then exist in the country by which the rites vested in the land-holders by the regulations can be infringed or the value of landed property affected.

অর্থাৎ কালেক্টর নিজে অত্যাচার করিয়া নিজেই বিচারপতি হইলে জমীদারের স্বত্বের প্রতি হস্তক্ষেপ করিবার যে সম্ভাবনা তাঁহার থাকিত তাহা আর থাকিবে না। ব্যবস্থাপক সমাজের এবং গবর্ণর জেনেরলের ক্ষমতার সহিত ঐ power শব্দের কোন সম্পর্ক নাই। আশুবাবু তাহা পাকা উকীলের ন্যায় গোপন করিয়াছেন।

তিনি Right Hon'ble T. Pemberton Leagueরএকটি রায় হইতে একটি পদ উদ্ধার করিয়া বলেন যে রাজকার্য্যনির্ব্বাহপ্রণালী সুন্দররূপে চালাইবার জন্য এবং প্রজাদিগের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য East Indian Company জমীদারকে ভূস্বামীরূপে পরিণত করিয়া এবং তাহাদের সদর জমা চিরকালের জন্য স্থির করিয়া দিয়া সুশাসনের সর্ব্বপ্রথম সোপান করিয়া দিলেন। তিনি বলেন এই প্রথম সোপান ১৭৯৩ সালের ২২ শে মার্চের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারেলের ঘোষণাপত্র!! আশুবাবু ঘোষণাপত্রেরও কিয়দংশ উদ্ধার করিয়াছেন কিন্তু অষ্টমধারার কি অর্থ তিনি করেন, কোন স্থানেই খুলিয়া বলেন নাই। তিনি বলেন আমরা উহার কি অর্থবোধ করি তাহা

ঘোষণাপত্রের উদ্ধৃত অংশ পড়িলেই অনুমান করিতে পারা যাইবে। এরূপ অর্থ অনুমান করিয়া লওয়ার ভার পাঠকের হস্তে দেওয়া বড় মন্দ নহে। তাঁহার ঘোষণাপত্রের উদ্ধৃত অংশ পড়িয়া আমরা ত বিশেষ কিছু অনুমান করিতে পারিলাম না। তবে যেন একটু একটু বোধ হয় যে, লোকে বুঝিবে জমীদারেরা পূর্ব্বে পুলিস-বিচার প্রভৃতি যে সকল রাজকীয় ক্ষমতা পাইয়াছিলেন সেই ক্ষমতা উচ্ছেদ করিবার জন্য নূতন নূতন আইন প্রস্তুত করিবার ভার গবর্ণর জেনেরল রাখিলেন। কিন্তু প্রথম রেগুলেশন বরাবর পড়িয়া আসিলে কখনই এরূপ অর্থ হয় না। সমস্ত প্রথম রেগুলেশনের মধ্যে জমীদারের দেওয়ানী ফৌজদারী ইত্যাদির নামও নাই গন্ধও নাই। সুতরাং মাঝে হইতে তাহার অষ্টমধারার জমীদারের ফৌজদারী ক্ষমতা নিষেধরূপ অর্থ কিরূপে হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না।

তিনি বলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রূপ চুক্তি করিবার সময় জমীদারকে তাহার অনেক মূল্য Valuable consideration দিতে হইয়াছিল। অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। তাহার একটি এই যে হাজা শুখা, জন্মা অজন্মা, সমস্ত সত্বেও লাটের ঠিক তারিখে রাজস্ব আদায় দিতে হইবে, না দিতে পারিলে জমীদারী নিলাম হইবে, আর যদি নিলামে রাজস্বের বাকি টাকা না উঠে তবে জমীদারের অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। আশুবাবুর মতে এই Valuable consideration। তাঁহার মতে ইহা অতি কঠিন নিয়ম। কিন্তু মুরশিদ কুলিখাঁর বৈকুণ্ঠ, মুঙ্গেরের হাজত, কয়েদ, জমীদারী খাস করা, জমীদারীর খাস বন্দোবস্ত, জমীদারীর স্বত্বলোপ* এ সকলের চেয়েও কি পূর্ব্বোক্ত নিয়ম এত কঠিন? হইতেও পারে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে সাবেক আমলে জমীদারকে নবাব কয়েদ করিত, মারিত, না হয় অপমানই করিত। মুসলমানেরা ত টাকা লইতে পারিত না, সুতরাং তাহা অপেক্ষা কিস্তীতে কিস্তীতে টাকা দেওয়া বড়ই শক্ত। বড়ই Valuable consideration।

আশুবাবু যে আর এক কথা কেন বলেন নাই তাহা বলিতে পারি না। ৯৩ শালের চতুর্দ্দশ আইনের নবম দশম একাদশ ধারায় জমীদারকে বাকী খাজানার দায়ে কয়েদ করার যে কথা ছিল সেও ত দশশালা বন্দোবস্তরূপ চুক্তির এক অংশ। ১৭৯৪ শালের তিন আইনের ৩ ধারায় তাহা বন্ধ করা হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এইরূপ কয়েদ করার ক্ষমতা ত্যাগ করার দরুণ জমীদারের নিকট কি কিছু ক্ষতিপূরণ লইয়াছেন? লন নাই, তবে গবর্ণমেণ্ট এখন প্রজার রক্ষার জন্য আইন করি-

---

* আমরা ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতে পড়িয়াছি যে অনেক স্থলে মুসলমানেরা দুষ্ট জমীদারের জমীদারী কাড়িয়া লইয়া কৃষ্ণনগরের রাজাকে দিয়াছেন।

তেছেন জমীদারগণ নানা কথা তুলিতেছেন কেন? তাহার পর আশুবাবু footnoteএ লিখিয়াছেন।—

It would be interesting to compute the sum total of other real or personal property sold in the 75 years between 1793 and 1868।

ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি, জমীদারেরা এই কয়েক বৎসরের মধ্যে নানা উপায়ে যে অর্থসঞ্চয় করিয়াছেন পূর্ব্বোক্ত অংশ তাহার শতাংশের অর্দ্ধাংশও নহে। আর এই কয়েক বৎসরের মধ্যে প্রজার কি হইয়াছে, জমীদারেরা যাহা লোকশান দিয়াছেন তাহা আইন অনুসারেই দিয়াছেন। কিন্তু প্রায় তিন কোটী প্রজা তাঁহাদের শাসনের গুণে তাঁহাদেরি দয়াধর্ম্মের গুণে জমীর মালিক ঘুচিয়া প্রায় ইচ্ছাধীন রায়ত tenant at will হইয়া উঠিয়াছে।* অধিকাংশই লাঠি জুতা ও গৃহদাহ ইত্যাদির দ্বারা ও মাঙ্গন মাথট ভিক্ষা গোমস্তার পার্ব্বণি হিসাবানা নজর ইত্যাদি আইনবিরুদ্ধ আদায়ের চোটে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এত পুলিষ, দেওয়ানী ও ফৌজদারী কাছারী স্থাপন করিয়াও ত প্রজার প্রতি জমীদারের অত্যাচার নিবারণ করিতে পারেন নাই। এখনও জমীদারের নায়েব গোমস্তা মফস্বলে হর্ত্তা কর্ত্তা; এখনও নানা স্থানে তাহারা জরিমানা করে রামের ধন শ্যামকে দেয়, শ্যামের ধন হরিকে দেয়। কিন্তু গরিব প্রজাদিগের জন্য কথা কহেন এমন লোক কোথায়? জমীদারের দুধে চিনির ত্রুটি হইলে তাহা লইয়া চীৎকার করিবার লোক দেশশুদ্ধ মিলিবে কিন্তু গরিব প্রজার যে পান্তাভাতে একটু লবণও জুটিয়া উঠে না তাহা কে দেখিবে! কে তাহাদের দুঃখে দুঃখী হইবে, কে তাহাদিগের দুঃখনিবারণ করিবে! যাহারা প্রজাদের একমাত্র ভরসা সেই শিক্ষিত যুবকদলও ক্রমে নানা কারণে জমীদারদিগের দলের সেনাপতি বা অগ্রদাস হইয়া দাঁড়াইতেছেন।

হে বঙ্গবাসী দুর্ব্বল নির্জ্জীব রায়তবৃন্দ! তোমরা ভরসা ত্যাগ কর। তোমাদের কেহই বন্ধু নাই, তোমাদের হইয়া দুকথা কয় এমন লোক একটিও নাই। ইংরেজী শিক্ষায় দেশের যে উন্নতি হইতেছে সে তোমাদের জন্য নহে। সে ধনবানের জন্য। জানিও, শিক্ষিতলোক জমীদার বা তালুকদারের জন্য। কেন না তাহারা পয়সা ব্যয় করিতে পারে। শিক্ষিতলোক তোমাদের কেহ নহে। তোমরা নিজে বুদ্ধিমান্ হইতে চেষ্টা কর লিখিতে পড়িতে ও আপন স্বত্ব বুঝিয়া লইতে শিখ। তোমরা নিজে আপন সাহায্য করিতে পারিলে ঈশ্বর তোমাদিগের সহায় হইবেন। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট

* হপ্তমের অত্যাচারে যে কত প্রজার সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহার তালিকা লইলেও it would be interesting to compute.

তোমাদের রক্ষার্থ নানা যত্ন করিয়াও তোমাদের রক্ষা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, তোমাদের চক্ষু কর্ণ ফুটিলে তাঁহারাও সফলপ্রযত্ন হইতে পারেন। তোমরাও বাঁচিয়া যাও নচেৎ তোমাদের ভরসা নাই। আশা নাই।

অভিজ্ঞানশকুন্তল।

৫। ইহার অর্থ।

চতুর্থ প্রস্তাবে আমরা দেখাইয়াছি যে দুষ্মন্ত কিছু বেশী রিপুপরবশ, কিন্তু রিপুপরবশ বলিয়া তিনি অধার্ম্মিক নন। তিনি বহুস্ত্রীসত্বেও শকুন্তলার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না বটে; কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার শকুন্তলার প্রতি আসক্তি যথেচ্ছাচারী দুরাচারের আসক্তি নয়। এ কথা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। এখনও বলি যে রিপুযুক্ত দুষ্মন্ত অসাধারণ চিত্তসংযমসহকারে শকুন্তলার জাতিকুল প্রভৃতি নির্ণয় করিয়া শেষে শকুন্তলাকে অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রথম প্রস্তাবে দেখাইয়াছি যে শকুন্তলাকে দেখিবামাত্র দুষ্মন্তের পরীক্ষা আরম্ভ হয়—তাঁহার রিপু এবং ধর্ম্মভাবের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সে যুদ্ধে তাঁহার ধর্ম্মভাব জয়ী হইয়াছিল। ধর্ম্মভাব জয়ী হইয়া দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলাকে পবিত্র পরিণয়সূত্রে বন্ধন করিয়াছিল। সে পরিণয়ের অর্থ—ঘৃণাস্পদ-কামোন্মত্ত যথেচ্ছাচারীর কদর্য্যবাসনা-পরিতৃপ্তির নিমিত্ত ক্ষণিক সম্বন্ধ নয়। সে পরিণয়ের অর্থ—জীবনব্যাপী পবিত্র পতিপত্নীর সম্বন্ধ। কিন্তু সে পবিত্র পরিণয়ের ফল কি হইল?

সে পবিত্র পরিণয়ের প্রথম ফল—নায়ক নায়িকার যন্ত্রণাময় বিচ্ছেদ। পতিকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া শকুন্তলা কশ্যপাশ্রমে থাকিয়া অনেকবৎসর ধরিয়া ভয়ানক যন্ত্রণাভোগ করিয়াছিলেন। পতিপ্রাণা পতিহীনার ন্যায় সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কোমল হৃদয়ে বিষম বিচ্ছেদাগ্নি ধারণ করিয়া অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইয়াছিলেন। স্নেহপ্রাণা স্নেহময়ী সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্নেহের পদার্থ হারাইয়া ভগ্নহৃদয়ে দীর্ঘকাল হাহাকার করিয়াছিলেন। আসমুদ্র ভারতসাম্রাজ্যের রাজ্ঞী অসহায়া অনাথার ন্যায় বহুকাল কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটাইয়াছিলেন। চন্দ্রবংশতিলক, পৃথিবীর রাজকুলতিলক দুষ্মন্তের প্রতিষ্ঠিত মহাদেবী সর্ব্বলোকোপেক্ষিতা অধমতমা কাঙ্গালিনীর ন্যায় ধূলিধূসরিত অঙ্গে মাটি হইয়া মাটিতে মিশাইয়াছিলেন। দুষ্মন্তও শকুন্তলার বিচ্ছেদে উন্মাদগ্রস্ত।

নিরপরাধা সতী সাধ্বীকে নিষ্ঠুরভাবে নিষ্ঠুরবাক্যে তাড়াইয়া দিয়া ধার্ম্মিক-প্রধান দুষ্মন্ত অনুতাপে দগ্ধহৃদয়, জীর্ণ, শীর্ণ, আহারনিদ্রাবর্জ্জিত, আকুলপ্রাণ, শোকবিহ্বল।

সে পবিত্রপরিণয়ের দ্বিতীয় ফল—নায়কনায়িকার আত্মীয় বন্ধুগণের যন্ত্রণা। অপমানিত শকুন্তলাকে রাখিয়া গৌতমী, শার্ঙ্গরব প্রভৃতি যখন আশ্রমে ফিরিয়া যান তখন তাঁহারা যে কি বিষম শোক-ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া গিয়াছিলেন তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। শকুন্তলা তাঁহাদের সকলেরই আদরের বস্তু। আশ্রমপ্রদেশে দুষ্মন্তের অবস্থান কালে শকুন্তলার যে পীড়া হয় তাহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে না পারিয়া সমস্ত আশ্রমবাসী এবং আশ্রমবাসিনী শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। আবার যখন গৌতমী প্রভৃতি আশ্রমে আসিয়া সেই নিদারুণ কথা জ্ঞাপন করিলেন তখন যে পবিত্র ব্রহ্মচিন্তানিমগ্ন ব্রহ্মনামপূর্ণ তপস্যাশ্রম অকিঞ্চিৎকর সংসারাশ্রমের ন্যায় মোহমুগ্ধের হাহাকারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। সে কথা শুনিয়া ঋষিকুলপতি কণ্বের হৃদয়ে কি ভয়ানক আঘাতই লাগিয়াছিল! শকুন্তলা কণ্বের প্রাণবায়ু—'কণ্বস্য কুলপতেরুচ্ছ্বসিতম্।' আর প্রিয়ম্বদা এবং অনসূয়ার ত কথাই নাই। তাহারা সে কথা শুনিয়া যে কি করিয়াছিল তাহা ঠিক করা দুঃসাধ্য। আবার মেনকা কন্যার নিমিত্ত যারপর নাই কাতর এবং শোকাকুল। তিনি কন্যার দুঃখে অস্থির হইয়া দুষ্মন্তের মনের ভাব জানিবার নিমিত্ত সানুমতীকে হস্তিনাপুরে পাঠাইয়াছিলেন। এইরূপ যে যেখানে শকুন্তলাকে জানিত এবং ভাল বাসিত সেই তাঁহার নিমিত্ত ব্যাকুল, শোকসন্তপ্ত। ওদিকে দুষ্মন্তের রাজপুরীও শোকনিমগ্ন। তাঁহার কর্ম্মচারিগণ ভীত, উৎকণ্ঠিত, শোকাতুর। তাঁহার রাজপুরবাসিনীরাও তদবস্থ। তাঁহার অনুমতিক্রমে চির-প্রচলিত-বসন্তোৎসব বন্ধ হওয়ায় হস্তিনাপুরের রাজবাটী যেন একটি প্রলয়ঙ্করী ঘটনার ছায়ায় গাঢ়নিমগ্ন—নিঃশব্দ, নিস্তব্ধ, নিরানন্দ!

সে পবিত্র পরিণয়ের তৃতীয় ফল—রাজ্যের অমঙ্গল। আমরা প্রথম প্রস্তাবে দেখাইয়াছি যে দুষ্মন্ত মহা পরীক্ষায় পড়িয়া রাজকার্য্য ভুলেন নাই। আমরা বলিয়াছি যে সে পরীক্ষায় তিনি জয়ী হইয়াছিলেন। এখনও আমরা সেই কথা বলি। কিন্তু আরো একটি কথা আছে। অঙ্গুরীয় পুনর্দর্শন করিয়া যখন তাঁহার শকুন্তলার স্মৃতি ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি ঘোর যন্ত্রণায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন। সে যন্ত্রণায় তাঁহার স্বাভাবিক মানসিক অবস্থার যে রকম পরিবর্ত্তন হয়, বৃদ্ধ কঞ্চুকী তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। সে বর্ণনার কিঞ্চিন্মাত্র উদ্ধৃত করিলেই চলিবে :—

রম্যং দ্বেষ্টি যথা পুরা প্রকৃতিভির্ন প্রত্যহং সেব্যতে।

তিনি এখন পূর্ব্বের মত মনোহর বস্তুতে প্রীত হন না এবং অমাত্যবর্গকে প্রতিদিন আস্থা প্রদর্শন করেন না।

তবেই দেখা যাইতেছে যে দুষ্মন্তের যন্ত্রণা রাজকার্য্যবিভাগেও সম্পূর্ণরূপে ফলশূন্য নয়। অমাত্যগণের প্রতি রাজার আস্থাভাব রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলের বিষয় নয়। রাজা এবং অমাত্যমণ্ডলী উভয়েই ভাল হইলে সে আস্থাভাব আশু অনিষ্টসাধনে অক্ষম হয় বটে, কিন্তু দীর্ঘকালস্থায়ী হইলে সে আস্থাভাব ভাল রাজ্যেও প্রজাবর্গের অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠে। ফলতঃ অমাত্যবর্গের প্রতি রাজার আস্থাভাব রাজ্যের পক্ষে মন্দ বই ভাল নয়। সে আস্থাভাব ক্ষণমাত্র স্থায়ী হইলেও এককালে দোষশূন্য নয়—ঘোর অনিষ্টকারী না হইলেও কিয়ৎপরিমাণে কার্য্যবিশৃঙ্খলতা উৎপন্ন করিয়াই থাকে। কিন্তু দুষ্মন্তের যে শুধু অমাত্যগণের প্রতি কিছু আস্থাভাব হইয়াছিল তা নয়। তাঁহার যন্ত্রণা আরো কিছু গুরুতর অনিষ্টসাধন করিয়াছিল। তিনি ধর্ম্মবীর এবং চিত্তবীর। যে চিত্তবীর সে কোন অবস্থাতেই চিত্তধর্ম্ম একেবারে হারায় না। দুষ্মন্তও ঘোর পরীক্ষায় পড়িয়া তাঁহার চিত্তধর্ম্ম একেবারে হারান নাই। বরং সেই পরীক্ষার গুরুত্ব বিবেচনায় তাঁহার চিত্তধর্ম্ম বর্দ্ধিতগৌরবে প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু সে পরীক্ষায় তিনি যে সম্পূর্ণরূপে অবিজিত ছিলেন এমন কথা বলা যায় না। যন্ত্রণাবিহ্বলাবস্থায় তিনি যখন রাজকার্য্যের ব্যবস্থা করেন তখন এইরূপ বলিয়াছিলেন:—

বেত্রবতি মদ্বচনাদমাত্যমার্য্যপিশুনং ব্রূহি চিরপ্রবোধান্ন সম্ভাবিতমস্মাভিরদ্য ধর্ম্মাসনমধ্যাসিতুং যৎ প্রত্যবেক্ষিতং পৌরকার্য্যমার্য্যেণ তৎ পত্রমারোপ্য দীয়তামিতি।

বেত্রবতি, আমার কথায় অমাত্য আর্য্য পিশুনকে গিয়া বল যে অনেক বেলায় জাগিয়াছি বলিয়া ধর্ম্মাসনে অধিরূঢ় হইতে আজ আমরা অসমর্থ। তিনি পৌরকার্য্য যাহা দেখিয়াছেন তাহা লিখিয়া দিন।

যন্ত্রণায় দুষ্মন্তের রাত্রিতে নিদ্রা হয় নাই এবং সেই জন্য তিনি আজ বিচারাসনে বসিতে অক্ষম। কি গুরুতর কি লঘুতর সকল কার্য্যই তিনি স্বয়ং করিয়া থাকেন। কিন্তু আজ তিনি সে প্রণালী অনুসরণে অশক্ত। আজ তিনি নিজের আসনে প্রধানামাত্যকে বসাইয়া আপনি কেবল গুরুতর কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন। প্রজাবৎসল রাজকার্য্যাসক্ত দুষ্মন্ত আজ প্রতিনিধি দ্বারা রাজকার্য্য করিতে বাধ্য। তবে দুষ্মন্ত পুরুষপ্রধান, চিত্তসংযমে অমিতবল, রাজধর্ম্মপ্রতিপালনে দৃঢ়ানুরাগী। তাই আজিকার পরীক্ষাতে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাভূত নন—তাই আজ পুরুষপ্রধান পুরুষপ্রধা-

নই রহিয়াছেন। দুষ্মন্ত দুষ্মন্ত না হইলে আজ ভারতের কি দুর্দ্দশা ঘটিত তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

দেখা গেল যে দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার পবিত্র পরিণয় হইতে তিনপ্রকার অমঙ্গল ঘটিল :—স্বয়ং দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার অমঙ্গল; দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার আত্মীয়-স্বজনের অমঙ্গল; ভারতসাম্রাজ্যের অমঙ্গল। কার্য্য দুইটী লোকের কিন্তু তাহার ফল কোটি কোটি লোকের দ্বারা অনুভূত। রোমিও এবং জুলিয়েটে প্রণয়ের ফলও সেই প্রকার হইয়াছিল। "By the introduction of the Prince in his political power, Shakspeare gives a public interest to the private history of the lovers. A whole community is represented in a state of ardent excitement, by which the public good is endangered: the Prince intercedes between the two contending parties, and thus, what in other respects was a private concern, becomes a matter of public and political importance, affecting the whole constitution of society and the common good."* সেক্ষপীয়রকে ঘটনাকৌশলের দ্বারা এই সত্য বুঝাইতে হইয়াছে; কালিদাসকে তাহা করিতে হয় নাই, কেন না তাঁহার নাটকের প্রণয়ী নিজেই রাজা। তবে তিনি এই মহাসত্য বুঝিতেন বলিয়া তাঁহার নায়কের প্রণয়ের ইতিহাস এমন প্রণালীতে বলিয়াছেন যে তাঁহার পাঠক সেই মহাসত্য বুঝিতে পারেন। সে সত্য এই—ব্যক্তিবিশেষের পরিণয় শুধু সেই ব্যক্তিবিশেষের শুভাশুভের কারণ নয়; তাহা সমস্ত সমাজের শুভাশুভের কারণ। ইহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রথম অর্থ।

দেখিলাম যে দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার পবিত্র পরিণয় হইতে বিষময় ফল ফলিল। এখন জিজ্ঞাস্য এই—বিষময় ফল কেন ফলিল? ইহার প্রথম উত্তর, দুর্ব্বাসার শাপ। দুর্ব্বাসা শাপ দিয়াছিলেন বলিয়া দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ভুলিয়া গেলেন, ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলেন, তাড়াইয়া দিয়া তাঁহাকে অসুখী করিলেন এবং শেষে আপনিও অসুখী হইলেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, যে শাপ হইতে এত অনিষ্ট উৎপন্ন হইল মহাকবি কেন সে শাপ দেওয়াইলেন। ইহার উত্তর এই যে, দুর্ব্বাসা শকুন্তলার কাছে আতিথ্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, শকুন্তলা সে প্রার্থনা শুনেন নাই। তাপসাশ্রমে অতিথিসেবা একটি প্রধান কর্ত্তব্য শকুন্তলা তাহা জানিতেন। প্রাচীন ভারতে তপস্যাশ্রমে সর্ব্বদাই অতিথির সমাগম হইত এবং আশ্রমবাসীদিগের সেই সকল অতিথির সেবা

* Dr. Ulrici র Shakspeare's Dramatic Art নামক গ্রন্থের ১৭৮ পৃষ্ঠা।

করিতে হইত। শকুন্তলা প্রভৃতি সেই অতিথিসেবা-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং সে ধর্ম্মের উৎকর্ষ বুঝিতেন। শকুন্তলা প্রভৃতির সম্মুখে দুষ্মন্ত উপস্থিত হইবামাত্র অনসূয়া বলিয়াছিলেন—

দাণিং অদিহিবিসেসলাহেণ। হলা সউন্দলে গচ্ছ উড়অং ফলমিস্সং অগ্ঘং উবহর। ইদং পাদোদঅং ভবিস্সদি।

আপনার ন্যায় অতিথিলাভে তপস্যার বৃদ্ধি হইতেছে। ওলো শকুন্তলে, উটজে যাও এবং ফলযুক্ত অর্ঘ্য আনয়ন কর। এই পা ধুইবার জল।

আবার যখন শকুন্তলা রাগের ভান করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হন, তখন অনসূয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

সহি ণ জুত্তং অকিদসক্কারং অদিহিবিসেসং বিসজ্জিঅ সচ্ছন্দদো গমণম্।

সখি, অকৃতসৎকার অতিথিকে ত্যাগ করিয়া সচ্ছন্দে চলিয়া যাওয়া উচিত নয়।

মহাকবি দেখাইলেন যে শকুন্তলা অতিথিসেবার কর্ত্তব্যতা এবং উৎকর্ষ সকলই বুঝেন। তার পর তিনি দেখাইলেন যে শকুন্তলা দুষ্মন্তচিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া অতিথি ফিরাইয়া দিলেন, অতিথি শকুন্তলাকে শাপ দিয়া গেল। ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ এই যে প্রণয় যতই পবিত্র এবং উৎকৃষ্ট পদার্থ হউক, সে যদি সামাজিক কর্ত্তব্যসাধনের প্রতিবন্ধক হয়, তবে তাহাকে দূষণীয় বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবেক। শকুন্তলা পতির চিন্তা করিতেছিলেন। পতিচিন্তা কিছু অপবিত্র কার্য্য নয়। কিন্তু সে চিন্তায় তিনি এতই নিমগ্ন যে অতিথির সমাগম জানিতে পারিলেন না এবং সেই জন্য শাপগ্রস্ত হইলেন। ইহার অর্থ এই যে হৃদয়ের অতি পবিত্র ভাবও অপবিত্র হইয়া পড়ে যখন তাহা মানুষকে সমাজ ভুলাইয়া দেয়। ইহার অর্থ এই যে, অগ্রে সমাজ পরে আপনি —অগ্রে অপরের চিন্তা পরে আপনার চিন্তা। আপনার চিন্তা অতি বিশুদ্ধ, অতি প্রশংসনীয় হইলেও তদ্দ্বারা যদি অপরের চিন্তা বিলুপ্ত হয়, তবে তাহা অতি অশুদ্ধ, অতি নিন্দনীয় হইয়া পড়ে। পবিত্র প্রেম অতি উৎকৃষ্ট বস্তু। কিন্তু সে প্রেম যদি মানুষকে সমাজ ভুলাইয়া দেয়, তবে তাহা অতিশয় অপকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এ কথার অর্থ এই যে প্রণয়ের পবিত্রতা বা অপবিত্রতা শুধু প্রণয়ী অথবা প্রণয়িনীর নিজের মনের পবিত্রতা বা অপবিত্রতা দ্বারা নিরূপিত হয় না। সমাজও তাহার একটী প্রধান নিরূপক। শকুন্তলা এই নৈতিক নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছিলেন বলিয়া এত কষ্ট ভোগ করিলেন। তিনি পবিত্রমনে পবিত্রভাবে প্রণয় করিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু তাঁহার মন পবিত্র হইলে কি হইবে? তিনি প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া সমাজ ভুলিয়া তাঁহার প্রণয়কে পূর্ণমাত্রায় পবিত্র করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রণয়ের পবিত্রতা অসম্পূর্ণ ছিল। সেই জন্য তাঁহার অদৃষ্টে এত দুঃখ। আর মহাকবি যদি প্রকৃত তত্ত্ব জ্ঞাপন

করিয়া থাকেন তবে যিনি যেখানে প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া সমাজকে ভুলিবেন তাঁহারই অদৃষ্টে এইরূপ দুঃখ ঘটিবে। ইহার একটী অর্থ এই যে, রমণীর ন্যায় যে হৃদয়প্রধান এবং হৃদয়ের মোহে বেশী মুগ্ধ হয়, তাহার হৃদয়কে শিক্ষা দ্বারা কর্ত্তব্যের পথে রাখিতে হয়, এবং সমাজসেবা এবং অপরের নিমিত্ত চিন্তা সেই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ এবং উপকরণ। রমণীর যে আত্মলীনতার ভাব তৃতীয় প্রস্তাবে বর্ণনা করিয়াছি তাহা আত্মসম্বন্ধে হইলে সমাজবিরোধী। সে ভাব অধিক প্রশ্রয় পাইলে সমাজের অনিষ্টসাধন করে। সেই নিমিত্ত সে ভাবকে শিক্ষা দ্বারা সীমাবদ্ধ করিতে হয়। কিন্তু সে শিক্ষা সহজে লাভ হয় না এবং হইবার নয়। শকুন্তলা জন্মাবধি পরোপকারব্রতে ব্রতী থাকিয়াও সে ভাব দমন করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। অনেক ইউরোপীয় দার্শনিকেরও মত এই যে, দাম্পত্যাবস্থায় স্ত্রীপুরুষের প্রেম আপনাদিগের মধ্যে অধিকপরিমাণে আবদ্ধ থাকিয়া সমাজের অনিষ্টকারী হয় এবং সেই নিমিত্ত মানুষের সে অবস্থায় প্রবেশ করা অনুচিত। আমরা মানুষকে এ রকম ব্যবস্থা দি না, কেন না আমরা ইহাকে পাগলের ব্যবস্থা মনে করি। কিন্তু আমরা এ কথা স্বীকার করি যে এখনও মনুষ্যের মধ্যে দাম্পত্য প্রণয় কিছু বেশী পরিমাণে মোহ-মুগ্ধকারী বলিয়া সমাজসম্বন্ধে কিছু অনিষ্টকর। এবং সেইজন্যই আমরা বলি যে দম্পতির প্রণয়কে শিক্ষা দ্বারা সমাজের অনুকূল করা কর্ত্তব্য। দুষ্মন্ত-নিমগ্না শাপগ্রস্তা শকুন্তলার অর্থও তাই। তাহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের দ্বিতীয় অর্থ। অভিজ্ঞানশকুন্তল জগতের একখানি প্রধান সমাজতত্ত্বজ্ঞাপক নাটক।

শকুন্তলার মোহ দুর্ব্বাসার শাপের একটী কারণ বটে। কিন্তু সেই কারণের অন্তরালে আর একটী কারণ আছে। শকুন্তলা সমস্ত বাহ্যজগৎ ভুলিয়া দুষ্মন্তকে ভাবিতেছিলেন বলিয়া দুর্ব্বাসা তাঁহাকে শাপ দিলেন যে দুষ্মন্ত তোমাকে ভুলিয়া যাইবেন। দুষ্মন্তও তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। শকুন্তলা তাঁহাকে তাঁহাদের বিবাহের প্রমাণ দেখাইতে চাহিলেন। শুনিয়া দুষ্মন্ত আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন—

উদারঃ কল্পঃ।

বেশ কথা।

তখন শকুন্তলা অঙ্গুরীয় বাহির করিতে গিয়া দেখিলেন যে অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় নাই। দুষ্মন্ত তাঁহাকে চতুরা কুলটা বলিয়া পরিহাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু অঙ্গুরীয় সওয়ায় যদি বিবাহের অন্য প্রমাণ থাকিত তাহা হইলে ত কোন গোল হইত না। দুষ্মন্ত নিজেইত পরে মাধব্যকে বলিয়াছিলেন— মাধব্য তুমি কেন আমাকে তখন বিবাহের কথা মনে করিয়া দেও নাই, এবং প্রণয়বুদ্ধি মাধব্য উত্তর করিয়াছিলেন যে আপনি

শকুন্তলার বিষয় আমাকে যে রকম বলিয়াছিলেন তাহাতে আমি এইরূপ বুঝিয়াছিলাম যে তাহার সহিত আপনার বিবাহ হয় নাই। অন্য প্রমাণ থাকিলে দুর্ব্বাসাও শকুন্তলাকে সে রকম শাপ দিতে পারিতেন না এবং দিলেও তাহা কার্য্যকর হইত না। কিন্তু সে বিবাহের অন্য প্রমাণ ছিল না, কেন না সে বিবাহ গোপনে সম্পন্ন হইয়াছিল। গোপনে সম্পন্ন হইবার কারণ কি? না দুষ্মন্তের দুর্দ্দমনীয় রিপু। দুষ্মন্তের দুর্দ্দমনীয় রিপুই দুর্ব্বাসার শাপের এবং সেই শাপোদ্ভূত সমস্ত অনিষ্টের অবান্তর কারণ। কিন্তু সে রিপু অপবিত্র নয়। দুষ্মন্ত রিপুগ্রস্ত বটে কিন্তু দুরাচার নন। তিনি শকুন্তলাকে কলঙ্কে ডুবাইবার নিমিত্ত তাঁহার সহিত মিলনপ্রার্থনা করেন নাই। তিনি শকুন্তলাকে পত্নী করিয়াছিলেন—আসমুদ্র ভারতরাজ্যের রাজ্ঞী করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্দ্দমনীয় রিপুপরবশ হইয়া তিনি কণ্বের প্রত্যাগমন অপেক্ষা করিতে না পারিয়া গোপনে শকুন্তলাকে পত্নীত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। এবং সেই জন্যই আপনি এত কষ্ট পাইলেন, শকুন্তলাকে এত কষ্টে ফেলিলেন এবং সমস্ত ভারতরাজ্যকে বিপদগ্রস্ত করিলেন। ইহার অর্থ এই যে শুধু শুদ্ধান্তঃকরণে বিবাহ করিলে বিবাহ সিদ্ধ হয় না, শুধু হৃদয়ের মিলনকে বিবাহ বলে না। বিবাহ সামাজিক সুখদুঃখের নিয়ন্তা; অতএব সমাজকে সাক্ষী করিয়া, সমাজের সম্মতি লইয়া বিবাহ সম্পন্ন করিতে হয়। মনুষ্যের হৃদয় সকল সময় এক কথা কয় না।

অজ্ঞাতহৃদয়েষ্বেবং বৈরীভবতি সৌহৃদম্।

(অভিজ্ঞানশকুন্তল, পঞ্চমাঙ্ক)

যাহার হৃদয় অপরিজ্ঞাত তাহাতে প্রীতিবন্ধন এইরূপ বৈরিতায় পরিণত হইতে পারে।

আরো এক কথা। সমাজ মনুষ্যচরিত্রের উন্নতির প্রধান কারণ। মনুষ্যচরিত্রে যাহা কিছু ভাল, উৎকৃষ্ট এবং মহৎ আছে তাহার অধিকাংশই কেবল সমাজ আছে বলিয়া বিকাশ পায় এবং দেখিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় প্রস্তাবে দুষ্মন্তচরিত্রের বিশ্লেষণে আমরা এ কথার পরিষ্কার প্রমাণ পাইয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে আন্তরিক ভাবের কাছে আত্মভাবের লয়েই সে চরিত্রের গৌরব এবং উৎকর্ষ। আমাদের যে সকল মানসিক শক্তি এবং হৃদয়ের প্রবৃত্তি আছে তাহা সমাজ-সেবায় নিযুক্ত না হইলে পবিত্রতালাভ করে না। সমাজসেবায় নিযুক্ত হইলেই সে সকল শক্তি এবং প্রবৃত্তি মহত্বসংযুক্ত হয়। নচেৎ পশুপ্রবৃত্তির ন্যায় হেয় হইয়া থাকে। দাম্পত্যসম্বন্ধও সমাজসেবায় উৎসর্গীকৃত না হইলে হীনতা এবং অপবিত্রতা দোষে দূষিত হয়, কেন না তাহা হইলে তাহা পশুপক্ষীর মিলন অপেক্ষা বড় একটা উৎকৃষ্ট হয় না। সমাজই উন্নত-

নীতির প্রকৃত উৎস এবং উদ্দীপক। এবং সেই জন্যই সমাজকে সাক্ষী করিয়া, সমাজের সম্মতি লইয়া, সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত* স্ত্রীপুরুষের বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়া উচিত। দুষ্মন্ত সে প্রণালীতে শকুন্তলার পাণি-গ্রহণ না করিয়া মহাপাপ করিলেন এবং মহা অনিষ্ট ঘটাইলেন। ইহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের তৃতীয় অর্থ। অভিজ্ঞানশকুন্তল সমাজতত্ত্বের একখানি প্রধান কাব্য।

কিন্তু দুষ্মন্ত যে চিত্তসংযমে অক্ষম হইয়া মহাপাপে পতিত হইলেন, ইহা কি ভয়ানক কথা! মহাকবি যে প্রণালীতে এই মহাপাপের উৎপত্তি বুঝাইয়াছেন তাহা বিবেচনা করিলে আমরা সমস্ত মনুষ্যজাতির নিমিত্ত ভীত ও দুঃখিত হই। দুষ্মন্ত সকল গুণের আধার। তিনি রাজা হইয়া, সমগ্রভারতের রত্নভাণ্ডারের অধীশ্বর হইয়াও বিলাসবিদ্বেষী। তিনি মনে করিলে দিবারাত্রি বিলাসসাগরে মগ্ন হইয়া থাকিতে পারেন এবং বিচিত্রপ্রণালীতে বিলাসবাসনা পূর্ণ করিতে পারেন। কিন্তু তিনি তাহা করেন না। তিনি পুরুষপ্রধানের ন্যায় দিবারাত্রি পুরুষোপযোগী কার্য্যে নিযুক্ত। তাঁহার আমোদপ্রমোদ গুলিও পুরুষত্বব্যঞ্জক। বিশাল ধনুর্ব্বাণহস্তে মধ্যাহ্ন রবির বিশ্বদগ্ধকারী কিরণরাশি তুচ্ছ করিয়া পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে পর্ব্বতশৃঙ্গান্তরে বিচরণ করিতেই তাঁহার আমোদ। রাজকার্য্যে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ, গভীর অভিনিবেশ, অপরিমেয় শ্রমশীলতা। বাহুবলে তিনি অদ্বিতীয়; শত্রুদমনে ক্ষিপ্রহস্ত, আগ্রহচিত্ত, অসীমসাহস। তিনি মানুষ, আত্মসেবায় অনুরক্ত। কিন্তু সমাজসেবার্থে আত্মবিসর্জ্জন আবশ্যক হইলে তিনি তাহা অবলীলাক্রমে করিতে পারেন। তিনি মানুষ, মানুষের ন্যায় মোহমুগ্ধ হন, কিন্তু আবশ্যক হইলেই ঐন্দ্রজালিকের ন্যায় নিমেষমধ্যে মোহজাল কাটিয়া খণ্ডখণ্ড করিতে পারেন। তিনি গুরুজনসম্ভ্রমকারী কিন্তু স্বাধীন চিন্তাশীল। তিনি সৎপ্রবৃত্তির প্রশস্ত আধার—বিপন্নের বন্ধু, দরিদ্রের প্রতিপালক, সকলেরই হিতৈষী। তিনি আত্মশাসনে বীরশ্রেষ্ঠ। তিনি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, চিত্রবিদ্যায় সুনিপুণ, অস্ত্রবিদ্যায় সুদক্ষ। তিনি পুরুষত্বের প্রতিমা—শক্তির জীবন্ত মূর্ত্তি। কিন্তু তিনিও রিপুর শাসনে স্খলিতপদ। রিপু কি ভয়ানক বস্তু! রিপুর কি অসীম শক্তি! রিপুসেবা কি বিষম, কি দূষণীয় কার্য্য! এ কথা অভিজ্ঞানশকুন্তল ভিন্ন আর কোথাও দেখে না। সেক্সপীয়রের রোমিও এবং জুলিয়েটেও এ তত্ত্ব দেখিতে পাই না। রোমিও এবং জুলিয়েটে বাহ্

* সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত উদ্বাহ—এ কথা বোধ হয় উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় সমাজসংস্কারক-নিন্দিত হিন্দুশাস্ত্র ভিন্ন আর কোথাও দেখে না। বাইবেলের ত কথাই নাই—তাহাতে দেখে যে বিবাহ না করিতে পারিলেই ভাল হয়।

জগৎ রিপুসেবার প্রতিকূল বলিয়া রিপু সেবা অনিষ্টের হেতু হইল। অভিজ্ঞান শকুন্তলে অন্তর্জগৎ রিপুসেবার প্রতিকূল থাকাতেও রিপুসেবা অনিষ্টের হেতু হইল। বাহ্যজগৎ পরিবর্ত্তনশীল। অতএব রোমিও এবং জুলিয়েটের এমন অর্থ হইতে পারে যে বাহ্যজগৎ অনুকূল থাকিলে রিপুসেবা দূষণীয় নয়। কিন্তু উন্নত-নৈতিক-নিয়ম-শাসিত আধ্যাত্মিক জগৎ অপরিবর্ত্তনীয়। অপরিবর্ত্তনীয়ের সম্বন্ধে যাহা দূষণীয় তাহা সকল সময়েই দূষণীয়। বাহ্যশক্তি প্রবলতম হইলেও দুর্ব্বল। কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তি সকল সময়ে এবং সকল অবস্থাতেই প্রবল। মানবপ্রধান মনু বলিয়াছেন--

অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেয়ুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ।

এবং কবিগুরু বাল্মীকি বলিয়াছেন :—

ন গৃহাণি ন বস্ত্রাণি ন প্রাকারাস্তিরস্ক্রিয়াঃ।
নে দৃশা রাজ সৎকারা বৃত্তমাবরণং স্ত্রিয়ঃ।

অতএব বাহ্যশক্তি অতিক্রম করিয়া যে রিপু কার্য্য করে তাহাকে প্রবল বলিয়া বোধ হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তি অতিক্রম করিয়া যে রিপু কার্য্য করে তাহাকে প্রবলতম অপেক্ষা প্রবল বলিয়া বোধ হয়। এই নিমিত্তই রোমিও এবং জুলিয়েটের ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা শুদ্ধ সেই নায়কনায়িকার জন্য দুঃখিত হই। কিন্তু দুষ্মন্তের ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা সমস্ত মানবজাতির নিমিত্ত ভাবিত হই। যখন দেখি যে রোমিওতে প্রণয় এবং রিপুমত্ততা বই আর কিছুই নাই তখন মনে হয় যে আর কোন মানসিক শক্তি থাকিলে রোমিওর ন্যায় রিপুমত্ত হইয়া সংসারের দুঃখভাগী হইতে হয় না। কিন্তু যখন দেখি যে দুষ্মন্ত সমস্ত মানসিক শক্তির আধার হইয়াও রিপুমত্ততাবশত বিষম পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত, তখন শুধু দুষ্মন্ত কেন সমস্ত মানবজাতির নিমিত্ত চিন্তিত হই। এদিকে মানবজাতির ইতিহাস এবং অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেও ত সেই চিন্তার উদয় হয়। মনুষ্যমাত্রেই আজিও রিপুপ্রধান, রিপুর শাসনে নীতিভ্রষ্ট। সামান্য লোকের ত কথাই নাই। যে সকল মহাপুরুষ জগতে বিদ্যা, বুদ্ধি, উন্নতনীতি, উন্নত চিত্তসংযম-শক্তি, বীরত্ব এবং উদারতার আদর্শস্বরূপ তাঁহারাও রিপুর শাসনে হীনগৌরব। একটি মাত্র নাম করিলেই পাঠক এ কথার অর্থ বুঝিবেন। সে নাম আকব্বর সা। আকব্বর সা অশেষ গুণে ভূষিত ছিলেন ; কিন্তু তাঁহার 'নওরোজের' কথা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ অগস্ত কোমৎও বলেন যে মানুষের বুভুক্ষাপ্রবৃত্তি ছাড়িয়া দিলে, তাহার রতিপ্রবৃত্তি অন্যান্য সকল প্রবৃত্তির অপেক্ষা বলবতী বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু মানবজাতির এই মানসিক এবং ঐতিহাসিক তত্ত্ব সেক্ষপীয়রের রোমিও এবং জুলিয়েটে পাওয়া যায় না, কালি-

দাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলে পাওয়া যায়। ফলতঃ অভিজ্ঞানশকুন্তল এই তত্ত্বেরই দৃশ্যকাব্য। ইহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের চতুর্থ অর্থ।

অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রায় সমস্তই বুঝিয়া দেখা হইল। কিন্তু এখনও কিছু দেখিতে বাকি আছে। মহাকবি দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলার চরিত্র যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা পুরুষ এবং প্রকৃতির প্রতিকৃতি। পুরুষের অর্থ—জগতের সূক্ষ্ম, অনপলাপ্য, অপরিবর্ত্তনীয় উপাদান; প্রকৃতির অর্থ—জগতের স্থূল, অপলাপ্য, পরিবর্ত্তনশীল উপাদান। প্রথম এবং দ্বিতীয় প্রস্তাবে আমরা দুষ্মন্ত-চরিত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহার একটি মর্ম্ম এই যে, দুষ্মন্ত জ্ঞানপ্রধান এবং তাঁহার মনের এমন একটি ভাব আছে যে, তিনি নানাবিধ অবস্থায় পড়িয়াও সেই ভাবটি রক্ষা করেন। তিনি যখনি কোন মোহে অভিভূত হইতেছেন, তখনি আমরা দেখি যে, তিনি সেই মোহ কাটাইয়া তাঁহার পৌরুষভাব ধারণ করিতেছেন। এই দৃশ্য দেখিলেই বোধ হয় যেন তাঁহাতে এমন একটি ভাব আছে যাহা অপরিবর্ত্তনীয় এবং অনপলাপ্য। কিন্তু শকুন্তলাতে আমরা সে রকম কোন ভাব দেখিতে পাই না। তিনি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন ভাব ধারণ করেন; কিন্তু যখন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অভিভূত, তখন তাঁহাকে দুষ্মন্তের ন্যায় কোন একটি নির্দ্দিষ্ট ভাবের দিকে ধাবমান দেখিতে পাই না। যেন তাঁহাতে কোন অনপলাপ্য, অপরিবর্ত্তনীয় উপাদান নাই। অধিকন্তু, তৃতীয় প্রস্তাবে শকুন্তলা-চরিত্রের ব্যাখ্যা বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, শকুন্তলার মন concrete সম্বন্ধ, দুষ্মন্তের মন abstract প্রিয়; শকুন্তলার হৃদয় জড়জগৎসাপেক্ষ, দুষ্মন্তের হৃদয় তাহার বিপরীত। এই এক কথা। আবার দেখি যে, পবিত্র তপস্যাশ্রমে রিপুসেবারূপ জড়জগতের কার্য্য হইতেছে; ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মাত্মক ঋষিকুলপতি কণ্ব শকুন্তলাকে সংসারাশ্রমে প্রেরণ করিতেছেন; এবং দেবতুল্য কশ্যপ দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলাকে দম্পতিরূপে পুনর্ম্মিলিত দেখিয়া আহ্লাদিত চিত্তে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। এই সকল বিবেচনা করিলে, বোধ হয় যে, দুষ্মন্ত এবং শকুন্তলা পুরুষ এবং প্রকৃতির দৃশ্যমান মূর্ত্তি। আবার কুমারসম্ভব পড়িয়া আমরা জানি যে কালিদাস সাংখ্যমতাবলম্বী ছিলেন, এবং কুমারসম্ভবে সাংখ্যদর্শনের পুরুষ এবং প্রকৃতির আধ্যাত্মিক মিলন চিত্রিত করিয়াছেন। এবং সেই কালিদাস দুষ্মন্তের মুখ দিয়া এইরূপ বলাইয়াছেন:—

অদ্যাপি নূনং হরকোপবহ্নি-
স্ত্বয়ি জ্বলত্যৌর্ব্ব ইবাম্বুরাশৌ।
ত্বমন্যথা মন্মথ মদ্বিধানাং
ভস্মাবশেষঃ কথমেব মুক্তঃ।

বোধ হয় আজিও হরকোপানল সমুদ্রে বাড়বানলের ন্যায় নিশ্চয়ই তোমাতে জলিতেছে। নচেৎ, হে মন্মথ, তুমি ভস্মাবশিষ্ট হইলেও বিরহীদিগের পক্ষে কেন এরূপ উষ্ণ হও।

এই সকল কারণে স্পষ্টই বোধ হয় যে কুমারসম্ভবে যেমন পুরুষ এবং প্রকৃতির মিলন চিত্রিত হইয়াছে, অভিজ্ঞান শকুন্তলেও তাই হইয়াছে। তবে কুমারসম্ভবের এবং অভিজ্ঞান-শকুন্তলের পুরুষ-প্রকৃতির মিলনের প্রভেদ এই যে, কুমারসম্ভবে পুরুষ এবং প্রকৃতির মিলন আধ্যাত্মিক ভাবে মিলন, অভিজ্ঞান-শকুন্তলে পুরুষ এবং প্রকৃতির মিলন সাংসারিক ভাবে মিলন। এই প্রভেদবশতঃ কুমারসম্ভবে মদন ভস্মীভূত হইল, অভিজ্ঞান-শকুন্তলে মদন জয়ী হইল। ইহার অর্থ এই যে, ঋষিতপস্বীর ন্যায় আধ্যাত্মিকভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে প্রকৃতিকে বিনষ্ট করিতে হয়, কিন্তু সংসারাশ্রমে থাকিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিতে হইলে প্রকৃতির প্রভাব স্বীকার করিতে হয়। আধ্যাত্মিক জগতে পুরুষেরদ্বারা প্রকৃতি শাসিত হয়; সংসারাশ্রমে প্রকৃতিরদ্বারা পুরুষ শাসিত হয়। এই প্রভেদ বুঝাইবার জন্য মহাকবি শকুন্তলাকে লইয়া দুষ্মন্তের পদস্খলন দেখাইলেন, এবং বসুমতী, হংসপদিকা প্রভৃতি রাজ্ঞীদিগকে দুষ্মন্তের ইতিহাসের মধ্যে আনয়ন করিয়া পাঠককে বুঝাইলেন যে, জগতে প্রকৃতির বলে স্ত্রীপুরুষের যোগসাধন হয় বলিয়া দুষ্মন্ত শুধু শকুন্তলাকে লইয়া বিপদ্‌গ্রস্ত নন, আরো অনেক রমণী লইয়া বিপদ্‌গ্রস্ত। এবং জগতের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে মনুষ্যমাত্রেই দুষ্মন্তের ন্যায় বিপদ্‌গ্রস্ত। ইহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের পঞ্চম অর্থ।

কিন্তু প্রকৃতির বলেই স্ত্রীপুরুষের মিলন যদি সৃষ্টির নিয়ম হইল, তবে সে নিয়মসম্ভাবনীয় বিষময় ফল নিবারণের উপায় কি? মহাকবি তাহাও বলিয়া দিয়াছেন। দুর্ব্বাসার শাপেরদ্বারা দুষ্মন্তকে মহাপরীক্ষায় নিক্ষেপ করিয়া এবং সেই পরীক্ষায় দুষ্মন্তকে জয়ী করিয়া মহাকবি দেখাইয়াছেন যে মনুষ্যমনের শক্তি অসীম এবং অপরিমেয়, প্রকৃতি যতই বলবতী হউক, মনুষ্যের মন তদপেক্ষা বলবান্। মানুষ চেষ্টা করিলে উক্ত নিয়ম সম্ভাবনীয় বিষময় ফল নিবারণ করিতে সক্ষম। কিন্তু সে চেষ্টা অনায়াসে সুসিদ্ধ হইবার নয়। প্রকৃতি বড় ভয়ানক শক্তি। সে শক্তি দমন করিতে হইলে মানুষকে দেবাসুরের যুদ্ধের ন্যায় বিপরীত যুদ্ধ করিতে হইবে। করিলে তবে সংসারাশ্রম সুখ, শান্তি এবং পুণ্যের আশ্রম হইবে। সংসারাশ্রম একটি ভয়ানক রণস্থল। সে রণস্থলে প্রত্যেক মনুষ্যকে বীরপ্রধান হইতে হইবে, নচেৎ পাপ-রুধিরে এবং যন্ত্রণায় হাহাকাররবে* রণস্থল পরিপূর্ণ হইয়া

* বঙ্কিমবাবুর বিষবৃক্ষেও সেই রব শুনা যায় না?

উঠিবে। আরো একটি কথা আছে। তুষ্মন্তের ইতিহাসে সপ্রমাণ হইতেছে যে মানসিকশক্তি এবং ঐন্দ্রিয়িকশক্তি দুইটী পৃথক্ এবং স্বাধীন পদার্থ, মানসিকশক্তি প্রবল হইলেই যে ঐন্দ্রিয়িকশক্তি দমিত হইবে এমন স্থিরনিশ্চয়তা নাই। অতএব ঐন্দ্রিয়িকশক্তি দমন করিতে হইলে শুধু মানসিকশক্তির উপর নির্ভর করিলে সকল সময়ে অভিলষিত ফললাভ নাও হইতে পারে। সেইজন্য মানসিকশক্তির সহিত সমাজ-শক্তি যোগ করা আবশ্যক। অর্থাৎ সমাজের গঠনপ্রণালী এবং সামাজিক নিয়ম এমন হওয়া চাই যে সেই প্রণালী এবং নিয়মের বলে লোকের ঐন্দ্রিয়িকশক্তি প্রশ্রয় না পাইয়া দমিত হইয়া আইসে। অভিজ্ঞানশকুন্তলে কালিদাস এই মত স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়াছেন। শকুন্তলার দ্বারা তিনি বুঝাইয়াছেন যে গান্ধর্ব্ব বিবাহ দূষণীয়; এবং বসুমতী, হংসপদিকা প্রভৃতি রাজ্ঞীগণের দ্বারা তিনি বুঝাইয়াছেন যে বহুবিবাহ বিষম অনিষ্টকারী। তিনি দেখাইয়াছেন যে উভয়প্রকার বিবাহই প্রকৃতি বা ঐন্দ্রিয়িক শক্তির ফল এবং ঐন্দ্রিয়িকশক্তির প্রতিপোষক। তিনি অভিজ্ঞানশকুন্তলে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে ঐন্দ্রিয়িকশক্তি দমন করিতে হইলে শুধু মানসিকশক্তি প্রয়োগ করিলে চলিবে না, সমাজকে সুসংস্কৃত এবং নীতিপ্রবণ করিয়া সমাজরূপ মহা শক্তিও প্রয়োগ করিতে হইবে। অভিজ্ঞানশকুন্তল মানসিকশক্তি এবং সমাজশক্তির মহাকাব্য। ইহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের ষষ্ঠ অর্থ।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহার মর্ম্ম এই যে, অভিজ্ঞানশকুন্তল ভারতের একটি প্রধান দার্শনিক তত্ত্বের দৃশ্যকাব্য। বেদান্তদর্শনে বলে যে, পুরুষই সত্য এবং সৎ, প্রকৃতি অথবা জড়জগৎ মিথ্যা এবং অ-সৎ—পুরুষই পদার্থ, প্রকৃতি ছায়ামাত্র। সাঙ্খ্যমতাবলম্বী কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তলে দেখাইয়াছেন যে, পুরুষও যেমন সত্য, প্রকৃতিও তেমনি সত্য; পুরুষও যেমন সৎ, প্রকৃতিও তেমনি সৎ, পুরুষও যেমন পদার্থ, প্রকৃতিও তেমনি পদার্থ। অভিজ্ঞান শকুন্তলে প্রকৃতি যে রকম উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে, যে রকম প্রভাবশালী দৃষ্ট হয়, যে রকম স্বাধীন-কায়াবিশিষ্ট দেখা যায় তাহাতে নিশ্চয়ই বোধ হয় যে মহাকবির মতে, অস্তিত্ব এবং প্রভাব সম্বন্ধে, প্রকৃতি পুরুষের সমকক্ষ পদার্থ—ছায়া বলিয়া উড়াইয়া দিবার জিনিস নয়। প্রকৃতি যে ছায়া নয়, প্রকৃতির যে একটি স্বাধীন, একটী মহাপ্রভাবশালী, একটী বিষম সত্য—অস্তিত্ব আছে, অভিজ্ঞানশকুন্তলে তাহা উজ্জ্বলতম অক্ষরে লেখা আছে। সেই মহাতত্ত্বই যেন অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রাণ। ফলতঃ অভিজ্ঞানশকুন্তল কাব্যাকারে সাঙ্খ্য-দর্শন। ইহাই অভিজ্ঞানশকুন্তলের অর্থতত্ত্বের চরমসীমা। এত অর্থ আর কোন্ কাব্যে কবে কে দেখিয়াছে?

চন্দ্রগুপ্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

আর্য্যাবর্ত্তে মগধনামে যে জনপদ ছিল বৈদিক সময়ে তাহাকে কীকট বলিত। বিখ্যাত জরাসন্ধ নৃপতি মগধদেশে নিজ রাজ্যস্থাপন করেন। তাঁহার সময় হইতেই এই দেশ মগধনামে পরিচিত। মগধের অধুনাতন নাম বেহার প্রদেশ। জরাসন্ধ যযাতিপুত্র পুরুর বংশোৎপন্ন এবং মগধবংশীয় মহাবলপরাক্রান্ত ভূপালগণের আদিপুরুষ। গয়ার পূর্ব্বস্থিত রাজগৃহে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি পাণ্ডবদিগের সমসাময়িক নৃপতি এবং ভীমের সহিত দ্বন্দযুদ্ধে নিহত হয়েন। বারানসী নগরীতে জরাসন্ধ যে জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; মুসলমানেরা তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। দ্বাবিংশতিজন নৃপতি জরাসন্ধের সিংহাসনে রাজত্ব করেন। বিষ্ণুপুরাণের মতে মগধবংশের স্থিতি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত নিরূপিত আছে, অর্থাৎ এই দ্বাবিংশতিজন ভূপাল একসহস্রবৎসর মগধসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। শেষ নৃপতি রিপুঞ্জয় স্থনীক নামে তাঁহার দুরাত্মা সচিবের হস্তে নিহত হন। রাজ্যলুব্ধ স্থনীক তাঁহার পুত্র প্রদ্যোতকে মগধসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাঁর পরে পঞ্চদশজন মহীপতি মগধরাজ্যে রাজত্ব করেন। ইহাঁদের রাজত্বকাল বিষ্ণুপুরাণের মতে চারিশত নবতি বৎসর। মহারাজ মহানন্দী ইহাঁদিগের পঞ্চদশতম। ইহাঁর মহাপদ্ম নামে এক তনয় জন্মে। এই মহাপদ্মই ইতিহাসে নন্দনামে প্রোথিত হইয়াছেন। মহাপদ্মনন্দ শূদ্রাগর্ভ সমুদ্ভূত ছিলেন। ইহাঁর প্রতাপ এবং বীরত্ব বহুদূর বিদিত হইয়াছিল। কেহই তাঁহার শাসন উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইত না। যদ্যপি ইনি শূদ্রার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার সামাজিক প্রতিপত্তি স্থির ছিল। মহাপদ্মানন্দের নব পুত্র জন্মিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তাঁহার ঔরসে মুরানাম্নী দাসীর গর্ভে চন্দ্রগুপ্তনামে আর এক পুত্র হইয়াছিল। এই চন্দ্রগুপ্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী আমরা এ প্রস্তাবে সঙ্কলিত করিব।

নন্দের পরলোকগমনান্তর তাঁহার নব পুত্রেরা রাজ্য অধিকার করিলেন। তাঁহারা চন্দ্রগুপ্তকে উপযুক্ত বৃত্তি দিতে চাহিলেন, কিন্তু রাজ্যের অংশ দিতে অসম্মত হইলেন। চন্দ্রগুপ্ত তাহা গ্রহণ করিলেন না বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে মারিবার উপক্রম করেন। প্রাণভয়ে ভীত হইয়া চন্দ্রগুপ্ত পঞ্চনদপ্রদেশে পলায়ন করেন। তথায় তক্ষশীলানিবাসী চাণক্যপণ্ডিতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। চাণক্যের সহিত তাঁহার যেদিন প্রথম আলাপ হয়, সেদিন তিনি দেখিলেন যে, চাণক্য তক্র.সচনপূর্ব্বক কতক-

গুলি কুশাঙ্কুরের মূলোচ্ছেদ করিতেছেন এবং তাঁহাকে আপনার কার্য্যোপযোগী ব্যক্তি স্থির করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। চাণক্য অতিশয় বুদ্ধিমান্ এবং রাজনীতিশাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। এতাদৃশ সহায়প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রগুপ্ত মগধে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিলেন।

গ্রীসদেশীয় ইতিহাসলেখকেরা বলেন যে, চন্দ্রগুপ্ত যখন পঞ্চনদপ্রদেশে ছিলেন, তখন মহাবীর আলেক্জাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, এবং বিপাশা-নদীতীরে শিবিরসন্নিবেশ করেন। চন্দ্রগুপ্ত আলেক্জাণ্ডারের সেনানিবেশে প্রবেশ করিয়া আলেক্জাণ্ডারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের বাচালতা ও স্বাধীনভাবে বাক্যপ্রয়োগ হেতু সেকন্দর তাঁহার উপর এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি পলায়নদ্বারা আত্মরক্ষা সম্পাদন না করিলে, নিশ্চয় তাঁহাকে মারিয়া ফেলিতেন। পরে তিনি কুসুমপুরে পলায়ন করেন, তথায় নবনন্দ নরপতিগণ একত্র মিলিত হইয়া রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহাদিগের রাজত্ব সময়ে রাজগৃহ হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়া কুসুমপুর বা পাটলিপুত্রে সংস্থাপিত হয়। কখন যে স্থানান্তরিত হইয়াছিল, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। নন্দনরপতিগণ প্রজারঞ্জনদ্বারা প্রজাবর্গের পরম অনুরাগভাজন হইয়া উঠিলেন। রাক্ষস নামে জনৈক নীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ইহাঁদিগের অতিপ্রাচীন সচিব ছিলেন। রাক্ষসের অকৃত্রিম স্বামিভক্তি এবং রাজ্যের হিতচিন্তনহেতু সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিত।

একদা চাণক্য রাজবাটীতে কোন কার্য্যোপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তথায় কোন কারণবশতঃ তিনি নন্দনৃপতিগণকর্ত্তৃক অপমানিত এবং সভা হইতে বহিষ্কৃত হয়েন। এই নিষ্কারণ অবমাননা জন্য তিনি নন্দনৃপতিদিগের ধ্বংস সর্ব্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করেন। পরে সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইয়াছিল। চাণক্যের মন্ত্রণা ও বুদ্ধিকৌশলে চন্দ্রগুপ্ত নিজ ভ্রাতৃগণকে উপাংশুনিহত করেন এবং সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া চাণক্যকে নিজের মন্ত্রিত্বে বরণ করিলেন। তৎপরে উগ্রধন্বানামক একজন নন্দপুত্রদিগের পক্ষীয় রাজা চন্দ্রগুপ্তের বিনাশের উপায় কল্পনা করিলে, তিনি নেপালরাজা হইতে সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং উগ্রধন্বাকে পরাজিত করিয়া সিংহাসনে দৃঢ়তররূপে সমাসীন হয়েন।(১) এ বিষয়ে আমরা আমাদিগের মতামত প্রকাশিত করিব না।

এ দিকে অমাত্যরাক্ষস স্বচক্ষে চাণক্যকর্ত্তৃক নন্দনৃপতিগণের সমুচ্ছেদ সন্দর্শন করিয়া নগর হইতে বহির্গত হইয়া মলয়কেতুনামক জনৈক পার্ব্বতীয় রাজার সহিত মিলিত হইলেন। ইঁহার সহিত

(১) Asiatic Researches vo' V.